المنهج التعليمي - بنغالي

পাঠ্যসূচী

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

هاتف: ٤٢٢٤٤٦٦ ٠١٦ ـ فاكس: ٤٢٢٤٤٧٧ ٠١٦

تعاوني الزلفي

المنهج التعليمي
أعده وترجمه للغة البنغالية
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي
الطبعة الرابعة/جديدة بالكامل ١٤٣٨هـ

ح شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤٣٨هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
المنهج التعليمي – الزلفي
١٣١ ص؛ ١٧ × ٢٤ سم
ردمك : ٧- ٧٩- ٨١٣- ٩٩٦٠
(النص باللغة البنغالية)
١ - الإسلام - مبادىء عامة   أ- العنوان
ديوي ٢١١   ٢١/٠٧٠٨

رقم الإيداع: ٢١/٠٧٠٨
ردمك : ٧- ٧٩- ٨١٣- ٩٩٦٠

الصف والإخراج: المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
আক্বীদা	৫
পবিত্রতার বিধান	২৪
নামাযের বিধান	২৮
যাকাতের বিধান	৪০
রোযার বিধান	৪৫
হজ্জের বিধান	৫১
খাদ্য সম্পর্কীয় বিধান	৬০
পোশাক-পরিচ্ছদের বিধান	৬৪
বিবাহের বিধান	৬৮
মুসলিম নারীর বিধান	৭৫
সংক্ষিপ্ত নবী জীবনী	৮৫
শেষ দিবস	১২১

المنهج التعليمي للأسرة والمجتمع

পরিবার ও সমাজের জন্য পাঠ্যক্রম

আক্বীদাঃ

তাওহীদ ও তার প্রকারভেদ

মহান আল্লাহর বিশেষ গুণাবলীতে এবং তাঁর জন্য ওয়াজিব ইবাদতসমূহে তাঁকে একক জানা ও মানার নাম তাওহীদ। আর এটাই হলো আল্লাহর মহান নির্দেশ। তিনি বলেন,

﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾

অর্থাৎ, "বলুন, তিনি আল্লাহ এক।" (ইখলাসঃ ১) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ ﴾

অর্থাৎ, "আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে কেবলমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি"। (সূরা যারিয়াতঃ ৫৬) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَاعْبُدُوْا اللهَ وَلاَتُشْرِكُوْابِهِ شَيْئاً ﴾

অর্থাৎ, "আল্লাহরই ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোন শরীক স্থাপন করো না"। (সূরা নিসাঃ৩৬)

তাওহীদ তিন প্রকার, যথা

১। তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ

২। তাওহীদে উলুহিয়্যাহ

৩। তাওহীদে আসমা অস্‌সিফাত।

প্রথমতঃ তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ তথা প্রতিপালকের একত্ববাদ হলো,
আল্লাহকে একক স্রষ্টা, সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী ও পরিচালক বলে বিশ্বাস করা। তিনিই আহারদাতা, জীবন ও মৃত্যুর মালিক। আকাশমন্ডল ও যমীনের বাদশাহী তাঁরই। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُاللهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لاَإِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ فاطر ٣

অর্থাৎ, "আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন স্রষ্টা আছে কি, যে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিযিক দান করে?"। (সূরা ফাতিরঃ ৩) তিনি আরো বলেন,

﴿ تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ الملك١

অর্থাৎ, "অতীব মহান ও শ্রেষ্ঠ সেই সত্তা, যাঁর মুঠির মধ্যে রয়েছে (সমগ্র সৃষ্টিলোকের) কর্তৃত্ব-সার্বভৌমত্ব। তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান"।(সূরা মুলকঃ ১) আর মহান আল্লাহর কর্তৃত্ব সমগ্র সৃষ্টলোককে পরিব্যাপ্ত। তিনি যেভাবে চান পরিচালনা করেন। অনুরূপ আল্লাহ পাকই একমাত্র পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক। তিনিই তাঁর সৃষ্টিকে পরিচালিত করে থাকেন। যেমন তিনি বলেন,

﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ [الأعراف:٥٤].

অর্থাৎ, "শুনে রেখো, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং নির্দেশ দান করা। তিনি বরকতময়, সমগ্র বিশ্বের

প্রতিপালক"।(আরাফঃ৫৪) আর তাঁর এই তত্ত্বাবধায়কত্ব অত্যন্ত ব্যাপক। পৃথিবীর কোন জিনিস এর আওতা বহির্ভূত নয়। খুব কম সংখ্যক মানুষই এই তাওহীদকে অস্বীকার করেছে। আবার এরা মৌখিকভাবে অস্বীকার করলেও এদের অন্তর এর স্বীকৃতি দিয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾. [النمل:١٤].

"তারা অন্যায় ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে এই নিদর্শনগুলো অস্বীকার করলো; অথচ তাদের অন্তর এগুলো-কে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিলো"। (সূরা নাম্‌লঃ ১৪) তবে কেবল এই তাওহীদের স্বীকৃতি স্বীকৃতিদাতার কোন উপকারে আসবে না। যেমন মুশরিকদের স্বীকৃতি তাদের কোন উপকারে আসে নি। আল্লাহ তাআ'লা তাদের সম্পর্কে বলেন,

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾. [العنكبوت:٦١].

অর্থাৎ, "যদি আপনি তাদের জিজ্ঞেস করেনে, কে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছে, কে চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ'। তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।" (সূরা আনকাবুতঃ ৬১)

দ্বিতীয়তঃ, তাওহীদে উলুহিয়্যা/ উপাসত্বের একত্ববাদ হলো,

সকল প্রকারের ইবাদতের অধিকারী একমাত্র আল্লাহকেই মনে করা। অর্থাৎ,মানুষ আল্লাহর সাথে অন্য কোন সত্তার ইবাদত করবে না, চেষ্টা করবে না তার নৈকট্য লাভের। তাওহীদের প্রকারসমূহের মধ্যে এই প্রকারটা হলো সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং অতীব মহাত্মপূর্ণ। আর এ প্রকারের তাওহীদের বাস্তবায়নের জন্যই আল্লাহ জ্বিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ﴾

অর্থাৎ, "আমি জ্বীন ও মানব জাতিকে কেবলমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি"। (সূরা যারিয়াতঃ ৫৬) আর এই একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্যই রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন, অবতীর্ণ হয়েছে আসমানী সমূহ কিতাব। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَّسُوْلٍ إِلاَّ نُوْحِيْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَإِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُوْنِ﴾ الأنبياء٢٥

অর্থাৎ, "আমি তোমার পূর্বে যে রাসূলই পাঠিয়েছি, তাঁর প্রতি এই অহী করেছি যে, আমি ছাড়া সত্য আর কোন উপাস্য নেই; অতএব তোমরা আমারই দাসত্ব কর"। (সূরা আম্বিয়াঃ২৫) আর এই তাওহীদকেই মুশরিকরা অস্বীকার করেছিল, যখন তাদেরকে রাসূলগণ এর প্রতি আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾. [الأعراف:٧٠].

অর্থাৎ, "তুমি আমাদের নিকট কি এই জন্য এসেছ যে, আমরা কেবল আল্লারই দসত্ব করি এবং আমাদের বাপ-দাদা যাদের পূজা করতো, তাদেরকে ছেড়ে দেই? অতএব সেই শাস্তিই আমাদের কাছে নিয়ে আসো, যার ভয় আমাদেরকে দেখাচ্ছ, যদি তুমি সত্যবাদী হও।" (সূরা আ'রাফঃ ৭০) কাজেই ইবাদতের প্রকারসমূহের কোন কিছুই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্তার জন্য করা যাবে না। তাতে সে সত্তা প্রেরিত কোন নবী হোক

কিংবা (আল্লাহর) কোন নিকটতম ফেরেশতা অথবা কোন ওয়ালী বা যে কোন সৃষ্টি হোক না কেন। কারণ ইবাদত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য করা জায়েয নয়।

তৃতীয়তঃ তাওহীদে আসমা অস্‌সিফাত তথা নাম ও গুণাবলীর একত্ববাদ হলো,

আল্লাহ নিজের যে সমস্ত নাম ও গুণের কথা উল্লেখ করেছেন অথবা তাঁর রাসূল আল্লাহর যে সমস্ত নাম ও গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, সেগুলো যথার্থভাবে মেনে নেওয়া। আর এগুলো ঐ ভাবেই প্রতিষ্ঠিত করা, যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর গৌরবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এর মধ্যে কোন ধরনের বিকৃতি, অস্বীকৃতি, ধরণ বা প্রকৃতি নির্ণয় অথবা সাদৃশ্য পেশ না ক'রে প্রকৃতার্থে তা সুসাব্যস্ত করা। আর আল্লাহ নিজের জন্য যা অস্বীকার করেছেন অথবা তাঁর রাসূল তাঁর জন্য যা অস্বীকার করেছেন, তা অস্বীকার করা। আর যার স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি কোন কিছুই সাব্যস্ত নয়, সে ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা। তার স্বীকৃতিও দেওয়া যাবে না, আবার অস্বীকার করাও যাবে না। ('তাহরীফ' হলো, দলীল ছাড়াই আল্লাহর গুণাবলীর অপব্যাখ্যা করা। 'তা'ত্বীল' হলো, আল্লাহর অত্যাবশ্যকীয় নামসমূহ ও গুণাবলীর অথবা তার কোন কিছুর অস্বীকার করা। 'তাকয়ীফ' হলো, আন্তরিক অথবা মৌখিকভাবে আল্লাহর গুণাবলীর ধরণ-গঠন বর্ণনা করা। যেমন বলা যে, আল্লাহর হাত এ রকম ও রকম। 'তামষীল' হলো, সৃষ্টির গুণাবলীর সাথে আল্লাহর গুণাবলীর তুলনা করা অথবা এই বিশ্বার করা যে, আল্লাহর গুণাবলী সৃষ্টির গুণাবলীর মত।)

আল্লাহর সুন্দর নামের কিছু দৃষ্টান্তঃ

আল্লাহ নিজেকে(الحي القيوم) তথা চিরঞ্জীব ও সব কিছুর ধারক বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, (حي) তথা চিরঞ্জীব আল্লাহর একটি নাম বিশেষ। আর এই নাম আল্লাহর যে গুণটি প্রকাশ করছে, তার প্রতিও ঈমান রাখতে হবে। আর সে গুণ হচ্ছে, পরিপূর্ণ জীবন, যার নেই আদি ও অন্ত। অনুরূপ আল্লাহ নিজেকে (سميع) বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং আমাদের ঈমান রাখতে হবে যে, (سميع) আল্লাহর একটি নাম বিশেষ। এর অর্থ হচ্ছে সর্বশ্রোতা। আর 'শোনা' আল্লাহর একটি গুণ-এর প্রতিও আমাদেরকে ঈমান আনতে হবে।

আল্লাহর গুণের আরো উদাহরণ হলো,

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾. [المائدة:٦٤].

অর্থাৎ, "ইয়াহুদীরা বলে, আল্লাহর হস্তদ্বয় বাঁধা রয়েছে। বাঁধা হয়েছে তাদেরই হাত এবং তাদের এই সব প্রলাপোক্তির কারণে তাদের উপর অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে। আল্লাহর হস্তদ্বয় তো উদার উন্মুক্ত, তিনি যেভাবেই ইচ্ছা ব্যয় করেন"। (সূরা মায়েদাঃ ৬৪) এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক নিজের দ'ুটি উন্মুক্ত ও উদার হস্তের কথা বর্ণনা করেছেন। তাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহর দ'ুটি হস্ত আছে, যা দান ও অনুগ্রহের জন্য প্রসারিত, উন্মুক্ত ও উদার। কিন্তু আল্লাহর পবিত্র হস্তদ্বয়ের ধরণ বা প্রকৃতি নিয়ে অন্তরে কোন কল্পনা না করা, মুখেও তা প্রকাশ বা ব্যক্ত না করা, অনুরূপ সৃষ্টির হাতের সাথে কোন প্রকার সাদৃশ্য বা তুলনা না করা আমাদের উপর ওয়াজিব। কারণ মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾. [الشُّورى:١١].

"বিশ্বলোকের কোন জিনিসই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সবকিছু শুনেন ও দেখেন"। (সূরা শুরাঃ ১১)

এই তাওহীদের সার কথা হচ্ছে, আল্লাহ নিজের যে সমস্ত নাম ও গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন বা তাঁর রাসূল যে সব নাম ও গুণাবলীর করেছেন, কোন ধরনের বিকৃতি, সাদৃশ্য, ধরণ-গঠন নির্ণয় না করে, বা অস্বীকৃতির পন্থা অবলম্বন না করে প্রকৃতার্থে তা মেনে নেওয়া।

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ'-এর অর্থঃ

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ' এ সংক্ষিপ্ত বাক্যটিই দ্বীনের ভিত্তি ও বুনিয়াদ। ইসলাম ধর্মে এর রয়েছে বড় মর্যাদা ও মহান তাৎপর্য। এটি ইসলাম ধর্মের পাঁচটি মৌলিক বুনিয়াদসমূহের সর্ব প্রথম বুনিয়াদ এবং ঈমানের সর্বোচ্চ শাখা। সমূহ সৎকার্য আল্লাহর দরবারে গৃহীত হওয়া না হওয়া এ কালেমার মৌখিক স্বীকার, এর অর্থ জানা এবং তদনুযায়ী আমল করার উপর নির্ভর করে। এ বাক্যটির সঠিক ও বিশুদ্ধ অর্থ যার দ্বিতীয় কোন ব্যাখ্যার অবকাশ নেই তা হলো, 'আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের কোন মা'বুদ বা উপাস্য নেই"। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সৃষ্টিকর্তা নেই অথবা আল্লাহ ছাড়া আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের সক্ষম কেউ নেই বা আল্লাহ ব্যতীত কেউ বিদ্যমান নেই। কেননা, এই কালেমার এই ব্যাখা করলে তা তাওহীদে রুবুবিয়্যার ব্যাখা হয়ে যায় এবং তাওহীদে উলূহিয়্যা যা এই কালেমার প্রকৃত ব্যাখ্যা তা চাপা পড়ে যায়।

এ বাক্যটির দু'টি অংশ রয়েছে। যথা,

১। 'লা-ইলাহা' এটি নেতিবাচক বা অস্বীকৃতিমূলক অংশ। এতে প্রত্যেক বস্তুর উপাস্য বা মা'বুদ হওয়ার যোগ্যতাকে অস্বীকার করা হয়েছে।

২। 'ইল্লাল্লাহ' এটি ইতিবাচক অংশ। যাতে শুধুমাত্র এক ও এককভাবে আল্লাহর জন্যই মা'বুদ হওয়ার উপযুক্ত-তাকে দৃঢ়ভাবে স্বীকার করা হয়েছে। যার নেই কোন শরীক ও অংশীদার। অতএব আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত করা যাবে না। কোন প্রকারের ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর জন্য সম্পাদন করা বৈধ হবে না। যে ব্যক্তি এ কালেমার অর্থ অনুধাবন করে এবং তার অত্যাবশ্যকীয় বিধানগুলো সর্ব প্রকার শির্ক থেকে বিরত থেকে, একত্ববাদের স্বীকৃতি দিয়ে মেনে চলে, মুখে তার স্বীকৃতি দেয়, সাথে সাথে কালেমায় নিহিত বিষয়গুলোর উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয় রেখে তদনুযায়ী আমল করে, সেই প্রকৃত মুসলমান। আর যে অবিচল কোন বিশ্বাস না রেখে তার উপর আমল করার ভান দেখায়, সে মুনাফিক ও কপট। আর যে কালেমার পরিপন্থী (যথা শির্ক) কাজ করে, সে মুশরিক ও কাফের, যদিও সে তা মুখে উচ্চারণ করে থাকে।

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ'-র মাহাত্ম্য

এ কালেমার অনেক উচ্চ মর্যাদা ও মাহাত্ম্য এবং বিপুল সুফল রয়েছে। নিম্নে তার কিঞ্চিৎ পেশ করা হলো।

১। তাওহীদবাদী জাহান্নামীকে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হতে দেবে নাঃ

হাদীসে এসেছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهَ وَفِيْ قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيْرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَفِيْ قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ، وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَفِيْ قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ)) متفق عليه ١٩٣،٤٤

অর্থাৎ, "সে ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে (এবং জান্নাতে দেওয়া হবে) যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়েছে এবং তার অন্তরে যব পিরমাণ কল্যাণ আছে। আর সে ব্যক্তিকেও বের করে আনা হবে, যে এ বাক্যটি পড়েছে এবং তার অন্তরে গম পরিমাণ ঈমান আছে, এবং আর সে ব্যক্তিকে বের করে আনা হবে, যে এ বাক্যটি পড়েছে এবং তার অন্তরে অণু পরিমাণ কল্যাণ আছে"। (বুখারী ৪৪-মুসলিম ১৯৩)

২। এ কালেমাটির জন্য মানুষ ও জ্বিন জাতিদ্বয়কে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾. [الذاريات:٥٦].

অর্থাৎ, "আমি জ্বিন ও মানুষকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করি নাই, কেবল এ জন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।" (সূরা যারিয়াতঃ ৫৬)

৩। এ কালেমাটির প্রচারের জন্যই যুগে যুগে রাসূল প্রেরিত হয়েছেন, অবতীর্ণ হয়েছে আসমানী সমূহ কিতাব। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾. [الأنبياء:٢٥].

অর্থাৎ, "আমি তোমার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাঁর প্রতিও এই অহী নাযিল করেছি যে, আমি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই; অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর"। (সূরা আম্বিয়াঃ ২৫)

৪। এ কালেমাটি সমস্ত রাসূলগণের দাওয়াতের এক অভিন্ন বিষয় ছিল। তাঁরা সকলেই এর দিকে আহ্বান ক'রে স্বীয় জাতিকে বলতেন,

﴿...يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾. [الأعراف:٥٩].

অর্থাৎ, "হে আমার জাতির লোক! আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন সত্য মা'বুদ নেই" (সূরা আ'রাফঃ ৭৩)

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ'র শর্তাবলীঃ

লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ'র সাতটি শর্ত রয়েছে।এই শর্তগুলো বিদ্যমান না হলে এবং বান্দা তার কোন কিছুর বিরোধিতা না ক'রে সবগুলোকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে না ধরলে তা (লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ' সঠিক হবে না। শর্তগুলো হলো,

১। **ইলম,** (জ্ঞান)ঃ কালেমার ইতিবাচক ও নেতিবাচক অর্থ এবং তার প্রতি কর্তব্যের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বান্দা যখন মহান প্রভুকে এক ও একক মা'বুদ বলে জানবে, তিনি ব্যতিরেকে অন্য যে কোন সত্তার ইবাদত করাকে ভ্রান্তি বলে বিশ্বাস করবে, সেই প্রকৃতার্থে কালেমার মর্ম ও তাৎপর্যের খাঁটি জ্ঞানী বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ﴾ محمد:١٩

অর্থাৎ, "হে নবী! জেনে রাখুন! আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই"। (সূরা মুহাম্মাদঃ ১৯) আর উষমান (রাঃ) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

((مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ)) مسلم ٢٦

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই-এর জ্ঞান রেখেই মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"। (মুসলিম ২৬)

২। **দৃঢ় বিশ্বাসঃ** এ কালেমার মৌখিক স্বীকৃতি এমন দৃঢ় বিশ্বাস ও অবিচল প্রত্যয় সহকারে দিতে হবে যাতে থাকবে অন্তরের প্রশান্তি। জ্বিন ও মানব শয়তানের বপন করা কোন প্রকারের সন্দেহের বীজ সেখানে থাকবে না। বরং তার নির্দেশিত অর্থের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে তা পড়তে হবে। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ﴾. [الحجرات:١٥].

অর্থাৎ, "প্রকৃত পক্ষে মু'মিন তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে। অতঃপর কোন সন্দেহ পোষণ করে নি"। (সূরা হুজুরাতঃ ১৫) আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

((أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ، لاَ يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيْهِمَا، إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ)) مسلم ٢٧

অর্থাৎ, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকার মা'বুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যে কোন বান্দা এ দু'টি বাক্যের সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"। (মুসলিম ২৭)

৩। **গ্রহণঃ** এ কালেমার প্রত্যেকটি দাবীকে মুখে ও অন্তরে সাদরে গ্রহণ করতে হবে। অতএব অতীত ও বর্তমানের বিভিন্ন ঘটনাবলী যার উল্লেখ কুরআন ও হাদীসে এসেছে, তা বিশ্বাস করতে হবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বিশুদ্ধভাবে যা বর্ণিত হয়েছে, তার প্রতি ঈমান এনে প্রত্যেকটিকে গ্রহণ করে নিতে হবে। কোন কিছুকেই প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ البقرة:٢٨٥

অর্থাৎ, "রাসূল সেই হেদায়াতকেই বিশ্বাস করেছেন, যা তাঁর প্রতিপালকের নিকট হতে তাঁর প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং মু'মিনরাও বিশ্বাস করেছেন। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। (তারা বলে,) আমরা তাঁর পয়গম্বরের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং আনুগত্য করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা"। (সূরা বাক্বারাঃ ২৮৫)

শরীয়তের কোন বিধান বা তার নির্ধারিত শাস্তি ও দন্ডবিধির উপর আপত্তি ও অভিযোগ উত্থাপন করা বা তা প্রত্যাখ্যান করা ঈমানের সমস্ত দাবীকে গ্রহণ না করারই শামিল। যেমন কেউ কেউ চুরি ও ব্যভিচারের দন্ড-বিধি, বহুবিবাহ প্রথা ও উত্তরাধিকার বিধি-বিধান প্রভৃতির উপর চরম ধৃষ্টতার সাথে তথাকথিত অসার অভিযোগ খাড়া করে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ الأحزاب:٣٦

অর্থাৎ, "কোন মু'মিন পুরুষ ও কোন মু'মিনা স্ত্রীলোকের এই অধিকার নাই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোন বিষয়ে ফয়সালা করে দিবেন, তখন তারা নিজেদের সেই ব্যাপারে ভিন্ন কোন ফয়সালা করবার ইখতিয়ার রাখবে"। (সূরা আহযাবঃ ৩৬)

৪। **আনুগত্যঃ** এর অর্থ, মেনে নেওয়া ও আনুগত্য করা। অর্থাৎ, কালেমা যে সমস্ত বিষয়কে নির্দেশ করে, তা মেনে চলা। আনুগত্য ও গ্রহণের মধ্যে পার্থক্য এই যে, গ্রহণ হলো কালেমার ব্যাপক অর্থের বিশুদ্ধতার মৌখিক স্বীকৃতি দেওয়া। আর আনুগত্য হলো, কর্মের মাধ্যমে তার অনুসরণ করা। তাই যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ'র অর্থ বুঝলো, এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো এবং তা গ্রহণও করলো, কিন্তু সে আনুগত্য করলো না এবং সেই জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না, এমতাবস্থায় সে আনুগত্যের যে শর্ত, তার বাস্তব রূপ দিলো না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ الزُّمر:٥٤

অর্থাৎ, "ফিরে এসো তোমাদের রবের দিকে এবং অনুগত হও তাঁর"। (সূরা যুমারঃ৫৪) আল্লাহ পাক আরো বলেন,

﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَيَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّاً قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْماً﴾ النساء٦٥

অর্থাৎ, "হে মুহাম্মাদ! তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা কিছুতেই মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ তারা তাদের পারস্পরিক মতভেদের বিষয় ও ব্যাপারসমূহে তোমাকে বিচারপতিরূপে মেনে না নেবে। অতঃপর তুমি যাই ফায়সালা করবে, তারা নিজেদের মনে তৎসম্পর্কে কোন কুণ্ঠাবোধ করবে না বরং তা সর্বান্তঃকরণে মেনে নেবে"। (সূরা নিসাঃ ৬৫)

৫। সত্যনিষ্ঠতাঃ সে নিজের ঈমান ও মৌখিক ধর্মবিশ্বাসে সত্যবাদী হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ {التوبة:١١٩}

অর্থাৎ, "হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হয়ে যাও"। (সূরা তাওবাঃ ১১৯) আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ صَادِقاً بِهَا دَخَلَ الجَنَّةَ)) رواه مسلم ٢٤٠٣

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি সত্যনিষ্ঠতা সহকারে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য দেবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"। (মুসলিম ২৪০৩) কেউ যদি এ কালেমাটির মৌখিক স্বীকৃতি দেয় আর অন্তরে তার দাবীকে প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করে, তাহলে তার মৌখিক স্বীকৃতি তাকে মুক্তি দিতে পারবে না। বরং সে মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অনুরূপ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর আনীত বিষয়কে বা তার কোন কিছুকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করাও সত্যনিষ্ঠতার পরিপন্থী বস্তু। কেননা, আল্লাহ তাআ'লা নিজের আনুগত্য করার নির্দেশ প্রদানের সঙ্গে রাসূলের আনুগত্য ও তাঁর সত্যায়ন করাকে সংযুক্ত করেছেন। যেমন, তিনি বলেন,

﴿قُلْ أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ﴾النور ٥٤

অর্থাৎ, "বলুন! আল্লাহর নির্দেশ মান্য করো, আর রাসূলের আনুগত্য করো"। (সূরা নূরঃ ৫৪)

৬। ইখলাসঃ বান্দা নিয়ত তথা সংকল্পকে শির্কের সমস্ত পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত রেখে স্বীয় আমলকে স্বচ্ছ রাখবে। সুতরাং তার সমস্ত কাজ ও কথা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের নিমিত্তে হবে। তাতে লোক দেখানোর উদ্দেশ্য বা খ্যাতি অর্জনের অভিলাষ অথবা কোন লাভের আকাঙ্ক্ষা কিংবা ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধ করার সাধ অথবা প্রকাশ্য বা গোপনীয় কোন প্রবৃত্তির সিদ্ধি, আল্লাহর হেদায়াতকে উপেক্ষা করে কোন ব্যক্তি, মাযহাব বা দলের অত্যধিক ভালবাসার বশবর্তী হয়ে আমল করার প্রবণতা থাকতে পারে না। বরঞ্চ সকল কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান এবং পারলৌকিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য হতে হবে। কোন মানুষের বিনিময় প্রদান বা কৃতজ্ঞতা পাওয়ার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿أَلاَ لله الدِّيْنُ الْخَالِصُ﴾ الزمر٣

অর্থাৎ, "সাবধান! বিশুদ্ধ আনুগত্য একমাত্র আল্লাহরই হক"। (সূরা যুমারঃ৩) আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ﴾البينة ٥

অর্থাৎ, "আর তাদেরকে এটা ব্যতীত কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে, নিজেদের দ্বীনকে একমাত্র তাঁরই জন্য খালিস করবে"। (সূরা বায়্যেনাঃ ৫) বুখারী (৪২৫) ও মুসলিম (৩৩) শরীফে ইতবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ، يَبْتَغِيْ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ)) متفق عليه ٤٢٥، ٣٣

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের উপর হারাম করে দেন"।

৭। ভালবাসাঃ এ মহান কালেমা ও তার নির্দেশ ও দাবীর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা থাকতে হবে। ফলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসবে এবং এ ভালবাসাকে পৃথিবীর সকল ভালবাসার উপর প্রাধান্য দিবে। ভালবাসার শর্ত-সমূহ ও করণীয় বিষয়গুলো পালন করবে। তাই আল্লাহকে ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভীতি ও আশা সহকারে ভালবাসবে। স্থান, সময়-কাল, ব্যক্তিবর্গ এবং কথা ও কর্মের মধ্যে আল্লাহ যা ভালবাসেন, তা তাকেও ভালবাসতে হবে। যেমন মক্কা, মদীনা ও সমূহ মসজিদ। সময় ও কালের মধ্যে যেমন, রমযান ও জিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিন। ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যেমন, আম্বিয়া ও রাসূলগণ, ফেরেশতা, শহীদ ও সৎলোকগণ। কাজ-কর্মের মধ্যে যেমন, নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্জ। কথার মধ্যে যেমন, যিক্‌র, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি। এটাও ভালবাসার পরিচয় যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে প্রিয় বস্তুগুলোকে স্বীয় প্রিয় বস্তু ও ইচ্ছার উপর প্রাধান্য দিবে। আল্লাহ তাআ'লা যা অপছন্দ করেন, সেও তা অপছন্দ করবে। কাজেই কুফ্‌রী, পাপাচার ও অবাধ্যতা ইত্যাদিকে মনে প্রাণে ঘৃণা করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يأَتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلاَيَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ﴾ المائدة ٥٤

অর্থাৎ, "হে মু'মিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় দ্বীন থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলিমদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না"। (সূরা মায়েদাঃ ৫৪)

'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লা-হ'র অর্থ

এ বাক্যটির অর্থ হলো, মৌখিক ও আন্তরিকভাবে স্বীকার করা যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) সকল মানবকুলের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আর এ স্বীকৃতির দাবী হলো, তাঁর নির্দেশাবলীর আনুগত্য করা। (অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে) তাঁর দেওয়া সংবাদ সত্য বলে বিশ্বাস করা। তিনি যে সব কাজ নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা। আর আল্লাহর ইবাদত তাঁরই প্রদত্ত বিধি-বিধান অনুযায়ী সম্পাদন করা।

এ বাক্যটির দুটো অংশ রয়েছে। যথা,

১। মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা।

২। মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর এই অংশ দু'টি তাঁর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার অস্বীকৃতি ঘোষণা করে। তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আর এই উভয় মহৎ গুণের দ্বারাই তিনি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব। এখানে (আব্‌দ)-এর অর্থ হলো, অধীনস্থ বান্দা। অর্থাৎ, তিনি মানুষ। অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় তিনিও সৃষ্ট। মানুষ হিসাবে তাদের উপর যা প্রযোজ্য, তাঁর উপরেও সমভাবে তা প্রযোজ্য। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ﴾ الكهف ١١٠

অর্থাৎ, "হে নবী বলে দাও, আমি তোমাদের মতনই একজন মানুষ"। (সূরা কাহাফঃ ১১০) তিনি আরো বলেন,

﴿ اَلْحَمْدُ لله الَّذِيْ أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً ﴾ الكهف١

অর্থাৎ, "সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি তাঁর বান্দার উপর কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাতে কোনরূপ বক্রতার অবকাশ রাখেন নাই"। (সূরা কাহাফঃ ১) আর 'রাসূল'-এর অর্থ হলো, তিনি সকল মানব সম্প্রদায়কে আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারী, সর্তককারী ও সুসংবাদদাতা হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন। এই উভয় গুণের সাক্ষ্য প্রদান তাঁর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করাকে খন্ডন করে। অনেক মানুষ যারা নিজেকে নবীর উম্মত বলে দাবী করে, তারা তাঁর ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি ক'রে তাঁকে বান্দার মর্যাদা থেকে সরিয়ে মা'বুদের মর্যাদায় ভূষিত করে থাকে। তাই আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাঁর নিকট ফরিয়াদ ও প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা এবং বিপদ মুক্তির কামনা করে থাকে। অথচ এসব কেবল মাত্র আল্লাহরই ক্ষমতাধীন। আবার অনেকে তাঁর রিসালাতকে অস্বীকার করে অথবা তাঁর অনুসরণে বাড়াবাড়ি করে এবং তাঁর প্রাপ্ত অধিকার তাঁকে না দিয়ে অন্যান্য মানুষের উক্তিসমূকে তাঁর উক্তিসমূহের উপর প্রাধ্যান্য দেয়। তাঁর সুন্নত থেকে দূরে থাকে ও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তাঁর আনীত বিধানের পরিপন্থী উক্তির উপর নির্ভর করে।

ঈমানের রূকনসমূহঃ

ঈমান হলো কথা ও কাজের নাম, যা পুণ্যময় কাজের দ্বারা বৃদ্ধি পায় এবং গুনাহ ও পাপাচারের দ্বারা হ্রাস পায়। অর্থাৎ, তা হলো, অন্তর ও জবানের উক্তি এবং অন্তর, জবান ও শরীরের কাজ। অন্তরের স্বীকৃতি হলো, তা বিশ্বাস করা এবং তার সত্যায়ন করা। আর জবানের উক্তি হলো, তা স্বীকার করা। আর অন্তরের কাজ হলো, নিষ্ঠার সাথে তা স্বীকার করা, তার প্রতি ভালবাসা পোষণ করা এবং সৎকর্মসমূহ সম্পাদনের জন্য তা গ্রহণ করা। আর শরীরের কাজ হলো, আদেশসমূহ পালন করা এবং নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকা। কুরআন ও সুন্নাহর দ্বারা প্রমাণিত যে, ঈমানের রয়েছে কয়েকটি মূল ভিত্তি। আর তা হলো, আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতার উপর, তাঁর কিতাবের উপর, রাসূল, আখেরাতের দিন এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾. [البقرة:٢٨٥]

অর্থাৎ, ""রাসূল সেই হেদায়াতকেই বিশ্বাস করেছেন, যা তাঁর পরোয়ারদিগারের নিকট হতে তাঁর প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং মু'মিনরাও বিশ্বাস করেছেন। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। (তারা বলে,) আমরা তাঁর পয়গম্বরের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং আনুগত্য করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে"।। (সূরা বাক্বারাঃ ২৮৫) সহীহ মুসলিমে আমীরুল মু'মিনীন উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, জিব্রাইল (আঃ) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন,

((الإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ))

অর্থাৎ, "আপনি আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতার উপর, তাঁর কিতাবের উপর, তাঁর রাসূলের, আখেরাতের

এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনবেন।" (মুসলিম ৮) এ ছয়টি বিষয়ই হলো, সেই সঠিক আক্বীদার মৌলিক বিষয় বস্তু, যা নিয়ে নাযিল হলো আল্লাহর মহান গ্রন্থ এবং প্রেরিত হলেন আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)। আর এগুলোই হচ্ছে ঈমানের রুক্নসমূহ।

প্রথমতঃ আল্লাহর প্রতি ঈমানঃ

আল্লাহর প্রতি ঈমান হলো, আল্লাহর উলূহিয়্যাত/উপাস্যত্বের, রুবূবিয়্যাত/ প্রতিপালকত্বের এবং তাঁর নাম ও গুণাবলীর একত্ববাদকে বিশ্বাস করা। আর আল্লাহর প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো,

১। এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, তিনিই সত্যিকার উপাস্য, একমাত্র ইবাদতের যোগ্য। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। কারণ, তিনিই বান্দাদের স্রষ্টা, তাদের প্রতি অনুগ্রহকারী, তাদের রিজিক দাতা এবং তাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে অবহিত। তিনি তাঁর অনুসরণকারীদের প্রতিফল দানে এবং অবাধ্যদের শাস্তি প্রদানে সক্ষম। আর এই ইবাদতের প্রকৃত দাবী হলো, যাবতীয় প্রকারের ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য বিনতি সহকারে, সাওয়াবের আশায়, শ্রদ্ধাজড়িত ভয় এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ ভালবাসা সহকারে ও তাঁর বিরাটত্ব ও বড়ত্বের সামনে মস্তক অবনত ক'রে নিবেদিত করা। কুরআনের অধিকাংশ আয়াত এ মহান মৌলিক নীতি সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّيْنَ أَلاَ لِلهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ﴾الزمر ٣

অর্থাৎ, "দ্বীনকে তাঁরই জন্য খালেস করে আল্লাহর ইবাদত করো। সাবধান! খালেস আনুগত্য তো কেবল মাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য"। (সূরা যুমারঃ ২-৩) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾ الإسراء ٢٣

অর্থাৎ, "তোমার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা কেবল মাত্র তাঁরই ইবাদত করবে"। (সূরা ইসরাঃ ২৩) তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ فَادْعُوْا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ﴾ غافر ١٤

অর্থাৎ, "অতএব, তোমরা আল্লাহকে খাঁটি বিশ্বাস সহকারে ডাকো, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে"। (সূরা গাফেরঃ ১৪) ইবাদতের প্রকার অনেক। তন্মধ্যে হলো, দুআ করা, নিরাপত্তার জন্য ভয় করা, কামনা করা, ভরসা করা, আশা করা, শ্রদ্ধাজড়িত ভয় করা, বিনত হওয়া, ভয় করা, অভিমুখী হওয়া, সাহায্য কামনা করা, আশ্রয় চাওয়া, ফরিয়াদ করা এবং জবাই করা ও মানত করা ইত্যাদি অনেক প্রকারের ইবাদত যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য সম্পাদন করা বৈধ নয়। অন্য কারো জন্য তা সম্পাদন করলে, শির্ক ও কুফ্রী হবে।

দুআর প্রমাণ মহান আল্লাহ বাণী,

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾غافر: ٦٠

অর্থাৎ, "তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি সাড়া দেবো। যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।" (সূরা গাফেরঃ ৬০) আর হাদীসে নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

((الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ)) رواه الترمذي ٢٩٦٩

অর্থাৎ, "দুআই হলো ইবাদত।" (তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে তিরমিযী আলবানীঃ ২৯৬৯)

নিরাপত্তার জন্য ভয় করার দলীল, (অর্থাৎ, ভয় কেবল আল্লাহকেই করতে হবে তার দলীল,) আল্লাহর বাণী,

﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾. [آل عمران:١٧٥].

অর্থাৎ, "সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না, বরং তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাকো, তবে কেবলমাত্র আমাকেই ভয় করো।" (আলে-ইমরানঃ ১৭৫)
কামনার প্রমাণ হলো আল্লাহর বাণী,

﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾. [الكهف:١١٠].

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালন-কর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।" (সূরা কাহাফঃ ১১০)
ভরসার দলীল, আল্লাহর বাণী,

﴿ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾. [المائدة:٢٣].

অর্থাৎ, "আর আল্লাহর উপরই ভরসা করো যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।" (সূরা মায়েদাঃ ২৩) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾. [الطَّلاق:٣].

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনি যথেষ্ট।" (সূরা তালাক্বঃ ৩)
আশা, শ্রদ্ধাজড়িত ভয় এবং বিনয় হওয়ার প্রমাণ, আল্লাহর বাণী,

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾. [الأنبياء:٩٠].

অর্থাৎ, "তারা সৎকর্মে ঝাপিয়ে পড়তো এবং তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকতো ও তারা ছিলো আমার কাছে বিনীত।" (২১ঃ ৯০)
ভয় করার দলীল, আল্লাহর বাণী,

﴿ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ﴾. [البقرة:١٥٠].

অর্থাৎ, "কাজেই তাদের আপত্তিতে ভীত হয়ো না। আমাকেই ভয় করো।" (বাক্বারাঃ ১৫০)
অভিমুখী হওয়ার প্রমাণ, আল্লাহর বাণী,

﴿ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴾ الزُّمر:٥٤.

অর্থাৎ, "তোমারা তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও এবং তাঁর আজ্ঞাবহ হও।" (সূরা যামারঃ ৫৪)
আর **সাহায্য প্রার্থনা করার দলীল হলো,** আল্লাহর বাণী,

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾. [الفاتحة:٥].

অর্থাৎ, "আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।" (সূরা ফাতিহাঃ ৫) আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ)) رواه الترمذي ٢٥١٦

অর্থাৎ, "যখন সাহায্য কামনা করবে, তখন তা আল্লাহর কাছেই করবে।"। (তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে তিরমিযী আলবানীঃ ২৫১৬)

আশ্রয় প্রার্থনা করার দলীল হলো, আল্লাহর বাণী,

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ الناس:١

অর্থাৎ, "বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার।" (সূরা নাস৪ঃ ১)

ফরিয়াদ করার দলীল হলো, আল্লাহর বাণী,

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ﴾. [الأنفال:٩].

অর্থাৎ, "তোমরা যখন ফরিয়াদ করতে আরম্ভ করেছিলে স্বীয় পালনকর্তার নিকট, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদ মঞ্জুর করেছিলেন।" (সূরা আনফালঃ ৯)

জবাই করার দলীল হলো, আল্লাহর বাণী,

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ العَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾. [الأنعام:١٦٣].

অর্থাৎ, "আপনি বলুন, আমার নামায, আমার কোরবানী এবং জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। তাঁর কোন শরীক নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল।" (সূরা আনআমঃ ১৬৩) আর হাদীসে এর প্রমাণ হলো, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর উক্তি,

((لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله)) رواه مسلم ١٩٧٨

অর্থাৎ, "আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করেছেন যে গায়রুল্লাহর নামে জবাই করে।" (মুসলিম ১৯৭৮)

মানত করার দলীল হলো, আল্লাহর বাণী,

﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾. [الإنسان:٧].

অর্থাৎ, "তারা মানত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে, যেদিনের অনিষ্ট হবে সুদূরপ্রসারী।"(সূরা দাহারঃ৭) (উল্লিখিত জিনিসগুলো সবই আল্লাহর ইবাদত) এ ছাড়া অনেক অভ্যাসগত জিনিস রয়েছে, সেগুলোও যদি আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অনুসরণের নিয়তে করা হয়, তাহলে তা সৎ নিয়তের গুণে ইবাদতে পরিণত হয়। যেমন, ঘুমানো, পানাহার করা, উপার্জন করা এবং বিবাহ করা ইত্যাদি।

২। আল্লাহর উপর ঈমানের আরেকটি দিক হলো, ইসলামের মূল পাঁচটি ভিত্তিসহ ঐ সব বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, যা আল্লাহ বান্দাদের উপর অত্যাবশ্যক ও ফরয করে দিয়েছেন। আর পাঁচটি ভিত্তি হলো, এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকার মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁর প্রেরিত রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের রোযা রাখা এবং সামর্থ্যবানদের জন্য বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ করা। এ ছাড়া অন্যান্য ফরয কার্যাদি, যা পবিত্র শরীয়ত বিধিবদ্ধ করেছে।

৩। এ বিশ্বাসও আল্লাহর প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত যে, তিনিই গোটা সৃষ্টিজগতের একমাত্র স্রষ্টা, পরিচালক, নিজের জ্ঞান ও শক্তির দ্বারা যেভাবে ইচ্ছা সকলকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। তিনিই দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক। সকলের প্রতিপালক। তিনি ছাড়া কোন স্রষ্টা নেই। তিনি বান্দাদের সংস্কার এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাতে মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত, সেদিকে আহ্বান জানাতে যুগে যুগে নবী-রাসূল ও কিতাব পাঠিয়েছেন। এ সব ব্যাপারে তাঁর কোন শরীক নেই। যেমন তিনি বলেন,

﴿اَللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ﴾الزمر ٦٢

অর্থাৎ, "আল্লাহই প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সব বিষয়ের কর্ম বিধায়ক"। (সূরা যুমারঃ ৬২)

৪। আল্লাহর প্রতি ঈমানের মধ্যে এটাও শামিল যে, কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর যেসব গুণাবলী ও সুন্দর নামের উল্লেখ হয়েছে, তা হুবহু সেই ভাবেই বিশ্বাস করা। এতে কোন রূপ বিকৃতি অস্বীকৃতি, ধরণ-গঠণ ও সাদৃশ্য আরোপের চেষ্টা না করে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, ঠিক সেই ভাবেই প্রতিষ্ঠিত করা। আর নামগুলোর মধ্যে যে মহান অর্থসমূহ নিহিত রয়েছে তার উপরও ঈমান আনা। কেননা, এগুলো গৌরবময় আল্লাহর এমন গুণ বিশেষ যা কোন সৃষ্টির সাথে তুলনা না করে তাঁকে তাঁর উপযুক্ত গুণে গুণান্বিত করা অত্যাবশ্যক। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴾ الشورى ١١

অর্থাৎ, "কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্ব দ্রষ্টা"। (সূরা শুরাঃ ১১)

দ্বিতীয়তঃ ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনাঃ

ফেরেশতাদের প্রতি সমষ্টিগত ও বিশদভাবে ঈমান আনতে হবে। সমষ্টিগত বলতে আমাদেরকে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, আল্লাহ তাআ'লা বিপুল সংখ্যক ফেরেশতাকে তাঁর আনুগত্যের স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা বিভিন্ন প্রকারের। কিছু ফেরেশতা আল্লাহর আরশ বহন করেন। কিছু জান্নাত ও দোযখের রক্ষক। একদল মানুষের আমলনামা সংরক্ষণ করেন। আর বিশদভাবে বলতে, আমাদেরকে ঐ সব ফেরেশ-তাদের প্রতি বিশদ ঈমান আনতে হবে, যাঁদের নাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূল উল্লেখ করেছেন। যেমন জিবরাইল, মিকাইল, মালিক (জাহান্নামের দারওয়ান) এবং সুর ফুঁকার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা ইসরাফিল। ফেরেশ-তাদেরকে আল্লাহ নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((خُلِقَتْ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ نُوْرٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ)) رواه مسلم ٢٩٩٦

অর্থাৎ, "ফেশেতাগণ নূরের সৃষ্টি, জ্বিনকুল খাঁটি আগুন থেকে সৃষ্টি এবং আদমকে যা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তা আল্লাহ (কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে) তোমাদেরকে বলে দিয়েছেন"। (মুসলিম ২৯৯৬)

তৃতীয়তঃ কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনাঃ

সমষ্টিগতভাবে এ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাঅ'লা সত্যের প্রকাশ ও তার প্রতি আহ্বানের জন্য যুগে যুগে নবী ও রাসূলদের উপর বহু সংখ্যক কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর যে সমস্ত কিতাবের নাম আল্লাহ উল্লেখ করেছেন, তার প্রতি আমাদেরকে বিশদভাবে ঈমান আনতে হবে। যেমন, তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবূর ও কুরআন। এ গুলোর মধ্যে কুরআনই সর্বোত্তম ও সর্বশেষ কিতাব, যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সংরক্ষক ও সত্যায়নকারী। সমগ্র উম্মতকে এখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) কর্তৃক বর্ণিত বিশুদ্ধ সুন্নত সহ এই কুরআনেরই অনুসরণ করতে হবে। কেননা, মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে সমস্ত মানুষ ও জ্বিনদের জন্য রাসূল করে পাঠিয়েছেন। আর তাঁর প্রতি এই মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। যাতে করে তিনি এরই দ্বারা তাদের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করেন। আর এই কুরআনকে মহান আল্লাহ অন্তরের যাবতীয় রোগের নিরাময়কারী, প্রত্যেকটি বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনাদানকারী এবং বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়াত ও রহমতের উৎস বানিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴾ الأنعام١٥٥

অর্থাৎ, "এটি এমন একটি গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি, খুব মঙ্গলময়, অতএব এর অনুসরণ করো এবং ভয় করো। যাতে তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হও"। (সূরা আনআমঃ ১৫৫) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴾ النحل٨٩

অর্থাৎ, "আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যেটি এমন যে, তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হেদায়াত, রহমত এবং মুসলিমদের জন্য সুসংবাদ"। (সূরা নাহ্‌লঃ ৮৯)

চতুর্থতঃ রাসূলগণের প্রতি ঈমান

রাসূলগণের প্রতি সমষ্টিগতভাবে ও বিশদভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। তাই আমাদেরকে এই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, আল্লাহ তাআ'লা তাঁর বান্দাদেরকে সুসংবাদদানকারী, সতর্ককারী এবং সত্যের প্রতি আহ্বানকারী হিসেবে বহু রাসূল পাঠিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন,

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوْا اللهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ ﴾ النحل٣٦

অর্থাৎ, "আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছি। আর তাঁর সাহায্যে সকলকে সাবধান করে দিয়েছি যে, আল্লাহর বান্দেগী করো এবং তাগুতের বান্দেগী হতে দূরে থাকো"।(সূরা নাহ্‌লঃ ৩৬) যারা তাঁদের দাওয়াত গ্রহণ করবে, তারা সুফল লাভে ধন্য হবে। আর যারা তাঁদের বিরোধিতা করবে, তারা লাঞ্ছিত ও অনুতপ্ত হবে। আর আমাদেরকে এও বিশ্বাস করতে হবে যে, প্রত্যেক নবীদের দাওয়াত একই ছিলো। তা ছিলো, আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত এবং তাঁকেই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য মনে করার আহ্বান। শরীয়ত ও বিধি-বিধানে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য ছিলো। আর আমাদেরকে এও বিশ্বাস করতে হবে যে, মহান আল্লাহ তাঁদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হলেন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)। যেমন পূত-পবিত্র মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّيْنَ عَلَى بَعْضٍ ﴾. [الإسراء:٥٥].

অর্থাৎ, "আমি তো কতক পয়গম্বরকে কতক পয়গম্বরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।" (সূরা ইসরাঃ ৫৫) তিনি আরো বলেন,

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ ﴾. [الأحزاب:٤٠].

অর্থাৎ, মুহাম্মাদ তোমাদের কারো পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।" (সূরা আহযাবঃ ৪০) নবীদের মধ্যে যাঁদের নাম আল্লাহ উল্লেখ করেছেন অথবা যাঁদের নাম রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে, বিশদভাবে ও নির্দিষ্টভাবে তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। যেমন, হযরত নুহ, হুদ, সালেহ, ইবরাহীম ইত্যাদি। তাঁদের প্রতি এবং আমাদের নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম বর্ষণ হোক।

পঞ্চমতঃ আখেরাতের দিনের উপর ঈমান

পরকাল সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর রাসূল যে সব সংবাদ দিয়েছেন, যা মৃত্যুর পর সংঘটিত হবে, যেমন, কবরের পরীক্ষা, সেখানকার আযাব, নিয়ামত, রোজ কিয়ামতের ভয়াবহতা ও প্রচন্ডতা, পুলসেরাত, মীযান প্রতিষ্ঠা, হিসাব-নিকাশ, প্রতিফল প্রদান, মানুষের মধ্যে আমলনামা বিতরণ, কারো ডান হাতে, কারো বাম হাতে বা পিছন দিক থেকে তা গ্রহণ এ সব কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা হলো আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে প্রদত্ত বিশেষ নিয়ামত 'হাওযে কাওসার'-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং সুন্নাতে বর্ণিত যে, প্রত্যেক নবীর জন্য

'হওযে কাওসার' হবে। জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি বিশ্বাস, জান্নাতীদের আল্লাহ্ পাকের দর্শন ও কথোপকথন ইত্যাদি সহ অন্যান্য যে সব ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে তার প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করাও উক্ত বিশ্বাসের আওতাভুক্ত বিষয়। আর এ সবের প্রতি ঈমান আনতে হবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায়।

ষষ্টতঃ ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাসঃ

ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনা বলতে নিম্নের ৪টি বিষয়ের উপর ঈমান আনা বুঝায়। যেমন,

প্রথমতঃ এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, অতীতে যা কিছু ঘটেছে, বর্তমানে যা ঘটছে এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে এ সব কিছু সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্পূর্ণ অবহিত। বান্দাদের অবস্থা, তাদের রিজিক, মৃত্যুক্ষণ, দৈনন্দিন কার্য-কর্ম সহ যাবতীয় ব্যাপারে তিনি সম্যকভাবে অবগত আছেন। তাঁর নিকট এ সবের কোন কিছুই গুপ্ত নয়। যেমন তিনি বলেন,

﴿ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾ التوبة ١١٥

অর্থাৎ, "নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেকটি বস্তু সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত"। (সূরা তাওবাঃ ১১৫)

দ্বিতীয়তঃ এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ পাক যা কিছু নির্ধারণ ও ফায়সালা করেছেন, সব কিছুই লিপিবদ্ধ রয়েছে। যেমন তিনি বলেন,

﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِيْنٍ ﴾ يس١٢

অর্থাৎ, "আর আমি প্রত্যেকটি বস্তু একটি সুস্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি"। (সূরা ইয়াসীনঃ ১২)

তৃতীয়তঃ আল্লাহর কার্যকরী ইচ্ছার উপর বিশ্বাস করা। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা-ই বাস্তবায়িত হয়। আর যা ইচ্ছা করেন না, তা হয় না। তিনি বলেন,

﴿ كَذَٰلِكَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ آل عمران٤٠

অর্থাৎ, "এ ভাবেই আল্লাহ যা চান, তা সম্পাদন করেন"। (সূরা আলে-ইমরানঃ ৪০)

চতুর্থতঃ এ বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন তা ঘটার পূর্বেই তা সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

﴿ وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ﴾ الصَّفات:٩٦

অর্থাৎ, "আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা নির্মাণ করছো সবাইকে সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা সাফ্ফাতঃ ৯৬)

শির্ক ও তার প্রকারঃ

শির্ক হলো বান্দার আল্লাহর রুবূবিয়্যাতে অথবা তাঁর উলূহিয়্যাতে কিংবা তাঁর নাম ও গুণাবলীতে শরীক স্থির করা। এই শির্ক দু'প্রকারের যথা, বড় শির্ক এবং ছোট শির্ক।

প্রথমতঃ বড় শির্কঃ বড় শির্ক হলো ইবাদতের কোন কিছুকে গায়রুল্লাহর নামে সম্পাদন করা। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাওবা না করে মারা গেলে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে। অনুরূপ এই শির্ক কর্মসমূহকেও নষ্ট করে দেবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ﴾. [الأنعام:٨٨].

অর্থাৎ, "যদি তারা শির্ক করে, তাবে তাদের কাজকর্ম ব্যর্থ হয়ে যাবে।" (সূরা আনআমঃ ৮৮) বড় শির্ক থেকে নিষ্ঠার সাথে তাওবা না করলে আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন না। তিনি বলেন,

﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾. [النساء:٤٨].

অর্থাৎ, "নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক আল্লাহর অংশীদার স্থাপন করলো, সে অতীব বড় অপবাদ আরোপ করলো।" (সূরাঃ ৪৮) আর বড় শির্কের প্রকারসমূহের মধ্যে হলো, গায়রুল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা অথবা গায়রুল্লাহর জন্য মানত করা কিংবা গায়রুল্লাহর নামে জবাই করা বা অন্যান্যদের আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত ক'রে তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করা, যেমন আল্লাহর প্রতি করে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ ﴾ البقرة:١٦٥

অর্থাৎ, "আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি হয়ে থাকে।" (সূরা বাক্বরাঃ ১৬৫)

দ্বিতীয়তঃ ছোট শির্কঃ ছোট শির্ক হলো কুরআন ও হাদীসে যাকে শির্ক নামে আখ্যায়িত করেছে। তবে তা বড় শির্কের পর্যায়ভুক্ত নয়। এই প্রকারের শির্ক মিল্লাতে ইসলাম থেকে বহিস্কার করে না। কিন্তু তা তাওহীদকে কম করে দেয়। যেমন স্বল্প পরিমাণ 'রিয়া' (লোক দেখানো কোন কাজ), অথবা যা বড় শির্কের মাধ্যম হয়, কিন্তু সে পর্যন্ত পৌঁছে না। যেমন কবরের নিকট নামায পড়া এবং এই বিশ্বাস নিয়ে গায়রল্লাহর নামে কসম খাওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ উপকার ও অপকার করতে পারে না ও বলা যে, আল্লাহ এবং অমুক চাইতো ইত্যাদি। কেননা, (রিয়া যে ছোট শির্ক তার দলীল) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ))، فَسُئِلَ عَنْهُ، فَقَالَ: ((الرِّيَاءُ)) رواه أحمد وإسناده جيد

অর্থাৎ, "তোমাদের উপর আমি যে জিনিসের সব থেকে বেশী আশঙ্কা করি তা হলো লঘু শির্ক। আর এই লঘু শির্ক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তা হলো, 'রিয়া' (লোক দেখানো কাজ)।" (ইমাম আহমদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসের সানাদ শুদ্ধ।) তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আরো বলেন,

((مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُوْنَ اللهِ فَقَد أَشْرَكَ)) رواه أحمد وإسناده صحيح

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর শপথ গ্রহণ করলো, সে শির্ক করলো।" (হাদীসটি ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন এবং তার সানাদ সহীহ।) আর ছোট শির্কেরই পর্যায়ভুক্ত কার্যকলাপ হলো, রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদ দূরীকরণের জন্য বা তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাবিজ, মাদুলি এবং বালা ও সুতা ইত্যাদি ব্যবহার করা। কিন্তু যদি এগুলো এই বিশ্বাস নিয়ে ব্যবহার করে যে, এগুলোই উপকার ও অপকার করতে পারে, এগুলো কেবল মাধ্যমই নয়, তাহলে তা বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত হবে।

মুক্তিপ্রাপ্ত দলের সংক্ষিপ্ত আক্বীদা/বিশ্বাসঃ

আহলে সুন্নাহর যে আক্বীদা, সেই আক্বীদাই হলো 'ফিরক্বা নাজীয়া'র/মুক্তিপ্রাপ্তদলের। আর তা হলো, সত্যবাদী মু'মিন এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহই একমাত্র প্রতিপালক ও উপাস্য। তিনিই একমাত্র পূর্ণতার অধি-কারী। ফলে সে নিষ্ঠার সাথে কেবল তাঁরই ইবাদত করে। আর সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই স্রষ্টা, উদ্ভাবক,

রূপদাতা, আহারদাতা, দিলে তিনিই দেবেন আর না দিলেও তিনিই এবং তিনি সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকারী ও পরিচালক। তিনিই সত্যিকার উপাস্য। তিনিই আদি তাঁর পূর্বে কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিলো না। তিনিই অন্ত তাঁর পর কোন কিছুই থাকবে না। তিনি প্রকাশমান তাঁর উপরে কিছুই নেই। তিনি অপ্রকাশ্য তাঁর কাছে অপ্রকাশ কিছু নেই। তিনি সব অর্থে ও সব দিক দিয়ে সর্বোচ্চ ও সবার ঊর্ধ্বে। তাঁর সত্তা সবার ঊর্ধ্বে, তাঁর মর্যাদাও সবার ঊর্ধ্বে এবং তাঁর পরাক্রমশালিতা সবার উপরে। তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত। আর তাঁর (আরশে) অধিষ্ঠিত হওয়া ঐরূপ, যেরূপ হওয়া তাঁর মহান ও গৌরবময় সত্তার জন্য সামঞ্জস্য পূর্ণ। আর তিনি ঊর্ধ্বে হওয়া সত্ত্বেও নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব বিষয়ই তাঁর আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে। তিনি তাঁর জ্ঞানের দ্বারা বান্দাদের সাথে থাকেন। তাদের সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। তিনি অতি নিকটই থাকেন এবং কুবল করেন। তিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টি থেকে অমুখাপেক্ষী। কিন্তু প্রত্যেক সৃষ্টি সব সময় নিজেদের অস্তিত্ব এবং তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস সংঘটনের ব্যাপারে তাঁর মুখাপেক্ষী। কেউ নিমেষের জন্যও তাঁর থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। তিনি করুণাময় অত্যন্ত মেহেরবান। বান্দারা দুনিয়া ও আখেরাতের যে নিয়ামতই লাভ করেছে, তা সবই তাঁর পক্ষ হতে। তিনি কল্যাণ প্রদানকারী এবং অকল্যাণ থেকে রক্ষাকারী।

এও তাঁর রহমতেরই অন্তর্ভুক্ত যে, তিনি প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশে নিকটের আসমানে অবতরণ ক'রে বলেন, "কে আছে এমন, যে আমার কাছে চাইবে আর আমি তাকে তা দান করবো। কে আছে এমন, যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর আমি তাকে ক্ষমা করবো।" এই অবস্থা ফজর পর্যন্ত থাকে। আর আল্লাহ ঐভাবেই অবতরণ করেন, যেভাবে অবতরণ করা তাঁর গৌরবময় সত্তার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি এমন প্রজ্ঞাময় যে, স্বীয় আইনপ্রণয়ন ও (সব কিছু) নির্ধারণ করার ব্যাপারে পূর্ণ কৌশলের অধিকারী।কোন জিনিস অনর্থক সৃষ্টি করেন নি। যত আইন ও বিধান প্রণয়ন করেছেন সবই উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে। তিনি তাওবা কবুলকারী ক্ষমাশীল। তিনি তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং তাঁদের অনেক পাপ মাফ করে দেন। যারা তাওবা করে, ক্ষমা চায় এবং তাঁরই অভিমুখী হয়, তাদের বড় বড় পাপও তিনি মাফ করে দেন। তিনি এমন গুণগ্রাহী যে, স্বল্প আমল গ্রহণ করেন এবং তার নেকী ও প্রতিদান দেন অনেক বেশী। আবার কৃতজ্ঞ-জনদের স্বীয় অনুগ্রহ থেকে বেশী করে দান করেন।

প্রকৃত মু'মিন আল্লাহকে তাঁর সত্তাগত গুণে ঐভাবেই গুণান্বিত করে, যেভাবে তিনি নিজেকে এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁকে গুণান্বিত করেছেন। যেমন, তাঁর পরিপূর্ণ জীবন। তাঁর শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তি। তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা, মাহাত্ম্যের ও বড়ত্বের অধিকারী হওয়া। তাঁর প্রতাপ, গৌরব, সৌন্দর্য এবং পূর্ণতা ও সর্ববিধ প্রশংসা।

কুরআনে উল্লিখিত এবং অব্যাহত ধারায় হাদীসের বর্ণনার ভিত্তিতে সে (মু'মিন) এ কথাও বিশ্বাস করে যে, মু'মিনরা জান্নাতে তাদের মহান প্রতিপালককে প্রকাশ্যে দেখবে। আর তাঁর দর্শন এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের এই নিয়ামত হবে জান্নাতের অতীব মহান নিয়ামত এবং সর্বাধিক তৃপ্তিকর জিনিস। আর বিশ্বাস করে যে, তাওহীদ ছাড়াই যে মারা যাবে, সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে। আর মু'মিনদের মধ্যে কাবীরা (বড়) গুনাহ সম্পাদন- কারীরা যদি তাওবা না করেই মারা যায়, আর কোন কাফ্ফারার দ্বারা তাদের পাপ মোচন যদি না হয় ও কোন সুপারিশও যদি লাভ করতে না পারে, তাহলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করলেও তাতে চিরস্থায়ী হবে না। এমন কি যাদের অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে তারা কেউ জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না, বরং সেখান থেকে বের হবে। আর ঈমান হার্দিক বিশ্বাস, কথা ও কাজ এবং শারিরীক কর্মসমূহ ও জবানের স্বীকৃতি সব কিছুকেই শামিল করে থাকে। যে এগুলোর পূর্ণ রূপ দান করবে, সে-ই হবে সত্যিকারের মু'মিন এবং সে-ই পুণ্য লাভের যোগ্য হবে ও শাস্তি থেকে নিস্কৃতি পাবে। পক্ষান্তরে যার মধ্যে এগুলোর কোন কিছুর ঘাটতি থাকবে, সেই ঘাটতির পরিমাণ অনুপাতে তার ঈমানও কমে যাবে। এই জন্যই বলা হয় যে, ঈমান আনুগত্য ও পুণ্যময় কাজের দ্বারা বৃদ্ধি পায় এবং অন্যায় ও পাপের দ্বারা হ্রাস পায়।

মু'মিন এও সাক্ষ্য দেয় যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তিনি তাঁকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন। যেন তিনি এ দ্বীনকে সকল দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন। তিনি মু'মিনদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। তিনি নবীদের শেষ। তিনি মানুষ ও জ্বিনদের প্রতি সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর প্রতি আহ্বানকারী এবং দীপ্যমান প্রদীপ হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁকে দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ সহ প্রেরণ করেছিলেন। যাতে করে সৃষ্টিকুল কেবল আল্লাহরই ইবাদত করে এবং তাঁর প্রদত্ত রুজি দ্বারা ইবাদত সম্পাদনে সাহায্য গ্রহণ করে। অনুরূপ সে (মু'মিন) বিশ্বাস করে যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) ছিলেন সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী, সব থেকে বেশী সত্যবাদী, সবার চেয়ে বেশী নসীহতকারী এবং সর্বাপেক্ষা সুন্দর ভাষণ দানকারী। তাই সে তাঁর সম্মান করে, তাঁকে ভালবাসে, তাঁর ভালবাসাকে সকল সৃষ্টির ভালবাসার উপর প্রাধান্য দেয়, দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে ও শাখা-প্রশাখায় তাঁরই অনুসরণ করে এবং তাঁর উক্তি ও মতাদর্শকে অন্য সকলের উক্তি ও মতাদর্শের উপর প্রাধান্য দেয়।

আর মু'মিন বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তাঁকে (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে) এমন অনেক ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন যা অন্য কাউকে দান করেন নি। তিনি ছিলেন সৃষ্টি মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান, মহান প্রতিপত্তি এবং সকল বৈশিষ্ট্যে পূর্ণতার অধিকারী। এমন কোন কল্যাণ নেই যার প্রতি উম্মতকে দিকনির্দেশ করেন নি এবং এমন কোন অকল্যাণ নেই যা থেকে উম্মতদের সতর্ক করেন নি। অনুরূপ মু'মিন আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত সকল গ্রন্থসমূহকে এবং আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত তার জানা-অজানা সকল রাসূলগণকে বিশ্বাস করে। ঈমান আনার ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য সূচিত করে না। তাঁদের সকলের কথা ছিলো একই। আর তা হলো, কেবল সেই আল্লাহরই ইবাদত করা, যার কোন শরীক নেই। আর সর্বপ্রকার ভাগ্যের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে। মনে করে যে, বান্দার সমূহ কর্ম, ভাল হোক বা মন্দ, তা সবই আল্লাহর জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাঁর কলম দ্বারা লিপিবদ্ধ। তাঁর ইচ্ছার দ্বারা কার্যকর এবং তাঁর কৌশলের সাথে সম্পর্কিত। তিনি তাঁর বান্দার (করা ও না করার) সামর্থ্য ও ইচ্ছা সৃষ্টি করেছেন। তাদের যাবতীয় কথা ও কাজ এই ইচ্ছা অনুপাতেই সংঘটিত হয়। কোন কিছু করার উপর তিনি তাদের বাধ্য করেন নি। বরং তিনি (করা ও না করার) তাদেরকে ইখতিয়ার দিয়েছেন। তিনি তাঁর সুবিচার ও কৌশলের ভিত্তিতে মু'মিনদেরকে এই বিশেষত্ব দান করছেন যে, তাদের অন্তরে ঈমানের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। আর কুফরী, পাপাচার এবং অবাধ্যতার প্রতি তাদের ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

এও (দ্বীনের) মৌলিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যে, মু'মিন আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য এবং মুসলিমদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জন্য ও সর্ব সাধারণের জন্য হিতাকাংক্ষা রাখবে। ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজে বাধা প্রদান করবে। কেননা, শরীয়ত কর্তৃক এগুলো ফরয কাজ। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখার প্রতি গুরুত্ব দেবে। আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এবং যার তার উপর অধিকার আছে, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবে। সকল সৃষ্টির প্রতিও অনুগ্রহ করবে। সুন্দর ও উত্তম নৈতিকতার দাওয়াত দেবে এবং মন্দ ও নোংরা চরিত্রের ব্যাপারে নিষেধ দান করবে। মু'মিন এও বিশ্বাস করে যে, মু'মিনদের মধ্যে ঈমান ও প্রত্যয়ের দিক দিয়ে সেই পরিপূর্ণ, যার আমল ও আখলাক তাদের সবার চেয়ে সুন্দর। কথার দিক দিয়ে যে বেশী সত্যবাদী। যে সবার থেকে বেশী কল্যাণ ও অনুগ্রহশীল এবং যে প্রত্যেক নোংরামী থেকে সবার চেয়ে দূরে থাকে। অনুরূপ সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। জেহাদ হলো দ্বীনের সর্বোচ্চ শাখা। এই জেহাদ জ্ঞানের দ্বারাও হয় আবার অস্ত্রের দ্বারাও। এই জেহাদ প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয। তারা প্রত্যেকে সাধ্যানুসারে স্বীয় দ্বীনের রক্ষার্থে জেহাদ করবে। জেহাদ করার জন্য প্রত্যেক শাসকের সাথ দেবে, তাতে সে সৎ হোক বা অসৎ। তবে এই জেহাদ তার শর্তাবলী ও যথার্থ কারণসমূহের ভিত্তিতে হবে।

(দ্বীনের) আরো মৌলিক বিষয় হলো, মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করার কাজে উৎসাহ দান করা এবং গুরুত্ব সহকারে তার যত্ন নেওয়া। তাদের হার্দিক ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করার ও পরস্পরকে জোড়ার চেষ্টা করা। বিচ্ছিন্নতা, শত্রুতা এবং (পরস্পর) বিদ্বেষ পোষণ করা থেকে সতর্ক করা। আর যেসব উপায়-উপকরণ দ্বারা এ কাজ সমাধা হওয়া সম্ভব, সেই সব উপায়-উপকরণকে কাজে লাগানো। অনুরূপ সৃষ্টিকে কষ্ট দিতে নিষেধ করা, তার জান, মাল সম্ভ্রম এবং প্রত্যেক অধিকারের ব্যাপারে কষ্ট দিতেও বাধা প্রদান করা। প্রত্যেক ব্যাপারে মুসলিম ও কাফের সকলের সাথে সুবিচার করার নির্দেশ দেওয়া।

আর মু'মিন বিশ্বাস করে যে, উম্মতের মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ উম্মত হচ্ছে উম্মতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)। এদের মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর সাহাবীগণ, বিশেষ করে খুলাফায়ে রাশেদীন, জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবীগণ, বদর যুদ্ধে ও 'বায়আ'তে রিযওয়ান'এ অংশ গ্রহণ-কারী সাহাবীগণ এবং (ঈমান আনয়নে) যেসব মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ অগ্রবর্তী ও প্রথম ছিলেন, সেই সব সাহাবীগণ। কাজেই সে সাহাবী (রাযীআল্লাহু আনহুম)দের ভালবাসে। এই ভালবাসাকে আল্লাহর দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে। তাঁদের ভাল দিকগুলো প্রচার করে এবং তাঁদের মন্দের ব্যাপারে যা কথিত, তা থেকে নীরবতা অবলম্বন করে। অনুরূপ হেদায়াত প্রাপ্ত আলেম, ন্যায়পরায়ণ শাসক এবং যাঁদের দ্বীনে রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও মুসলিমদের উপর যাঁদের রয়েছে বহু অনুগ্রহ, তাঁদের সম্মান করাকে সে আল্লাহর দ্বীনেরই আওতা-ভুক্ত মনে করে। সে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে যে, তিনি যেন তাঁদের রক্ষা করেন সংশয়, শির্ক, মুনাফেকী, (পারস্পরিক) বিরোধ এবং মন্দ চরিত্রসমূহ থেকে এবং মৃত্যু পর্যন্ত যেন তাঁদেরকে তাঁদের নবীর দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

এই হলো (দ্বীনের) সার্বিক মৌলিক বিষয়সমূহ যা বিশ্বাস করেন মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অনুসারীরা এবং দাওয়াত দেন এরই প্রতি।

الطهارة

পবিত্রতার বিধান

পবিত্রতা ও অপবিত্রতাঃ

অপবিত্রতাঃ অপবিত্রতার অর্থ হচ্ছে এমন মলিনতা, অশুচিতা, যা থেকে একজন মুসলিমকে বেঁচে থাকতে হয় এবং কাপড়ে লাগলে ধুয়ে ফেলতে হয়। কাপড়ে বা শরীরে দৃষ্টি গোচর হয় এমন অতরল কোন অপবিত্র জিনিস লাগলে, তা দূর হওয়া পর্যন্ত ধুতে হবে। যেমন, মাসিকের রক্ত। তবে যদি ধুয়ে ফেলার পরও তার চিহ্ন থেকে যায় যা দূর করা কষ্টকর, তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই। আর যদি অপবিত্র জিনিস এমন তরল পদার্থ হয়, যা কাপড়ে বা শরীরে লাগলে দৃষ্টি গোচর হয় না, তা একবার ধুয়ে ফেললে যথেষ্ট হবে। জমিতে বা মাটিতে অপবিত্র জিনিস লাগলে, পানি ঢাললে তা পবিত্র হয়ে যায়। অনুরূপ অপবিত্র জিনিস যদি তরল হয়, তবে শুকিয়ে গেলে তা পবিত্র হয়ে যায়। কিন্তু যদি অতরল হয়, তাহলে তা দূর না করা পর্যন্ত পবিত্র হয় না।

পবিত্রতা অর্জন এবং অপবিত্রতা দূরীকরণের জন্য পানি ব্যবহার করা হবে। যেমন, বৃষ্টির ও সমুদ্রের পানি ইত্যাদি। ব্যবহৃত পানি এবং যে পানির সাথে কোন পবিত্র জিনিস মিশে যায় এবং তা নিজ অবস্থায় থাকে, তা পানি বলেই পরিগণিত হয়। কিন্তু যদি পবিত্র কোন জিনিস মিশে গিয়ে পানির অবস্থার পরিবর্তন করে দেয়, তাহলে পবিত্রতা অর্জনের জন্য তা ব্যবহার করা জায়েয হবে না। অনুরূপ এমন নাপাক জিনিস যদি মিশে যায়, যা পানির স্বাদ অথবা গন্ধ বা রঙকে পরিবর্তন করে দেয়, তাহলে তাও ব্যবহার করা জায়েয হবে না। কিন্তু কোন কিছুর যদি পরিবর্তন সূচিত না হয়, তাহলে তাহারাত হাসিলের জন্য তা ব্যবহার করা জায়েয। অনুরূপ পান করার পর পাত্রের অবশিষ্ট পানি ব্যবহার করা জায়েয। তবে যদি কুকুর বা শুকর পান করে থাকে, তাহলে নয়, কারণ তা অপবিত্র।

অপবিত্রতার প্রকারভেদঃ অপবিত্রতা কয়েক প্রকারের যথা,

(ক) পেশাব-পায়খানা।

(খ)অদীঃ পেশাবের পর নির্গত গাঢ় সাদা পদার্থ।

(গ) মাযীঃ যৌন উত্তেজনার চরম মহূর্তে বীর্য পাতের পূর্বে নির্গত শ্বেত তরল পদার্থ।

বীর্য পবিত্র, তবে ধুয়ে নেওয়া মুস্তাহাব যদি ভিজে থাকে। আর শুকিয়ে গেলে তা রগড়ে নিলেই যথেষ্ট হয়।

(ঘ) হারাম পশু-পাখির মল ও পেশাব। তবে হালাল পশু-পাখির মল পেশাব পবিত্র।

উল্লিখিত এই অপবিত্র জিনিসগুলো অবশ্যই ধুয়ে ফেলতে হবে এবং শরীরে ও কাপড়ে লাগলে তা দূর করতে হবে।

(ঙ) মাসিক ও নেফাসের রক্ত।

মাযী কাপড়ে লাগলে, তাতে পানির ছিটা মারলেই হবে।

অপবিত্রতার বিধানঃ

১। যদি মানুষের জামা-কাপড় বা শরীরে এমন কিছু অপবিত্র জিনিস লাগে যা নাপাক কি না জানে না, এমতাবস্থায় সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা তার উপর ওয়াজিব নয় এবং তা ধুয়ে ফেলারও প্রয়োজন নেই। কারণ, প্রত্যেক জিনিসের প্রকৃতিই হলো পবিত্র।

(২) নামায শেষ করার পর যদি কেউ শরীরে বা কাপড়ে এমন নাপাক জিনিস দেখে যার সম্পর্কে তার জানা ছিল না অথবা জানা ছিল কিন্তু ভুলে গিয়েছিল, তাহলে তার নামায শুদ্ধ গণ্য হবে।

(৩) কাপড়ে অপবিত্র লাগা স্থান ঠিক জানা না থাকলে, যথাসাধ্য তার খোঁজ করতে এবং সেই স্থানটা ধুতে হবে যেটার ব্যাপারে তার বেশীরভাগ ধারণা যে এখানেই লেগেছে। কেননা, অপবিত্র জিনিস উপলব্ধি করা যায়। তার

রঙ, স্বাদ ও গন্ধ আছে।

প্রস্রাব-পায়খানাঃ

পেশাব-পায়খানার আদবসমূহের কিছু আদব নিম্নরূপ,

১। প্রস্রাবখানা ও পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে বাঁ পা আগে রেখে এই দুআ পাঠ করবে।

((بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ))

(বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল খুবুসি অল খাবা-ইস) অর্থ, আল্লাহর নাম নিয়ে প্রবেশ করছি। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট খবিস জিন ও জিন্নী হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় ডান পা আগে রেখে বলবে, «غُفْرَانَكَ» (গুফরা নাক) হে আল্লাহ! আমি তোমার ক্ষমা চাই।

(২) এমন কোন জিনিস নিয়ে পায়খানায় প্রবেশ করবে না, যার মধ্যে আল্লাহর নাম লিখা আছে। তবে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে নিতে পারে।

৩। খোলা মাঠে পেশাব-পায়খানা করার সময় ক্বিবলার দিকে মুখ ও পিছন করে বসবে না। তবে নির্মিত (চারদিক ঘেরা) হলে ক্বেবলার দিকে মুখ ও পিছন করা জায়েয।

(৪) লোক চক্ষু থেকে লজ্জাস্থানকে ঢেকে রাখবে এ ব্যাপারে অবহেলা করবে না। পুরুষদের লজ্জাস্থান হলো, নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। আর নারীদের সমগ্র শরীরটাই ঢাকতে হবে শুধু মুখমন্ডল নামাযে খুলে রাখবে। তবে যদি পরপুরুষ থাকে, তাহলে নামাযেও মুখমন্ডল ঢাকতে হবে।

৫। শরীরে ও কাপড়ে যেন পেশাব-পায়খানার কোন কিছু না লাগে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।

(৬) । পেশাব-পায়খানার পর পানি দিয়ে তা পরিষ্কার করবে। অথবা রুমাল (টিসু), পাথর ইত্যাদি ব্যবহার ক'রে অপবিত্রতার চিহ্ন দূর করবে। পরিষ্কার করার সময় বাঁম হাত ব্যবহার করবে।

ওযুঃ

ওযু ব্যতীত নামায গৃহীত হয় না। যেমন, আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((إِنَّ اللهَ لاَ يَقبلُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ)) متفق عليه ٦٩٥٤-٢٢٥

অর্থাৎ, "অবশ্যই আল্লাহ তার নামায গ্রহণ করেন না, যে অপবিত্র হয়ে যায়, যতক্ষণ না সে ওযু করে নেয়"। (বুখারী ৬৯৫৪-মুসলিম ২২৫) অনুরূপ ওযু পর্যায়ক্রমে (ওযুর স্থানগুলো পর্যায়ক্রমে ধুতে হবে আগে-পিছে করলে চলবে না। যেমন, আগে মুখমন্ডল ধুবে। তারপর হাতদ্বয়। অতঃপর মাথা ও কানের মাসাহ করবে। তারপর পাদ্বয় ধৌত করবে।) ও বিনা বিরতিতে (উভয় স্থান ধুয়ার মধ্যে এত দীর্ঘ বিলম্ব করবে না যে, আগের স্থান শুকিয়ে যায়।) করা জরুরী।

ওযুর রয়েছে অনেক মহান ফযীলত। প্রত্যেক মুসলিমের উচিত (ওযু করার সময় অন্তরে) এর (ফযীলতের) অনুভূতি নিয়ে ওযু করা। যেমন, উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ)) رواه مسلم ٥٧٨

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি সুন্দর করে ওযু করে, তার শরীর থেকে এমন কি তার নখের নীচ থেকেও গুনাহ বের হয়ে যায়।" (মুসলিম ৫৭৮) উসমান (রাঃ) থেকেই বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ)) رواه مسلم ٢٣١

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর নির্দেশ মত পরিপূর্ণ ওযু করে, ফরয নামাযগুলো তাদের মধ্যবর্তী সময়ে ঘটিত পাপসমূহের জন্য কাফ্ফারা হয়ে যায়।" (মুসলিম ২৩১)

ওযুর পদ্ধতিঃ

১। অন্তরে ওযুর নিয়ত করবে, মুখে নয়। কারণ, নিয়ত হলো, অন্তরে উদীয়মান কোন কাজ করার পরিকল্পনার নাম। অতঃপর "বিসমিল্লাহ" বলবে।

২। তারপর হাতের তেলোদ্বয়কে কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধোবে।

৩। অতঃপর তিনবার কুল্লি করবে ও নাকে পানি নিয়ে নাক ঝাড়বে।

৪। অতঃপর মুখমন্ডলকে এক কান থেকে আর এক কান পর্যন্ত দৈর্ঘ্যে এবং মাথার চুল গজানোর স্থান থেকে দাড়ির নিচে পর্যন্ত প্রস্থে তিনবার ধোবে।

৫। অতঃপর হস্তদ্বয়কে আঙ্গুল থেকে কুনুই পর্যন্ত তিনবার ধোবে। প্রথমে ডান হাত ও পরে বাম হাত।

৬। অতঃপর ভিজে হাত দিয়ে মাথায় একবার মাসাহ করবে। মাথার আগা থেকে আরম্ভ করে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে আবার আগায় ফিরিয়ে এনে ছেড়ে দেবে।

৭। অতঃপর উভয় কানের একবার মাসাহ করবে।উভয় হাতের তর্জনী আঙ্গুলকে উভয় কানের ভিতরের অংশে প্রবেশ করিয়ে ভিতরের দিক এবং বুড়ো আঙ্গুল দ্বারা কানের বাইরের দিক মাসাহ করবে।

৮। অতঃপর উভয় পা-কে তিনবার আঙ্গুলের ডগা থেকে গাঁট পর্যন্ত ধোবে। প্রথমে ডান পা ও পরে বাম পা।

৯। অতঃপর ওযুর পঠনীয় সুসাব্যস্ত দুআ পাঠ করবে। 'আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'বুদুহু অ রাসূলুহু'। উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) থেক বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ)) رواه مسلم ٢٣٤

অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই সুন্দর করে ওযু করে। তারপর বলে, 'আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লা-ল্লাহু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুল্লাহি অ রাসূলুহু' তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যায়। যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করতে পারবে।" (মুসলিম ২৩৪)

মোজার উপর মাসাহ করাঃ

যেহেতু ইসলাম একটি সহজ সরল ধর্ম তাই মোজার উপর মাসাহ করার অনুমতি প্রদান করেছে। আর এটা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে প্রমাণিত। আম্র ইবনে উমায়্যা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

((رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ)) رواه البخاري ٢٠٥

অর্থাৎ, "আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে তাঁর পাগড়ি ও মোজাদ্বয়ে মাসাহ করতে দেখেছি।" (বুখারী ২০৫) অনুরূপ মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

((بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ نَزَلَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ كَانَتْ مَعِي فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ)) متفق عليه ٢٠٣-٢٤٧

অর্থাৎ, """একদা আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। তিনি সাওয়ারী থেকে

অবতরণ ক'রে তাঁর প্রয়োজন পূরণ করলেন। অতঃপর ফিরে এলে আমি আমার ঘটির পানি ঢেলে দিলাম। তিনি ওযু করলেন এবং স্বীয় মোজাদ্বয়ে মাসাহ করলেন।" (বুখারী ২০৩-মুসলিম ২৪৭) তবে মোজার উপর মাসাহ করার শর্ত হলো, পবিত্রাবস্থায় মোজাদ্বয় পরিধান করা। অর্থাৎ, ওযু করে তা পরিধান করা। আর মাসাহ করার নিয়ম হলো, ভিজে হাত মোজার উপরে বুলিয়ে নেওয়া। মোজার নীচে মাসাহ করবে না। মুক্বীম (মুসাফির নয়)-এর মাসাহ করার সময় সীমা হলো, একদিন একরাত। আর ক্বসর জায়েয এমন সফরের মুসাফিরের জন্য তিনদিন দিনরাত। মাসাহর নির্দিষ্ট সময় সীমা শেষ হয়ে গেলে অথবা মাসাহ করার পর মোজাদ্বয় খুললে কিংবা গোসল ওয়াজিব করে এমন অপবিত্রতার জন্য খুললে, মাসাহ নষ্ট হয়ে যায়।

ওযু নষ্টকারী জিনিসঃ

(১) উভয় রাস্তা (পেশাব ও পায়খানার দ্বার) দিয়ে যা কিছু নির্গত হয়। যেমন, পেশাব, পায়খানা, বাতকর্ম, বীর্য, মাযী, এবং অদী ও রক্ত ইত্যাদি। (২) নিদ্রা (৩) উটের গোশ্‌ত খাওয়া। (৪) অজ্ঞান হয়ে যাওয়া এবং ওযুর ব্যাপারে স্মরণ না থাকা।

গোসলঃ

গোসল করা বলতে পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে সমস্ত শরীরকে পানি দিয়ে ধোয়া। নাক ঝেড়ে ও কুল্লি করে সমগ্র শরীরকে ধুবে তবেই গোসল সঠিক হবে। আর পাঁচটি জিনিসের কারণে গোসল ওয়াজিব হয়। যেমন,

প্রথমতঃ জাগ্রত অথবা নিদ্রাবস্থায় উত্তেজনা সহকারে নর-নারীর বীর্যপাত হওয়া। তবে যদি বিনা উত্তেজনায় বীর্যপাত ঘটে যেমন, রোগ অথবা অত্যধিক ঠান্ডার কারণে ঘটা, তাতে গোসল ওয়াজিব হবে না। অনুরূপ যদি স্বপ্নদোষ হয় আর বীর্য বা বীর্যের কোন চিহ্ন না পায়, তাহলে গোসল ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যদি বীর্য বা তার চিহ্ন পায়, তবে গোসল ওয়াজিব হবে, যদিও স্বপ্নদোষ স্মরণ না থাকে।

দ্বতীয়তঃ লজ্জাস্থানের সাথে লজ্জাস্থানের মিলন ঘটা। অর্থাৎ, পুরুষ লিঙ্গের স্ত্রী লিঙ্গের মধ্যে প্রবেশ ঘটা, যদিও বীর্যপাত না ঘটে।

তৃতীয়তঃ মাসিক ও নেফাস (প্রসবজনিত রক্ত) বন্ধ হয়ে যাওয়া।

চতুর্থতঃ মৃত্যু। মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া ওয়াজিব।

পঞ্চমতঃ যখন কোন কাফের মুসলমান হবে।

অপবিত্র ব্যক্তির জন্য যা হারামঃ

কিছু জিনিস অপবিত্র ব্যক্তির উপর হারাম হয়। যেমন, (১) নামায পড়া (২) তাওয়াফ করা (৩) অনুরূপ কুরআন শরীফ স্পর্শ করা, কোথাও নিয়ে যাওয়া, অনুরূপ চুপি চুপি অথবা সশব্দে মুখস্থ বা কুরআন দেখে তা পাঠ করা ইত্যাদি। (৪) মসজিদে অবস্থান করা। তবে মসজিদ হয়ে কোথাও যাওয়াতে দোষ নেই। অনুরূপ অপবিত্রতাকে ওযু করে হালকা করে নিলে মসজিদে অবস্থান করতে পারবে।

তায়াম্মুমঃ

সফরে ও বাড়ীতে অবস্থান করাকালীন ওযু অথবা গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা জায়েয, যখন নিম্নে বর্ণিত কারণসমূহের কোন কারণ পাওয়া যাবে।

১। যখন পানি পাওয়া যায় না অথবা পানি পাওয়া যায়, কিন্তু তা পবিত্রতা হাসেলের জন্য যথেষ্ট নয়। তবে আগে পানির খোঁজ করবে, খোঁজ করার পর পাওয়া না গেলে, তায়াম্মুম করবে। অথবা পানি সন্নিকটেই আছে কিন্তু সেখান থেকে পানি আনতে গেলে জান ও মালের ক্ষতির আশঙ্কা বোধ করে, এমতবস্থায়ও সে তায়াম্মুম করবে।

২। যদি শরীরের কোন অংশ আহত হয়, তাহলে আহত স্থান ধোবে। তবে ধোওয়াতে ক্ষতি হলে, ভিজে হাত দ্বারা আহত স্থানে মাসাহ করবে। মাসাহ করাও যদি ক্ষতিকর হয়, তাহলে অন্য স্থানগুলো ধোবে এবং এই স্থানের পরিবর্তে তায়াম্মুম করবে।

৩। যদি পানি অথবা আবহাওয়া অত্যধিক ঠান্ডা হয় আর পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তাহলে তায়াম্মুম করবে।
৪। সাথে পানি আছে কিন্তু পান করার জন্য তা প্রয়োজন, তাহলে তায়াম্মুম করবে।

তায়াম্মুম করার নিয়মঃ অন্তরে তায়াম্মুমের নিয়ত ক'রে স্বীয় তেলোদ্বয়কে একবার মাটিতে মারবে। অতঃপর মুখমন্ডল মাসাহ করবে। তারপর বাম হাতের তেলোকে ডান হাতের উপর এবং ডান হাতের তেলোকে বাম হাতের উপর বুলিয়ে নেবে।

যে জিনিসে ওযু নষ্ট হয়, সে জিনিসে তায়াম্মুমও নষ্ট হয়ে যাবে। অনুরূপ যে ব্যক্তি পানি না পেয়ে তায়াম্মুম করেছিল, সে যদি নামাযের পূর্বে অথবা নামায পড়াকালীন পানি পেয়ে যায়, তার তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যাবে। তবে নামায সমাপ্তির পর পানি পেলে তার নামায শুদ্ধ গণ্য হবে, তাকে নামায পুনরায় পড়তে হবে না।

মাসিক ও নেফাস (প্রসবজনিত রক্ত)ঃ

ঋতুবতী ও প্রসবিনীর জন্য মাসিক ও নেফাসের রক্ত আসা অবস্থায় নামায পড়া ও রোযা রাখা বৈধ নয়। কারণ হাদীসে আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي)) متفق عليه: ٣٣٣-٣٣١

অর্থাৎ, "ঋতু আসলে নামায ছেড়ে দেবে এবং চলে গেলে শরীর হতে রক্ত ধুয়ে নামায পড়বে।" (বুখারী ৩৩১-মুসলিম ৩৩৩) (মাসিক অবস্থায়) ত্যাগকৃত নামাযগুলোর কাযাও তাকে করতে হবে না। তবে যে রোযাগুলো ত্যাগ করেছে, সেগুলো কাযা করতে হবে। মাসিক অবস্থায় কা'বা শরীফের তাওয়াফ করাও জায়েয নয়। মাসিক অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা স্বামীর উপর হারাম। তবে সঙ্গম ব্যতীত তার দ্বারা তৃপ্তি গ্রহণ করা স্বামীর জন্য জায়েয। ঋতুবতীর কুরআন শরীফ স্পর্শ করাও বৈধ নয়।

রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলে সে পবিত্র হবে। পবিত্রতার জন্য গোসল করা তার উপর ওয়াজিব। (পবিত্র হয়ে গেলে) সমস্ত নিষিদ্ধ জিনিস তার জন্য হালাল হয়ে যাবে। যদি নামাযের সময় প্রবেশ হয়ে যাওয়ার পর কোন নারী মাসিক বা নেফাসে আক্রান্ত হয়ে যায়, তাহলে সঠিক উক্তি অনুযায়ী পবিত্র হয়ে যাওয়ার পর তাকে সে নামায কাযা করতে হবে। আর নামাযের সময় শেষ হওয়ার এতটা পূর্বে যদি নারী পবিত্র হয়, যাতে এক রাক'আত নামায পড়া যেতো, তবে তাকে সে নামায আদায় করতে হবে। আর যে নামাযকে অন্য নামাযের সাথে একত্রিত করে পড়া যায়, সেই নামাযের কাযা করা তার জন্য মুস্তাহাব। যেমন, কেউ যদি সূর্যাস্তের এতটা সময় পূর্বে পবিত্র হয়, যাতে এক রাক'আত নামায পড়া যেতো, তাহলে আসরের নামায তাকে কাযা করতেই হবে, কিন্তু তার সাথে যোহর কাযা তার জন্য মুস্তাহাব হবে। আর যদি অর্ধ রাতের পূর্বে কেউ পবিত্র হয়, তাহলে ঈশার নামায তাকে পড়তেই হবে, কিন্তু তার সাথে মাগরিবের কাযা করা তার জন্য মুস্তাহাব।

أحكام الصلاة

নামাযের বিধানঃ

নামায ইসলামের মূল ভিত্তিসমূহের দ্বিতীয় ভিত্তি। প্রাপ্তবয়স্ক জ্ঞানসম্পন্ন সকল মুসলিমের উপর নামায ওয়াজিব। যে নামাযের ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করে, সে সকলের ঐক্যমতে কাফের। আর যে গড়িমসি ও অলসতার কারণে তা (নামায) মোটেই পড়ে না, অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের মতে সেও কাফের। কিয়ামতের দিন বান্দার আগে নামাযেরই হিসাব হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً﴾ (النساء:١٠٣)

অর্থাৎ, "নিশ্চয় নামায ফরয মু'মিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।" (সূরা নিসাঃ ১০৩) ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ))
متفق عليه ٨-١٦

অর্থাৎ, "ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর রাখা হয়েছে। আর তা হলো, এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁর রাসূল, নামায পড়া, যাকাত দেওয়া, হজ্জ করা এবং রমযান মাসে রোযা রাখা।" (বুখারী ৮-মুসলিম ১৬) জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ থেকেও বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

((إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ)) رواه مسلم ٨٢

অর্থাৎ, "মানুষের মধ্যে এবং শির্ক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো নামায ত্যাগ করা।" (মুসলিম ৮২) অনুরূপ নামায আদায় করার মধ্যে বহু মহান ফযীলত। যেমন, আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً)) رواه مسلم ٦٦٦

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি বাড়িতে অযু ক'রে আল্লাহর ঘরসমূহের কোন ঘরের দিকে অগ্রসর হয়, আল্লাহর ফরয কাজসমূহের কোন ফরয কাজ আদায় করার জন্য, তার এক পদক্ষেপে গোনাহ মাফ হয় এবং অপরটির দ্বারা মর্যাদা বর্ধিত হয়।" (মুসলিম ৬৬৬) আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকেই বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَاِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ)) مسلم ٢٥١

অর্থাৎ, "আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের কথা বলে দেবো না যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের গোনাহ দূর করে দেবেন এবং তোমাদের মর্যাদা উঁচু করে দেবেন?' সাহাবাগণ বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, 'কষ্টের সময় সুন্দরভাবে ওযু করা, মসজিদের দিকে বেশী বেশী পদচারণা করা এবং এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। আর ইহা হলো জেহাদে প্রতিরক্ষার কাজের ন্যায়। ইহা হলো জেহাদে প্রতিরক্ষার কাজের ন্যায়।" (মুসলিম ২৫১) অনুরূপ অবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ)) متفق عليه ٦٦٢-٦٦٩

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি সকালে অথবা সন্ধ্যায় মসজিদে আসে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে সকাল বা সন্ধ্যায় মেহমা-নদারীর ব্যবস্থা করেন।" (বুখারী ৬৬২-মুসলিম ৬৬৯)

<u>নিম্নে নামায সম্পর্কীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছেঃ</u>

১। জামাআতের সাথে নামায আদায় করা পুরুষদের উপর ওয়াজিব। কারণ, হাদীসে এসেছে, (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বেলেছেন,)

((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ)) متفق عليه ٢٤٢-٦٥١

অর্থাৎ, "আমি ইচ্ছা করি যে, কাউকে নামায পড়ানোর নির্দেশ দিয়ে এমন লোকদের নিকট যাই, যারা নামাযে উপস্থিত হয় নাই এবং তাদেরকে জ্বালিয়ে দেই।" (বুখারী ২৪২-মুসলিম ৬৫১)

২। ধীরস্থিরতার সাথে আগেভাগে মসজিদে যাওয়া মুসলিমের জন্য শ্রেয়।

৩। মসজিদে প্রবেশকারীর জন্য সুন্নাত হলো, স্বীয় ডান পা আগে বাড়িয়ে এই দুআ পড়া,

((اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ)) رواه مسلم ١٦٥٢

(আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রাহতিকা) অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।" (মুসলিম ১৬৫২)

৪। মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' (দাখেলী মসজিদ) দু'রাকআত নামায পড়া সুন্নাত। কারণ, আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ)) متفق عليه ٤٤٤-٧١٤

অর্থাৎ, "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন বসার পূর্বে দু'রাকআত নামায পড়ে নেয়।" (বুখারী ৪৪৪-মুসলিম ৭১৪)

৫। নামাযে লজ্জাস্থান ঢাকা ওয়াজিব। পুরুষদের লজ্জাস্থান হলো, নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। আর মহিলাদের সর্বাঙ্গই লজ্জাস্থান। তবে নামাযে মুখমন্ডল খুলে রাখতে পারবে।

৬। ক্বেবলাকে সম্মুখ করে নামায পড়া ওয়াজিব। নামায কুবল হওয়ার জন্য এটা শর্ত। তবে যদি কোন প্রতিবন্ধ-কতা থাকে, যেমন অসুস্থতা ইত্যাদি (তাহলে ক্বেবলাকে সম্মুখ করতে না পারলেও কোন দোষ নেই।)।

৭। নামাযকে তার সময়ে আদায় করা ওয়াজিব। তাই সময়ের পূর্বে নামায পড়া ঠিক নয়। অনুরূপ বিলম্ব করে নামায পড়া হারাম।

৮। উচিত হলো, নামাযের জন্য আগেভাগে যাওয়া, প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর আগ্রহ রাখা এবং নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। কারণ, এ কাজগুলোর বড় ফযীলত। যেমন আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ)) متفق عليه ٦١٥-٩٨١

অর্থাৎ, " লোকে যদি জানতো আযান দেওয়া ও নামাযের প্রথম কাতারের মধ্যে কি (পরিমাণ সাওয়াব) আছে, অতঃপর লটারী ছাড়া সেগুলো হাসিল করা যদি সম্ভব না হতো, তাহলে তারা অবশ্যই লটারী করতো। আর যদি তারা নামাযে আগে আসার মধ্যে কি (পরিমাণ সাওয়াব) আছে তা জানতো, তাহলে সেদিকে অগ্রবর্তী হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করতো।" (বুখারী ৬১৫-মুসলিম ৪৩৭) আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকেই বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((لا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ)) رواه البخاري ومسلم ٦٥٩-٦٤٩

অর্থাৎ, "যতক্ষণ নামাযের জন্য অপেক্ষা কোন ব্যক্তিকে আটকে রাখে, ততক্ষণ সে নামাযেই থাকে।" (বুখারী ৬৫৯-মুসলিম ৬৪৯)

নামাযের সময়ঃ

* যোহরের সময় হলো, সূর্য ঢলে যাওয়ার (আকাশে ঠিক মাথার উপরে অবস্থিত বিন্দু থেকে যখন সূর্য পশ্চিমে ঢলে যাবে) পর থেকে নিয়ে যখন কোন জিনিসের ছায়া তার সমান হয়ে যায়। অর্থাৎ, লম্বায়।
* আসরের সময় হলো, যখন কোন জিনিসের ছায়া তার সমান হয়ে যায়, তখন থেকে আরম্ভ হয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।
* মাগরিবের সময় হলো, সূর্যাস্ত থেকে শাফাক অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত। আর শাফাক হলো, সূর্যাস্তের পর (পশ্চিম গগনে দৃশ্যমান) লালাকার রক্তিম আভা।
* ঈশার সময় হলো, উক্ত লালাকার আভা অদৃশ্য হওয়ার পর থেকে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত।
* ফজরের সময় হলো, ফজর উদয় হওয়ার পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত।

যে স্থানগুলোতে নামায পড়া জায়েয নয়ঃ

১। কবরসমূহঃ কারণ, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ)) رواه الخمسة، وهو حديث صحيح

অর্থাৎ, "গোসলখানা ও কবরস্থান ব্যতীত পুরো যমীনটাই মসজিদ।" (আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, আহমদ। হাদীসটি সহীহ।) তবে জানাযার নামায কবরে পড়া জায়েয।

২। কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়া। আবূ মারষাদ গানাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

((لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا)) رواه مسلم ٩٧٣

অর্থাৎ, "কবরসমূহকে সম্মুখ করে নামায পড়ো না এবং তার উপর বসো না।" (মুসলিম ৯৭৩)

৩। উটের খোঁয়ারঃ যেখানে উট থাকে বা উটের আশ্রয়স্থল। অনুরূপ অপবিত্র স্থানসমুহেও নামায পড়া জায়েয নয়।

নামাযের তরীকাঃ

নামাযের সময় এবং অন্যান্য যাবতীয় ইবাদতের সময় নিয়ত করা অত্যাবশ্যক। তবে এই নিয়ত অন্তরে হবে, মুখে উচ্চারিত হবে না। নামাযের তরীকা হলো,

১। মুসাল্লী সমগ্র শরীর সহ ক্বেবলামুখী হবে, এদিক ওদিক তাকাবে না।

(২) অতঃপর তাকবীরেতাহরীমা পাঠ করবে। বলবে "আল্লাহু আকবার' তাকবীর বলার সময় উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত অথবা কানের লতি পর্যন্ত উঠাবে।

৩। অতঃপর ডান হাতের চেটোকে বাম হাতে রেখে তা বুকের উপর স্থাপন করবে।

৪। অতঃপর দুআয়ে ইসতিফতাহ পড়বে। আর দুআয়ে ইসতিফতাহ হলো,

((الْحَمْدُ لله حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ)) رواه مسلم ٦٠٠

'আলহাদু লিল্লাহি হামদান কাষীরান ত্বাইয়েবান মুবারাকান ফী-হ' (মুসলিম ৬০০) অথবা এই পড়বে,

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ» رواه أبوداود والترمذي ٧٧٥-٢٤٢، وصححه الألباني

'সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা অ বিহামদিকা অ তাবা-রাকাসমুকা অ তাআ'লা জাদ্দুকা অ লা-ইলাহা গায়রুকা' অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসা সহ তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তোমার নাম কত বরকতময়, তোমার মহিমা কত উচ্চ এবং তুমি ছাড়া কোন সত্যিকার উপাস্য নেই। (আবূ দাউদ, তিরমিযী ৭৭৫-২৪২, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। এ ছাড়া আরো ইস্তিফতাহর দুআ আছে যে কোন দুআ পড়তে পারে। আর উত্তম হলো, কোন একটি দুআকে অব্যাহতভাবে না পড়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দুআ পড়া।

৫। তারপর 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ্শায়ত্বানীর রাজীম' পড়বে।

৬। অতঃপর "বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম" বলে সুরা ফাতিহা পড়বে।

﴿الحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾

(আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'-লামীন, আর রাহমানির রাহীম, মালিকি ইয়াউ মিদ্দীন, ইয়্যাকানা' বুদু অ ইয়্যাকা নাস্তায়ীন, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাক্বীম, সিরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম অলাযোল্লীন) অর্থাৎ, সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার জন্য যিনি নিখিল জাহানের রব্ব। যিনি দয়াময় মেহেরবান। বিচার দিনের মালিক।আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সঠিক দৃঢ়পথ প্রদর্শন কর। তাদের পথ যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ। যারা অভিশপ্ত নয়, যারা পথভ্রষ্ট নয়।

৭। অতঃপর কুরআন থেকে যে কোন সূরা পড়বে।

৮। অতঃপর উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে "আল্লাহু আকবার" বলে রুকু' করবে। আঙ্গুলগুলো ফাঁক ফাঁক করে উভয় হাতের চেটো হাঁটুর উপর স্থাপন করবে। রুকু'তে পড়বে, (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ) 'সুবহানা রাব্বীয়াল আযীম'। দুআটি তিনবার পড়া সুন্নাত। তিনের বেশী পড়াও জায়েয এবং একবার পড়লেও যথেষ্ট হবে।

৯। অতঃপর ইমাম ও একা নামায আদায়কারী (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) 'সামি আল্লা-হু-লিমান হামিদাহ' বলে রুকু' থেকে মাথা তুলবে। রুকু' থেকে উঠার সময়ও উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাবে। মুক্তাদী 'সামি আল্লা-হু-লিমান হামিদাহ'র পরিবর্তে (رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ) 'রাব্বানা অ লাকাল হামদু' দুআটি পড়বে। অতঃপর ডান হাতের চেটোকে বাম হাতে রেখে তা বুকের উপর স্থাপন করবে। (তবে রুকু' থেকে উঠে আবার হাত দু'টিকে বুকের উপর স্থাপন করা এটা কোন কোন আলেমের নিকট)।

১০। রুকু' থেকে উঠে এই দুআটি পড়বে।

((اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ» رواه مسلم ٧٧١

'রাব্বানা লাকাল হামদু, মিলআস্সামাওয়াতি অ মিলআল আরযি অ মিলআ মা বায়নাহুমা অ মিলআ মা শি'তা মিন শায়্যিন বা'দু) অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু! তোমার জন্য ঐ পরিমাণ প্রশংসা যা আকাশ ভর্তি করে দেয়, যা পৃথিবী পূর্ণ করে দেয় এবং যা এই দু'য়ের মধ্যবর্তী মহাশূন্যকে পূর্ণ করে দেয়। আর এগুলো ছাড়া তুমি অন্য যা কিছু চাও তা পূর্ণ করে দেয়। (মুসলিম ৭৭১)

১১। অতঃপর "আল্লাহু আকবার" বলে প্রথম সাজদাটি করবে। শরীরের সাতটি অঙ্গ দ্বারা সাজদা করবে। আর তা হোল, নাক সহ কপাল, উভয় হাতের তেলো, হাঁটুদ্বয় এবং উভয় পায়ের অগ্রভাগ। সেজদার সময় বগল

ও পার্শ্বদ্বয় প্রশস্ত রাখবে এবংসমস্ত আঙ্গুলগুলো ক্বেবলামুখী রাখবে সাজদায় (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى) 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' দুআটি পাঠ করবে। দুআটি তিনবার পড়া সুন্নাত। তিনের বেশীও পড়তে পারে এবং একবার পড়লেও যথেষ্ট হবে। সাজদার সময় বেশীবেশী দুআ করা মুস্তাহাব। কারণ, সাজদা হলো দুআ কবুল হওয়ার স্থানসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

১২। অতঃপর "আল্লাহু আকবার" বলে সাজদা থেকে মাথা উঠাবে। উভয় সাজদার মধ্যবর্তী সময়ে বাম পায়ের উপর ভর দিয়ে বসবে এবং ডান পা উঠিয়ে রাখবে। আর ডান হাত হাঁটুর নিকটস্থ ডান পায়ের ঊরুর উপর রাখবে। আর বাম হাত হাঁটুর নিকটস্থ বাম পায়ের ঊরুর উপর রাখবে। উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো বিছিয়ে রাখবে। আর এই বৈঠকে (رَبِّ اغْفِرْلِيْ رَبِّ اغْفِرْلِي) 'রব্বিগ ফিরলী রব্বিগ ফিরলী' দুআটি পড়বে।

১৩। অতঃপর দ্বিতীয় সাজদা করবে। প্রথম সাজদায় যা কিছু করা হয়েছে, দ্বিতীয় সাজদায়ও অনুরূপ করবে।

১৪। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে দ্বিতীয় সাজদা থেকে উঠে (সামান্য একটু বসে) আবার দাঁড়াবে।

১৫। প্রথম রাকআত যেভাবে পড়া হয়েছে, দ্বিতীয় রাকআতও অনুরূপ পড়বে ও করবে। তবে দুআয়ে ইসতিফ-তাহ এবং আউযু বিল্লাহ পড়বে না। দ্বিতীয় রাকআতের দ্বিতীয় সাজদার পর দুই সাজদার মধ্যবর্তী সময়ে যেভাবে বসেছিলো, সেভাবে বসবে, যদি চার রাক'আত ও তিন রাকআত বিশিষ্ট নামায হয়। ডান হাতের আঙ্গুলগুলো গুটিয়ে বৃদ্ধা ও মধ্যমা আঙ্গুল দ্বারা বালা বানিয়ে তর্জনী দিয়ে ইশারা করবে। এই বৈঠকে তাশাহহুদ পড়বে এবং 'আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু অ রাসূলুহু' পড়ার সময় তর্জনীকে নড়াতে থাকবে। আর তাশাহহুদ হলো,

((التَّحِيَّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ))

(আত্ তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি অস্সালা-ওয়াতু অত্ত্বাইয়ি- বা-তু আসসালা-মু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিইয়্যু অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ, আস্সালা-মু আলাইনা অ আলা ইবা-দিল্লা-হিস-সা-লিহীন। আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসুলুহ)।

অর্থাৎ, যাবতীয় মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহর নিমিত্তে। হে নবী! আপনার উপর সকল প্রকার শান্তি, আল্লাহর রহমত এবং তাঁর বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের উপর ও আল্লাহর সকল সৎ বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল। অতঃপর 'আল্লাহু আকবার' বলে আবার দাঁড়াবে যদি তিন রাকআত বিশিষ্ট নামায হয় যেমন, মাগরিবের নামায অথবা চার রাকআত বিশিষ্ট হয় যেমন, যোহর, আস্র ও ঈশার নামায। এখানেও হাত দু'টিকে (বুকের উপর ধারণ করার পূর্বে) কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। তারপর অবশিষ্ট নামাযগুলো দ্বিতীয় রাকআতের ন্যায় পূরণ করবে। তবে (অবশিষ্ট রাকআ-তগুলোতে) দাঁড়ানো অবস্থায় কেবল সূরা 'ফাতিহা' পড়বে। শেষ রাকআতের দ্বিতীয় সাজদার পর বসে তাশাহহুদ ও দরূদে ইবরাহীম পড়বে।

((التَّحِيَّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ))

(আত তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি অস্‌সালা-ওয়াতু অত্বত্বাইয়ি- বা-তু আসসালা-মু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিইয়্যু অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ, আস্‌সালামু আলাইনা অ আলা ইবাদিল্লাহিস-সা-লিহীন। আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসুলুহ। আল্লা-হুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ অ আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা অ আলা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক আলা মুহাম্মাদিউ অআলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা বা-রাকতা আলা ইবরাহীমা অ আলা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ) এরপর স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী অন্য দুআও করতে পারবে। তাছাড়া বেশী বেশী দুআ করা সুন্নাতও বটে। তবে যে দুআ প্রমাণিত তা-ই করা উচিত। যেমন,

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ))

(আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন আযা-বিল ক্বাব্‌রি অ মিন আযা-বিন্নার অ মিন ফিতনাতিল মাহয়্যা অল মামা-তি অ মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ্দাজ্জাল) হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট কবর ও জাহান্নামের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

১৬। তারপর 'আস্‌সালামু আলাইকুম অ রাহমাতুল্লা-হ' বলে আগে ডান দিকে ও পরে বাম দিকে সালাম ফিরবে।

১৭। যোহর, আস্‌র, মাগরিব এবং ঈশার নামাযের শেষ তাশাহহুদে 'তাওয়াররুক' করে বসা সুন্নাত। অর্থাৎ, ডান পা খাড়া রাখে বাম পায়ের অগ্রভাগকে ডান জঙ্ঘা (হাঁটু থেকে গাঁট পর্যন্ত পায়ের অংশ)র নীচে দিয়ে বের করে রেখে পাছাকে যমীনে ভর করে বসবে। আর হাত দু'টিকে ঐভাবেই রাখবে, যেভাবে প্রথম তাশাহহুদে রেখেছিলো।

নামাযের যিক্‌রঃ

((أَسْتَغْفِرُ اللهَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ)) رواه مسلم ٥٩١

(আস্তাগ ফিরুল্লাহ আস্তাগ ফিরুল্লাহ আস্তাগ ফিরুল্লাহ, আল্লাহুম্মা আন্তা স্‌সালা-মু অ মিনকাস সালা-মু তাবা-রাকতা যাল জালা-লি অল ইকরা-মু) অর্থঃ আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই। হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময়, তোমার পক্ষ হতেই শান্তি আসে, তুমি বরকতময় হে মহিমাময় ও মহানুভব। (মুসলিম ৫৯১)

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ)) متفق عليه ٨٤٤-٥٩٣

(লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর, আল্লাহুম্মা লা মা-নিআ লিমা আ'ত্বাইতা অলা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'তা অলা য়্যানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু) অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্যিকার উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীর নেই, তাঁরই সারা রাজত্ব, তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! তুমি যা দান করো, তা রোধকারী এবং তুমি যা রোধ করো, তা দানকারী কেউ নেই, আর ধনবানের ধন তোমার আযাব হতে বাঁচাতে কোন উপকারে আসবে না।

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ)) رواه مسلم ٥٩٤

(লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর, লা হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অলা না'বুদু ইল্লা ইয়্যা-হু লাহুন নি'মাতু অলাহুল ফাযলু অলাহুস সানা-উল হাসান, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুখলিসীনা লাহুদ্দীন অলাউ কারিহাল কা-ফিরুন) অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্যিকার উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীর নেই, তাঁরই সারা রাজত্ব, তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। আল্লাহর প্রেরণা ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার সাধ্য কারো নেই। আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। আমরা তিনি ব্যতীত আর কারো ইবাদত করি না। যাবতীয় সম্পদ, অনুগ্রহ ও উত্তম প্রশংসা সব তাঁরই। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আমরা বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁরই ইবাদত করি, যদিও কাফেরদের নিকট তা অপছন্দনীয়। (মুসলিম ৫৯৪) এর (উল্লিখিত দুআগুলো পড়ার) পর ৩৩বার 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩বার 'আলহামদু লিল্লাহ' ৩৩বার 'আল্লাহু আকবার' পড়বে এবং একশত পূর্ণ করার জন্য পড়বে, 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর'। (মুসলিম ৫৯৭) অনুরূপ প্রত্যেক নামাযের পর 'আয়াতুল কুরসী', 'কুলহুওয়াল্লাহু আহাদ' 'কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস' এবং 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব' পড়বে। ফজর ও মাগরিবের নামাযের সূরা তিনটিকে তিনবার করে পড়া মুস্তাহাব।

যার নামায ছুটে যায়ঃ

যদি কারো নামাযের এক বা একাধিক রাকআত অনাদায় রয়ে যায়, তাহলে ইমামের সাথে সে যা পায় নি তা পূরণ করবে ইমামের দ্বিতীয় সালামের পর। আর সেটাই তার প্রথম রাকআত হবে, যেটা ইমামের সাথে সে পেয়েছে। যদি ইমামের সাথে রুকু' পায়, তাহলে সে রাকআতটা তার পূর্ণ বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি ইমামের সাথে রুকু' না পায়, তাহলে তাকে সে রাকআত পূরণ করতে হবে। যার নামায ছুটে যায় তার উচিত মসজিদে প্রবেশ করে সরাসরি জামা'আতে শামিল হয়ে যাওয়া। তাতে মুক্তাদীগণ দাঁড়ানো অবস্থায় থাকুক অথবা রুকু, সাজদা, ও যে কোন অবস্থায় থাকুক না কেন তাদের দাঁড়ানোর অপেক্ষা না করে শামিল হয়ে যাবে। তবে তাকবীরে তাহরিমা দাঁড়িয়ে আদায় করবে। অসুস্থ ব্যক্তি বসে আদায় করতে পারবে।

নামায বিনষ্টকারী বস্তুসমূহঃ

১। ইচ্ছাকৃত বাক্যালাপ; যদিও তা স্বল্প হয়।
২। সমগ্র শরীর সহ ক্বেবলা বিমুখ হয়ে যাওয়া।
৩। ওযু নষ্টকারী কোন জিনিস সংঘটিত হওয়া।
৪। বিনা কারণে অত্যধিক নড়া-চড়া করা।
৫। হাসি যদিও তা সামান্য হয়।
৬। ইচ্ছাকৃতভাবে একটি রুকু, সেজদা, কিয়াম ও বৈঠক বৃদ্ধি করা।
৭। ইচ্ছাকৃতভাবে ইমামের আগে কোন কাজ করা।

নামাযের ওয়াজিবসমূহঃ

১। তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া সমস্ত তাকবীর পাঠ করা।
২। রুকু'তে "সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম" বলা। কম-সে-কম একবার।
৩। ইমাম ও একা নামায আদায়কারীর রুকু'তে উঠার সময় "সামিআল্লা-হুলিমান হামিদাহ" বলা।
৪। রুকু' থেকে উঠে "রাব্বানা অলাকাল হামদ" বলা।
৫। সাজদায় "সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা" বলা। কম-সে-কম একবার।
৬। উভয় সাজদার মধ্যে "রাব্বিগ ফিরলী" দুআটি পাঠ করা।
৭। প্রথম তাশাহহুদ।

৮। প্রথম তাশাহহুদের জন্য বসা।

নামাযের রুক্‌নসমূহঃ

১। ফরয নামাযে সামর্থ্য থাকলে দাঁড়ানো। নফল নামাযে দাঁড়ানো ওয়াজিব নয় ,তবে বসে নামায পড়ার নেকী দাঁড়িয়ে পড়ার অর্ধেক।
২। তাকবীরে তাহরীমা পাঠ করা।
৩। প্রত্যেক রাকআতে সুরা ফাতিহা পড়া।
৪। প্রত্যেক রাকআতে রুকু' করা।
৫। রুকু' থেকে সমানভাবে দাঁড়ানো।
৬। প্রত্যেক রাকআতে দু'বার দেহের সাত অঙ্গের দ্বারা সাজদা করা।
৭। উভয় সাজদার মধ্যে বসা।
৮। উল্লিখিত প্রত্যেক কার্যাদি পালনে ধীরস্থিরতা বজায় রাখা।
৯। শেষ তাশাহহুদ।
১০। তাশাহহুদের জন্য বসা।
১১। নবীর উপর দরূদ পাঠ করা।
১২। সালাম ফিরা।
১৩। রুক্‌নসমূহের মধ্যে পর্যায়ক্রম বজায় রাখা।

নামাযে ভুলে গেলেঃ

যদি মুসাল্লী তার নামাযে ভুলে যায়, অর্থাৎ, নামাযে যদি কোন কিছু বেশী হয়ে যায় অথবা কমে যায় কিংবা কম হলো, না বেশী হলো এ ব্যাপারে তার সন্দেহ সৃষ্টি হয়, এমতাবস্থায় তার জন্য শরয়তী বিধান হলো সে 'সাজদা সাহু' (ভুলের সাজদা) করবে। কাজেই ভুলবশতঃ যদি নামাযে কোন কিয়াম, রুকু' ও বৈঠক ইত্যাদি বেশী হয়ে যায়, তাহলে সে এই ভুলের জন্য সালাম ফিরার পূর্বে দু'বার সাজদা করবে। অনুরূপ যদি ভুলবশতঃ তার নামাযের কার্যাদির বা পঠনাদির কোন কিছু কমে যায়, আর এই ত্যাগকৃত জিনিস যদি নামাযের রুক্‌ন হয় এবং পরের রাকআতের কেরাত (পঠন) আরম্ভ করার পূর্বেই যদি তার স্মরণ হয়ে যায়, তাহলে সে ফিরে গিয়ে এই রুক্‌ন ও তার পরের কার্যাদি পূরণ ক'রে সাজদা সাহু করবে। আর যদি পরের রাকআতের কেরাত শুরু করার পর তার স্মরণ হয়, তাহলে সে রাকআত বাতিল হয়ে যাবে, যে রাকআতের কোন রুক্‌ন বাদ পড়ে গেছে এবং পরের রাকআতটা তার স্থানে চলে আসেব। আর বাদপড়া রুক্‌ন সম্পর্কে যদি সালামের পর জ্ঞাত হয়, আর (নামায থেকে) বিচ্ছিন্ন হওয়া যদি সুদীর্ঘ না হয়ে থাকে, তাহলে সম্পূর্ণ রাকআতটা পূর্ণ ক'রে সাজদা সাহু করবে। কিন্তু যদি বিচ্ছিন্ন হওয়া সুদীর্ঘ হয়ে যায় অথবা ওযু নষ্ট হয়ে যায়, তবে পুরো নামাযটা ফিরিয়ে পড়বে।

যদি নামাযের কোন ওয়াজিব কাজ ভুলে যায় যেমন, প্রথম তাশাহহুদের জন্য বসতে ভুলে যাওয়া বা এই ধরনের নামাযের যে কোন ওয়াজিব কাজ, তাহলে সে সালাম ফিরার পূর্বে দু'বার সাজাদা সাহু করবে। নামাযে সন্দেহের বেলায় যদি রাকআতের সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয় যে, দু'রাকআত হলো, না তিন রাকআত, তাহলে সে কমটাই ধরবে, কেননা কমটা তার নিকট নিশ্চিত এবং সালাম ফিরার পূর্বে সাজদা সাহু করবে। আর যদি নামাযের কোন রুক্‌ন ছুটা নিয়ে সন্দেহ হয়, তাহলে সে আসলেই রুক্‌ন বাদ গেলে যা করতে হয়, তা-ই করবে। অর্থাৎ, সেই রুক্‌ন ও তার পরের কার্যাদি পুনরায় আদায় করে সাজদা সাহু করবে। আর যদি উভয় সম্ভাব্য বিষয়ের মধ্যে কোন একটির প্রতি তার ধারণা সুদৃঢ় হয়, তাহলে সে তার সুদৃঢ় ধারণা অনুযায়ী কাজ ক'রে সাজদা সাহু করবে।

সুন্নাত নামাযঃ

বাড়িতে অবস্থান করা কালীন বার রাকআত সুন্নাত নামাযের যত্ন নেওয়া প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য মুস্তাহাব। আর তা হলো, যোহরের পূর্বে চার রাকআত ও পরে দু'রাকআত। মাগরিবের পরে দু'রাকআত। ঈশার পরে দু'রাকআত এবং ফজরের পূর্বে দু'রাকআত। উম্মে হাবীবা (রাযীআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

((مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ)) رواه مسلم ٧٢٨

অর্থাৎ, ""যে মুসলিম বান্দা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ফরয নামাযগুলো ছাড়া বার রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করবে, তার জন্যে মহান আল্লাহ জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন। অথবা বলেছেন, তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করা হবে।" (মুসলিম ৭২৮) আর এই সুন্নাত নামাযগুলো এবং যাবতীয় নফল নামাযগুলো মুসলিমের স্বীয় বাড়িতে আদায় করাই হলো উত্তম। কারণ, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا)) رواه مسلم ٧٧٨

অর্থাৎ, "যখন তোমাদের কেউ মসজিদে নামায আদায় করে, তখন সে যেন তার নামাযের কিয়দংশ স্বীয় বাড়ির জন্য ছেড়ে রাখে, কারণ, অবশ্যই আল্লাহ তার বাড়ির নামাযের জন্য কল্যাণ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।" (মুসলিম ৭৭৮) অনুরূপ বুখারী ও মুসলিম শরীফে যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((. . . فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ)) متفق عليه ٦١١٣-٧٨١

অর্থাৎ, "ফরয নামায ব্যতীত মানুষের উত্তম নামায হলো তার বাড়ির নামায।" (বুখারী ৬১১৩-মুসলিম ৭৮১)

বিতর নামাযঃ

বিতর নামায আদায় করা মুসলিমের জন্য সুন্নাত। তবে এটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। এই নামাযের সময় হলো, ঈশার পর থেকে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত। আর এর উত্তম সময় হলো, শেষ রাত্রি যে তার (এই শেষ রাতে) উঠতে পারার উপর পুরো আশাবাদী। এটা এমন এক সুন্নাত যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) কখনোও ত্যাগ করেন নি, বরং সফরে ও বাড়িতে থাকা অবস্থায় সদা-সর্বদা এর যত্ন নিয়েছেন। বিতরের সর্ব নিম্ন সংখ্যা হলো, এক রাকআত। কোন কোন রাতে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এগার রাকআত পড়তেন। যেমন আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে,

((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ)) رواه مسلم ٧٣٦

"রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) রাতে এগার রাকআত নামায পড়তেন। তার মধ্য থেকে এক রাকআতকে বিতর বানাতেন।" (মুসলিম ৭৩৬) আর রাতের নামাযগুলো দু'রাকআত দু'রাকআত করে পড়াই নিয়ম।

কারণ, ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন,

((صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى)) رواه مسلم ٧٤٩

অর্থাৎ, "রাতের নামায দু'রাকআত দু'রাকআত করে পড়বে। যখন কেউ প্রভাত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করবে, তখন সে এক রাকআত পড়ে পূর্বে পড়া সব নামাযকে বিতর বানিয়ে দেবে।" (মুসলিম ৭৪৯) কখনো কখনো বিতর নামাযে রুকু'র পর দুআয়ে কুনুত পড়া মুস্তাহাব। কেননা, হাসান ইবনে আলী (রাযী আল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁকে কিছু বাক্য শিখিয়ে দিয়েছিলেন যা তিনি বিতরের দুআয় বলতেন। তবে অব্যাহতভাবে পড়া ঠিক নয়। কারণ, যাঁরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর নামাযের বিবরণ দিয়েছেন, তাঁরা কেউ তাঁর কুনুতের কথা উল্লেখ করেন নি। আর যার রাতের নামায ছুটে যাবে, সেই নামাযগুলো দিনে জোড় সংখ্যায় আদায় করা তার জন্য মুস্তাহাব। অর্থাৎ, দু'রাকআত, চার রাকআত, ছয় রাকআত, দশ রাকআত অথবা বার বারকআত পড়বে। কারণ, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এইরূপ করেছেন।

ফজরের দু'রাকআতঃ

ফজরের দু'রাকআত সুন্নাতও সেই সুন্নাতসমূহের অন্তর্ভুক্ত যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) যত্ন সহকারে আদায় করেছেন এবং সফরে ও ঘরে অবস্থান করা কালীন কোন সময় তা ত্যাগ করেন নি। যেমন, আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে,

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ)) متفق عليه ١١٦٣-٧٢٤

অর্থাৎ, "নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) সুন্নাত নামাযগুলোর মধ্যে অন্যান্য সুন্নাতের তুলনায় ফজরের দু'রাকআত সুন্নাতের সর্বাধিক যত্ন নিতেন।" (বুখারী ১১৬৩-মুসলিম ৭২৪) আর এই দু'রাকআত সুন্নাত সম্পর্কে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا)) رواه مسلم ٧٢٥

অর্থাৎ, "এই দু'রাকআত সুন্নাত সারা দুনিয়ার চাইতে আমার কাছে প্রিয়।" (মুসলিম ৭২৫) (ফজরের দু'রাকআতের ব্যাপারে) সুন্নাত হলো, প্রথম রাকআতে ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ 'কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফেরুন' পড়া। দ্বিতীয় রাকআতে ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ 'কুল-হু-ওয়াল্লাহু আহাদ' পড়া। আবার কখনো প্রথম রাকআতে ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا...الآية﴾ 'কুলু-আমান্না-বিল্লা-হি অমা উনযিলা ইলায়না---' আয়াটি পড়া। (বাক্বারাঃ ১৩৬) কখনো ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ...﴾ 'কুল ইয়া আহলাল কিতাবি তাআ'লাউ ইলা কালিমাতিন সাওয়ায়িন বায়নানা- অ বায়নাকুম---'আয়াতটি পড়া। (আলে-ইমরানঃ ৬৪) অনুরূপ এই দু'রাকআতকে হাল্কা করে পড়াই সুন্নাত। কারণ, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) হাল্কা করেই পড়েছেন। যে ফজরের (ফরয) নামাযের পূর্বে এই দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করতে পারবে না, সে নামাযের পড়ে তা আদায় করে নেবে। তবে উত্তম হলো, সূর্যোদয়ের পর যখন তা সড়কি পরিমাণ উপরে উঠে যাবে, তখন থেকে নিয়ে সূর্য ঢলার আগে নিষিদ্ধ সময়ের পূর্ব মহূর্ত পর্যন্ত যে কোন সময় আদায় করা।

চাশ্তের নামাযঃ

এটাকেই 'সালাতে আওয়াবীন' বলা হয়। গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নত। বহু হাদীসে এই নামায পড়ার প্রতি

উৎসাহ দান করা হয়েছে। যেমন, আবূ যার (রাঃ) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন,

((يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى)) رواه مسلم ٧٢٠

অর্থাৎ, " তোমাদের প্রত্যেকেই এমন অবস্থায় প্রভাত করে যে, তাকে তার প্রত্যেক জোড়াগুলোর পরিবর্তে সাদক্বা দিতে হয়। কাজেই প্রত্যেক বার 'সুবহানাল্লাহ' বলা সাদক্বা হিসেবে গণ্য হয়, প্রত্যেক বার 'আলহামদু লিল্লাহ' বলা সাদক্বা হিসেবে বিবেচিত হয়, প্রত্যেক বার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা সাদক্বা হিসেবে বিবেচিত হয়, প্রত্যেক বার 'আল্লাহু আকবার' বলা সাদক্বা হিসেবে গণ্য হয় এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করাও সাদক্বা হিসেবে বিবেচিত হয়। আর এ সবের মুকাবিলায় চাশ্তের দু'রাকআ'ত নামায পড়াই হয় যথেষ্ট'। (মুসলিম ৭২০) অনুরূপ আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

((أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ، صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ)) متفق عليه ١١٧٨-مسلم ٧٢١

অর্থাৎ, "আমার বন্ধু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আমাকে তিনটি বিষয়ের অসিয়ত করেছেন। যতদিন জীবিত থাকবো আমি সেগুলো কখনোও ত্যাগ করবো না। সেগুলো হচ্ছে, প্রতিমাসে তিন দিন রোযা রাখা, চাশ্তের নামায পড়া এবং বিতর পড়ে ঘুমানো'। (বুখারী ১১৭৮-মুসলিম ৭২১)

এই নামাযের উত্তম সময় হলো, সূর্য অনেকটা উঠে যখন তার তাপ তীব্র হয় এবং সূর্য ঢলে গেলে তার সময় শেষ হয়ে যায়। এই নামাযের কম-সে-কম সংখ্যা হলো দু'রাকআত, বেশী কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই।

যে সময়ে নামায পড়া নিষেধঃ

কিছু সময় আছে যে সময়ে নামায পড়া নিষেধ। আর তা হলো,

১। ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্য উঠে তা সড়কি পরিমাণ উপরে উঠা পর্যন্ত।

২। যখন সূর্য আকাশে ঠিক মাথার উপরে অবস্থিত বিন্দুতে স্থির হয়ে যায়, তখন (আর এটা জানা যায় ছায়া স্থির হয়ে গেলে।) থেকে সূর্য পশ্চিমে ঢলে যাওয়া পর্যন্ত।

৩। আসরের নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

এমন কিছু নামায আছে, যা নিষিদ্ধ সময়েও পড়া যায়। যেমন, 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' (দাখেলী মসজিদ)-এর, জানাযার, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের এবং তাওয়াফের পরের দু'রাকআত ও ওযুর নামায ইত্যাদি যা কারণ বিশিষ্ট নামায। অনুরূপ অনাদায় রয়ে যাওয়া ফরয নামাযও (নিষিদ্ধ সময়ে) কাযা করা যায়। কারণ, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا)) متفق عليه ٥٩٧-٦٨٤

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি কোন নামায ভুলে যায় অথবা নিদ্রার কারণে ছুটে যায় তার কাফ্ফারা হলো, স্মরণ হওয়ার পর তা পড়ে নেওয়া।" (বুখারী ৫৯৭-মুসলিম ৬৮৪) অনুরূপ ফজরের সুন্নাতও (ফরযের পর পড়া যায়)। আর যে যোহরের সুন্নাত সময়ে পড়তে পারে নি, সে আসরের পর তা কাযা করতে পারে।

أحكام الزكاة
যাকাতের বিধানঃ

যাকাত হলো ইসলামের রূকনসমূহের তৃতীয় রূকন। যে মুসলিম নেসাবের মালিক হয় এবং তাতে এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায়, তার উপর যাকাত ওয়াজিব হয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ﴾ [البقرة ١١٠]

অর্থাৎ, "নামায কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর।" (সূরা বাক্বারাঃ ১১০) যাকাতের বিধান প্রণয়নের মধ্যে রয়েছে বহু লাভ ও উপকারিতা। যেমন,

১। আত্মাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করণ এবং কৃপণতার অভ্যাসকে তার থেকে দূরীকরণ।
২। দানশীলতার অভ্যাসে মুসলিমদের অভ্যস্ত করণ।
৩। ধনী ও গরীবের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপিত করণ। কারণ মানুষ তার অনুগ্রহকারীর প্রতি ভালবাসা পোষণ করে।
৪। অভাবী মুসলিমদের দেখা-শুনা করণ ও তাদের প্রয়োজন পূরণ করণ।
৫। মানুষকে পাপ থেকে পবিত্র করণও যাকাতের উপকারিতার অন্তর্ভুক্ত। কেননা, যাকাত প্রদানে পাপ মোচন হয় এবং মর্যাদা-সম্মান বৃদ্ধি পায়।

কিসে যাকাত ওয়াজিব হয়?

সোনা ও রূপা, ব্যবসা সামগ্রী, চতুষ্পদ জানোয়ার এবং জমি থেকে উৎপাদিত ফসলাদি ও খনিজদ্রব্যে যাকাত ওয়াজিব হয়।

সোনা ও রূপার যাকাত

সোনা ও রূপা যে প্রকারের হোক না কেন যখনই কেউ নেসাবের মালিক হবে, তখনই তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। সোনার নেসাব হলো, 'কুড়ি মিসকাল' অর্থাৎ, ৮৫ গ্রাম সমপরিমাণ। আর রূপার নেসাব হলো, '২০০ দিরহাম নববী' অর্থাৎ, ৫৯৫ গ্রাম সমপরিমাণ। যে ব্যক্তি সোনার অথবা রূপার উল্লিখিত নেসাবের মালিক হবে, তাকে শতকরা আড়াই ভাগ (২.৫ %) যাকাত আদায় করতে হবে। যদি কেউ প্রচলিত মুদ্রায় সোনার ও রূপার যাকাত আদায় করতে চায়, তাহলে তাকে এক বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার সময় এক গ্রাম সোনা ও রূপার দাম কত সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে হবে। অতঃপর সে তার দেশে প্রচলিত মুদ্রায় সেই সমপরিমাণ যাকাত আদায় করবে। এর উদাহরণ হলো,

মনে করুন, যদি কোন ব্যক্তি ১০০ গ্রাম সোনার মালিক হয়, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে, যদি এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। কেননা, সে নেসাবের মালিক হয়ে গেছে। আর তাতে যাকাত লাগবে ২,৫ গ্রাম। এবার সে যদি প্রচলিত মুদ্রায় যাকাত আদায় করতে চায়, তাহলে এক বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার সময় সোনার দাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে এবং সোনার দাম অনুয়াযী এক গ্রাম সোনার যে মূল্য দাঁড়ায় সেই মূল্য অনুপাতে ২,৫ গ্রাম সোনার যা মূল্য হবে তা প্রচলিত মুদ্রায় আদায় করবে। রূপার ক্ষেত্রেও অনুরূপ করবে।

অনুরূপ প্রচলিত মুদ্রাতেও যাকাত ওয়াজিব, যদি তা নেসাব পর্যন্ত পৌঁছে এবং এক বছর অতিবাহিত হয়। সুতরাং যদি কেউ ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের মূল্যের মালিক হয়, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। তাকে ২,৫ % সমপরিমাণ যাকাত আদায় করতে হবে। যে মুসলিমের নিকট এক বছর পর্যন্ত গচ্ছিত কোন মাল থাকবে, সে সোনা বিক্রেতাকে ৮৫ গ্রাম সোনার মূল্য জিজ্ঞাসা করবে। অতঃপর তার মাল যদি সেই পরিমাণ হয়, তাহলে যাকাত আদায় করবে। কিন্তু যদি তার মাল সেই পরিমাণ না হয়, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব

হবে না। এর উদাহরণ নিম্নরূপ,

যদি কোন ব্যক্তির নিকট ৮০০ রিয়াল থাকে এবং তাতে এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে সে এক গ্রাম রূপার দাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, যদি তার দেশের মুদ্রার মূল্য রূপার উপর নির্ধারিত হয়, অতঃপর যদি দেখে ৫৯৫ গ্রাম রূপার দাম ৮৪০ রিয়াল সমপরিমাণ, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। কারণ তার নিকট যে মুদ্রা রয়েছে, তা নেসাব পর্যন্ত পৌঁচাচ্ছে না। আর তা হলো, ৫৯৫ গ্রাম রূপা। সোনার ব্যাপারটাও অনুরূপ।

ব্যবসায় সামগ্রীতে যাকাত

টাকা-পয়সার মালিকানাসম্পন্ন এমন মুসলিম ব্যবসায়ী যে তার টাকা-পয়সাকে ব্যবসায় লাগিয়েছে, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের এবং স্বীয় অভাবী ভাইদের প্রয়োজন পূরণের জন্য বার্ষিক যাকাত আদায় করা তার উপর ওয়াজিব। স্থাবর সম্পত্তি, পশু, খাদ্য দ্রব্য ও গাড়ি ইত্যাদি সহ যা কিছু লাভের উদ্দেশ্যে কেনা-বেচার জন্যই রাখা হয়েছে, এ সবেরই যাকাত লাগবে। তবে এই প্রকার জিনিসের উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হলো, নেসাব পর্যন্ত পৌঁছান। আর সোনা অথবা রূপার মূল্য অনুপাতেই এ সবের নেসাব নির্বাচিত হবে। সুতরাং সোনা ও রূপার নেসাবের যা মূল্য হয়, ততটা সমপরিমাণ উল্লিখিত ব্যবসায় সামগ্রী যদি কারো নিকট থাকে, তাকে ২.৫ % যাকাত আদায় করতে হবে। তাই যদি কেউ এক লাখ রিয়াল সমপরিমাণ ব্যবসায় সামগ্রীর মালিক হয়, তাকে ২৫০০ রিয়াল যাকাত দিতে হবে। আর যারা শুধু ক্রয়-বিক্রয় করে, তাদের কর্তব্য হলো, প্রত্যেক বছরের শেষে তাদের নিকট মজুদ তহবিলের হিসাব করা এবং তার যাকাত আদায় করা। যদি কোন ব্যক্তি তার নিকট সঞ্চিত অর্থের এক বছর অতিবাহিত হওয়ার দশদিন পূর্বে অন্য সামান কিনে নেয়, তাহলে তাকে সমষ্টির যাকাত আদায় করতে হবে। আর প্রথম যেদিন থেকে ব্যবসা আরম্ভ করবে, সেদিন থেকেই বছরের গণনা শুরু হবে। যাকাত বছরে একবারই লাগে। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত তার নিকট মজুদ জিনিসের যাকাত যেন প্রত্যেক বছর আদায় করে দেয়। যে পশুর খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হয়, তা যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে, সংখ্যায় নেসাব পর্যন্ত পৌঁছাক আর না পৌঁছাক তাতে কোন কিছু এসে যায় না। প্রচলিত মুদ্রায় তার মূল্য নেসাব পর্যন্ত পৌঁছালেই, তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে এবং প্রচলিত মুদ্রায় তার যাকাত আদায় করতে হবে।

শরীকানায় যাকাত

বর্তমানে মানুষ স্থাবর সম্পত্তি ইত্যাদিতে শেয়ার (অপরের সাথে অংশে শরীক হয়ে) যৌথভাবে কারবার করে। আবার কেউ কেউ এতে কয়েক বছর পর্যন্ত তার পুঁজি লাগিয়ে রাখে, যা বৃদ্ধি পেতেও পারে, আবার হ্রাস পেতেও পারে। এই (অপরের সাথে লাগিয়ে রাখা) অংশসমূহে যাকাত ওয়াজিব। কেননা, এটা ব্যবসা সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক মুসলিমের উচিত প্রত্যেক বছর তার অংশের মূল্য সম্পর্কে জানবে এবং তার যাকাত আদায় করবে।

জমি থেকে উৎপন্ন ফসলের যাকাত

খেজুর, কিশমিশ, গম, যব এবং ধান ইত্যাদি সহ যে ফসল ও ফলাদি ওজন করা যায় ও সুরক্ষিত রাখা যায়, তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। তবে ফল-মূল (যা সুরক্ষিত রাখা যায় না) ও শাক-সবজীতে যাকাত ওয়াজিব হয় না। আর উল্লিখিত ফসলে যাকাত তখনই ওয়াজিব হবে, যখন তা নেসাব পর্যন্ত পৌঁছবে। ফসলের নেসাব হলো, ৬১২ কিলো গ্রাম। এ প্রকারের জিনিসে এক বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্ত আরোপিত হবে না, বরং যখনই ফসল ও ফলাদি পেকে যাবে এবং তার ব্যবহার যোগ্যতা প্রকাশিত হয়ে যাবে, তখনই তাতে যাকাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর এই প্রকারের ফসলাদি যদি কোন প্রকারের শ্রম ব্যতীত বৃষ্টি অথবা নদীর বা প্রবহমান কূপের পানির সাহায্যে চাষাবাদ করা হয়, তাহলে উক্ত জমির উৎপাদিত ফসলের দশভাগের একভাগ যাকাত

আদায় করতে হবে। কিন্তু যে জমি শ্রমের সাহায্যে সেচ করতে হয়, সে জমির উৎপন্ন ফসলের বিশভাগের একভাগ লাগবে। যেমন মনে করুন, কোন ব্যক্তি গম লাগালো এবং তাতে ৮০০ কিলো গম উৎপাদিত হলো, এমতা- বস্থায় তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। কারণ, গমের নেসাব হলো, ৬১২ কিলো গ্রাম। আর তাতে দশভাগের একভাগ, অর্থাৎ ৮০ কিলো লাগবে, যদি বিনা শ্রমে চাষাবাদ হয়ে থাকে। তবে যদি শ্রমের সাহায্যে চাষাবাদ হয়ে থাকে, তাহলে তাতে বিশভাগের একভাগ অর্থাৎ, ৪০ কিলো লাগবে।

চতুষ্পদ জন্তুর যাকাত

চতুষ্পদ জন্তু বলতে, উট, গরু-মোষ, ছাগল ও ভেড়াকে বুঝানো হয়েছে। নিম্নে বর্ণিত শর্তের ভিত্তিতে এ সবের যাকাত ওয়াজিব হবে।

১। নেসাব পর্যন্ত পৌঁছানো। উটের সর্ব নিম্ন নেসাব হলো, পাঁচ। ছাগল ও ভেড়ার নেসাব হলো, চল্লিশ। গরু ও মোষের নেসাব হলো, ত্রিশ। এই নেসাবের কম উট, গরু-মোষ, ছাগল ও ভেড়া থাকলে, তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

২। মালিকের নিকট এক বছর অতিবাহিত হওয়া।

৩। চারণভূমিতে চরে খাওয়া জানোয়ার হওয়া। অর্থাৎ চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে সেই জন্তুরই যাকাত আদায় করতে হবে, যারা বছরের অধিকাংশ দিনগুলোতে চরে খায়। কিন্তু যাদের কিনে খাওয়াতে হয়, অথবা, যাদের খাওয়ার ব্যবস্থা মালিক নিজে করে, সেগুলোতে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

৪। কাজের জন্য যেন না হয়। যাকে মালিক চাষের কাজে ও বোঝাবহন ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করে, তাতে যাকাত লাগবে না।

উটের যাকাত

উটের যাকাত তখনই ওয়াজিব হবে, যখন তা পাঁচ পর্যন্ত নেসাবে পৌঁছবে। সুতরাং যখন কোন মুসলিম পাঁচ থেকে নয়টি উটের মালিক হবে এবং তাতে এক বছর অতিবাহিত হয়ে যাবে, তাকে একটি ছাগল যাকাত হিসাবে দিতে হবে। আর ১০ থেকে ১৪টি উটের মালিক হলে, দু'টি ছাগল লাগবে। আর ১৫ থেকে ১৯টি উটের মালিক হলে, তিনটি ছাগল লাগবে। ২০ থেকে ২৪টি উটের মালিক হলে, ৪টি ছাগল লাগবে। ২৫ থেকে ৩৫টি উটের মালিক হলে, একটি 'বিনতে মাখায' অর্থাৎ, পূর্ণ এক বছরের একটি উটের বকনা বাছুর লাগবে। তবে যদি এক বছরের বকনা বাছুর না পায়, তাহলে 'ইবনে লাবুন' অর্থাৎ, পূর্ণ দুই বছরের একটি দামড়া বাছুর যথেষ্ট হবে। আর যদি ৩৬ থেকে ৪৫টি উটের মালিক হয়, তাহলে তাকে একটি 'বিনতে লাবুন' অর্থাৎ, পূর্ণ দুই বছরের বকনা বাছুর লাগবে। আর ৪৬ থেকে ৬০ পর্যন্ত উটে 'হিক্কা' অর্থাৎ, পূর্ণ তিন বছরের একটি উটের বাছুর লাগবে। আর ৬১ থেকে ৭৫টি উটে 'জিযআ' অর্থাৎ, পুর্ণ চার বছরের একটি বকনা বাছুর লাগবে। ৭৬ থেকে ৯০টি উটে 'বিনতা লাবুন' অর্থাৎ, পূর্ণ দুই বছরের দু'টি বকনা বাছুর লাগবে। আর ৯১ থেকে ১২০টি উটের মালিক হলে, তাতে 'হিক্কাতান' অর্থাৎ, পূর্ণ তিন বছরের দু'টি বকনা বাছুর লাগবে। উল্লিখিত নেসাবের অতিরিক্ত হলে প্রত্যেক চল্লিশে একটি দুই বছরের বাছুর এবং প্রত্যেক পঞ্চাশে তিন বছরের বাছুর লাগবে।

নিম্নের তালিকাটি উটের যাকাতের ব্যাপারটা আরো সুন্দরভাবে বুঝতে সহায়তা করবে।

সংখ্যা		লাগবে	সংখ্যা		লাগবে
থেকে	পর্যন্ত		থেকে	পর্যন্ত	
৫	৯	১টি ছাগল।	৩৬	৪৫	উটের পূর্ণ দুই বছরের ১টি বকনা বাছুর।
১০	১৪	২টি ছাগল।	৪৬	৬০	পূর্ণ ৩বছরের বকনা বাছুর।

১৫	১৯	৩টি ছাগল।	৬১	৭৫	পূর্ণ চার বছরের বকনা বাছুর।
২০	২৪	৪টি ছাগল	৭৬	৯০	পূর্ণ ১বছরের দু'টি বাছুর।
২৫	৩৫	উটের পূর্ণ এক বছরের একটি বকনা বাছুর।	৯১	১২০	পূর্ণ চার বছরের দু'টি বাছুর।

উল্লিখিত নেসাবের অতিরিক্ত হলে প্রত্যেক চল্লিশে একটি দুই বছরের বাছুর এবং প্রত্যেক পঞ্চাশে তিন বছরের বাছুর লাগবে।

গরু ও মোষের যাকাত

যদি কোন ব্যক্তি ৩০ থেকে ৩৯টি গরু ও মোষের মালিক হয়, তাহলে তাকে পূর্ণ এক বছরের একটি বাছুর যাকাত হিসাবে দিতে হবে। আর যদি ৪০ থেকে ৫৯টি গরু ও মোষের মালিক হয়, তাহলে পূর্ণ দুই বছরের একটি বাছুর দিতে হবে। ৬০ থেকে ৬৯টির গরু ও মোষের মালিক হয়, তাহলে পূর্ণ এক বছরের দু'টি বাছুর লাগবে। আর৭০ থেকে৭৯টির মালিক হলে, একটি দুই বছরের ও একটি এক বছরের বাছুর লাগবে। অতঃপর প্রত্যেক ৩০টায় একটি এক বছরের এবং প্রত্যেক ৪০টায় দুই বছরের বাছুর লাগবে। নিম্নের তালিকায় দেখুন,

সংখ্যা		যাকাত লাগবে
থেকে	পর্যন্ত	
৩০	৩৯	পূর্ণ এক বছরের বাছুর।
৪০	৫৯	পূর্ণ দুই বছরের বাছুর।
৬০	৬৯	পূর্ণ এক বছরের দু'টি বাছুর।
৭০	৭৯	একটি এক বছরের ও একটি দুই বছরের বাছুর।

ছাগলের যাকাত

যদি কোন ব্যক্তি ৪০ থেকে ১২০টি ছাগলের মালিক হয়, তাহলে একটি ছাগল যাকাত হিসাবে আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে। আর ১২১ থেকে ২০০টি ছাগলের মালিক হলে, দু'টি ছাগল তার উপর ওয়াজিব হবে।২০১ থেকে ৩০০ পর্যন্ত তিনটি ছাগল লাগবে। ৩০১ থেকে ৪০০ পর্যন্ত চারটি ছাগল দিতে হবে। ৪০১ থেকে ৫০০ পর্যন্ত পাঁচটি ছাগল লাগবে। অতঃপর প্রত্যেক ১০০টায় একটি করে লাগবে।

তালিকা

সংখ্যা		যাকাত লাগবে।
থেকে	পর্যন্ত	
৪০	১২০	একটি ছাগল।
১২১	২০০	দু'টি ছাগল।
২০১	৩০০	তিনটি ছাগল।
৩০১	৪০০	চারটি ছাগল।
৪০১	৫০০	পাঁচটি ছাগল।

যাকাতের হকদার মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴾ [التوبة ٦٠]

অর্থাৎ, “এই সাদকাসমূহ মূলতঃ ফকীর ও মিসকীনদের জন্য, আর তাদের জন্য যারা সাদকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত এবং তাদের জন্য যাদের মন জয় করা হলো উদ্দেশ্য। সেই সাথে এটা গলদেশের মুক্তিদানে ও ঋণ ভারাক্রান্তদের সাহায্যে, আল্লাহর পথে ও পথিক মুসাফিরদের কল্যাণে ব্যয় করার জন্য; এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফরয। আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি সুবিজ্ঞ ও সুবিবেচক।”(সূরা তাওবাঃ৬০) এই আয়াতে মহান আল্লাহ আট প্রকার মানুষের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা যাকাতের হকদার। ইসলামে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা হয় সামাজিক উন্নয়নে ও অভাবীদের মধ্যে। অন্যান্য ধর্মের ন্যায় যাকাত শুধু আলেম-উলামাদের জন্য নির্দিষ্ট নয়।

১। ফকীর তাকেই বলা হয়, যার নিকট প্রয়োজনের অর্ধেক থাকে।

২। মিসকীন তাকে বলা হয়, যার নিকট তার প্রয়োজনের অর্ধেক থেকে বেশী থাকে, কিন্তু তাতে তার যথেষ্ট হয় না। সুতরাং তাকে তার প্রয়োজনানুযায়ী ততটা পরিমাণ অর্থ যাকাত থেকে দেওয়া যাবে, যা তার কয়েক মাস অথবা এক বছরের জন্য যথেষ্ট হবে।

৩। সাদকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিরা। অর্থাৎ, যাদেরকে বাদশাহ কর্তৃক যাকাত আদায়ের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। তাদেরকে তাদের কাজানুযায়ী উচিত অর্থ দিতে হবে যদিও তারা ধনী হয়।

৪। যাদের মন জয় করার উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ, এমন সর্দার যার বংশের লোকেরা তার অনুসরণ করে, যার ইসলাম গ্রহণের আশা করা যায় অথবা যার থেকে মুসলিমদের অনিষ্টের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে। অনুরূপ ইসলামে নবাগত মুসলিম, এ সকল প্রকারের মানুষকে তাদের মন জয় করার উদ্দেশ্যে এবং তাদের ঈমানকে আরো সুদৃঢ় করতে যাকাত থেকে দেওয়া যাবে।

৫। অনুরূপ ক্রীতদাসকে তার দাসত্ব জীবন থেকে মুক্তি দিতে এবং দুশমনের হাতে বন্দীদের ছাড়াতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

৬। ঋণীদেরকে। অর্থাৎ, যাদের উপর ঋণের বোঝা, তাদেরকে ঋণ পরিশোধের জন্য যাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে। তবে শর্ত হলো, তাকে মুসলিম হতে হবে এবং সে এমন কোন ধনী ব্যক্তি যেন না হয়, যে তার ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম। আর তার ঋণ যেন এমন হয়, যা অতিসত্বর আদায় করা দরকার এবং তা কোন অন্যায় কাজে যেন গ্রহণ করা না হয়ে থাকে।

৭। আল্লাহর পথে। অর্থাৎ, যে মুজাহিদ বিনা কোন বেতনে আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তাদের জন্য অথবা তাদের অস্ত্র-শস্ত্র কেনার জন্য যাকাত থেকে দেওয়া যাবে। অনুরূপ যারা শরীয়তী জ্ঞানার্জন করে, তারাও জিহাদের আওতায় পরে। সুতরাং এমন কেউ যদি থাকে, যে শরীয়তী জ্ঞানার্জন করতে চায়, কিন্তু তার অর্থের অভাব, এমতাবস্থায় তাকে শরীয়তী জ্ঞানার্জনে সক্ষম করতে যাকাত থেকে দেওয়া জায়েয হবে।

৮। মুসাফির। অর্থাৎ, যে পথের মধ্যে নিঃস্ব হয়ে গেছে। তার নিকট তার বাড়ী পর্যন্ত পৌছার মত কিছুই নাই, এমতাবস্থায় তাকে বাড়ী পর্যন্ত পৌছার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যাকাত থেকে দেওয়া যাবে, যদিও সে তার শহরে ধনী ব্যক্তি হয়।

যাকাতের অর্থ কোন মসজিদ নির্মাণে এবং রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি মেরামতের কাজে ব্যয় করা যাবে না।

বিঃদ্রঃ

১। সমুদ্র থেকে অর্জিত জিনিসে যাকাত ওয়াজিব হবে না, যদি তা ব্যবসার জন্য না হয়। যেমন, মণি-মুক্তা, প্রবাল ও মাছ ইত্যাদি।

২। ভাড়াটে ঘরে, ফ্যাক্টরী ইত্যাদিতে যাকাত ওয়াজিব নয়। তবে তা থেকে উপার্জিত অর্থে যাকাত ওয়াজিব হবে, যদি এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। যেমন মনে করুন, এক ব্যক্তি বাড়ী ভাড়া দিল এবং বাড়ীর ভাড়া সে পেল, এমতাবস্থায় তার এই ভাড়া থেকে উপার্জিত অর্থ যদি নেসাব পর্যন্ত পৌছে যায় ও এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে।

أحكام الصيام
রোযার বিধান

রোযার নির্দেশঃ

রমযানের রোযা ইসলামের পাঁচটি মূল ভিত্তি-সমূহের অন্যতম ভিত্তি। যার প্রমাণ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর বাণী। তিনি বলেন,

((بُنِيَ الإِسلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ، وإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، صَوْمِ رَمَضَانَ)) متفق عليه ٨-١٦

অর্থাৎ, "ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর রাখা হয়েছে। আর তা হলো, এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর প্রেরিত রাসূল। নামায আদায় করা, যাকাত প্রদান করা, বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ আদায় করা এবং রমযান মাসের রোযা রাখা"।(বুখারী৮-মুসলিম ১৬) মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ফজর থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, যৌন- ক্ষুধা পূরণ ও অন্যান্য সমূহ খাদ্যদ্রব্য থেকে বিরত থাকার নামই হলো রোযা। রমযানের রোযা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সকলেই এক মত। আর রমযানের রোযা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ হলো, আল্লাহর এই বাণী,

﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة:١٨٥]

অর্থাৎ, "কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোকই এই মাসটি পায়, সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে"। বাকারাহঃ ১৮৫) জ্ঞানসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক সকল মুসলিমের উপর রোযা ওয়াজিব। ১৫ বছর বয়স সম্পূর্ণ হলে অথবা নাভির নিচের লোম উদগত হলে কিংবা স্বপ্নদোষ ইত্যাদির কারণে বীর্যস্খলন ঘটলে, বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) বলে গণ্য হবে। মহিলাদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ; তবে তাদের ক্ষেত্রে একটি জিনিস বৃদ্ধি হবে আর তা হলো, হায়েজ (মাসিক বা ঋতুস্রাব) আরম্ভ হওয়া।

উপরোক্ত জিনিসের কোন একটি কারো মধ্যে প্রকাশ পেলে, সে বালেগ বলে গণ্য হবে।

রমযান মাসের মাহাত্ম্য

আল্লাহ তায়া'লা পবিত্র রমযান মাসকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্যে ও গুণে বিশেষিত করেছেন যা অন্য মাসে পাওয়া যায় না। আর এই মাসের গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলো হলো,

১। ফেরেশতারা ততক্ষণ পর্যন্ত রোযাদারের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন, যতক্ষণ না সে ইফতারী করে।

২। বিতাড়িত শয়তানকে এ মাসে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়।

৩। এ মাসে রয়েছে একটি ক্বদরের (সম্মানের) রাত যা এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।

৪। রমযান মাসের শেষ রাত্রিতে সকল রোযাদারকে ক্ষমা করা হয়।

৫। এই মাসের প্রত্যেক রাতে আল্লাহ তায়া'লা অনেক মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন।

৬। এই মাসের একটি উমরার সাওয়াব একটি হজ্জের সমান। অনুরূপ আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসেও এই মহান মাসের ফযীলতের কথা এসেছে। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,

((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) متفق عليه ٣٨-٧٦٠

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস ও নেকীর আশায় রমযান মাসের রোযা রাখবে, তার বিগত গুনাহসমূহ ক্ষমা

করে দেওয়া হবে"। (বুখারী৩৮-মুসলিম ৭৬০) আর হাদীসে (কুদসীতে) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ))

متفق عليه ٥٩٢٧-١١٥١

অর্থাৎ, "আদম সন্তানের প্রত্যেক সৎ কাজের বিনিময় দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। মহান আল্লাহ বলেন, কিন্তু রোযা আমারই। (আমার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেই রেখেছে) তার প্রতিদান আমি নিজেই দিবো"। (বুখারী ৫৯২৭-মুসলিম ১১৫১)

রমযান প্রবেশের প্রমাণ

দু'টি জিনিসের যে কোন একটির দ্বারা রমযান প্রবেশের প্রমাণ হয়। যেমন, (১) রমযান মাসের চাঁদ দেখা। চাঁদ দেখা গেলেই রোযা ওয়াজিব হয়ে যায়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا)) متفق عليه ١٩٠٠-١٠٨٠

অর্থাৎ, "চাঁদ দেখে রোযা রাখবে এবং চাঁদ দেখেই রোযা ছাড়বে"। (বুখারী ১৯০০-মুসলিম ১০৮০) রমযানের চাঁদ দেখার প্রমাণে একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য যথেষ্ট হবে। তবে রোযা ছাড়ার ক্ষেত্রে শাওয়াল মাসের চাঁদের প্রমাণে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য অত্যাবশ্যক। (২) শাবান মাসের ৩০ দিন পূর্ণ করা। ৩০দিন পূর্ণ করলে ৩১দিনটাই রমযান মাসের প্রথম তারীখ হবে, কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ)) متفق عليه ١٩٠٧-١٠٨١

অর্থাৎ, "যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, তাহলে শাবান মাসের ৩০দিন পূর্ণ করো"।(বুখারী ১৯০৭-মুসলিম ১০৮১)

কাদের জন্য রোযা ছাড়া জায়েয?

১। এমন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যার আরোগ্যের আশা করা যায়। তার উপর রোযা রাখা কষ্টকর হলে, সে রোযা ছেড়ে দেবে এবং পরে তা কাযা করবে। তবে যার ব্যাধি চিরস্থায়ী হবে অর্থাৎ যার আরোগ্যের আশা থাকে না, তার পক্ষে রোযা রাখা জরুরী নয়। সে প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে দের কিলো খাদ্য দ্রব্য দ্বারা খাওয়াবে অথবা পানাহারের আয়োজন করে যতদিন রোযা ছেড়েছে ততগুলো মিসকিনকে আমন্ত্রণ করে খাওয়াবে।

২। মুসাফিরঃ মুসাফির বাড়ী থেকে যাওয়া থেকে নিয়ে পুনরায় বাড়ী প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত রোযা ছেড়ে দিতে পারবে, যতদিন না সে সেখানে বসবাসের নিয়ত করবে।

৩। গর্ভবতী ও দুধদানকারিণী মহিলারা নিজের ও ছেলের উপর কোন ক্ষতির আশঙ্কা বোধ করলে, রোযা ছেড়ে দিতে পারবে। অতঃপর কারণ দূরীভূত হয়ে গেলে ত্যাগকৃত দিনগুলোর রোযা কাযা করবে।

৪। যে বৃদ্ধ ব্যক্তির উপর রোযা রাখা কষ্টকর হবে, সে রোযা ছেড়ে দেবে এবং তাকে কাজাও করতে হবে না। তবে প্রত্যেক দিন একজন মিসকীন খাওয়াবে।

রোযা নষ্টকারী বস্তুসমূহ

১।ইচ্ছাকৃত পানাহার করাঃ তবে ভুলক্রমে কোন কিছু পানাহার করে ফেললে, তা রোযার উপর কোন প্রভাব সৃষ্টি করবে না। কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ...)) رواه مسلم ١١٥٥

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি ভুলে গিয়ে পানাহার করলো, সে যেন তার রোযা পূরণ করে"। (মুসলিম ১১৫৫) নাকের মাধ্যমে পেটে পানি প্রবেশ করলে, শিরার মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণ করলে এবং প্রয়োজনে শরীরে রক্ত প্রবেশ করালে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ এসবই রোযাদারের জন্য খাদ্য বলে গণ্য হয়।

২। যৌনক্ষুধা পূরণ করাঃ যখনই কোন ব্যক্তি (তার স্ত্রীর সাথে) যৌনক্ষুধা পূরণ করবে, তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। তার উপর কাজা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। কাফফারা হলো, কোন ক্রীত দাস-দাসী স্বাধীন করা, তা না পেলে একাধারে দু'মাস রোযা রাখা। কোন শরিয়াতী কারণ ছাড়া যেমন, দু'ঈদের দিন ও আয়্যামে তাশরীক (জিল হজ্জ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারীখ) এ-রোযা রাখা অথবা মানসিক কারণ যেমন, রোগ-ব্যাধি এবং রোযা না ছাড়ার উদ্দেশ্য সফর করা ইত্যাদি ব্যতীত এই দু'মাসের কোন এক দিনও রোযা ত্যাগ করা যাবে না। কোন কারণ ব্যতীত এক দিনও যদি রোযা বাদ দেয়, তাহলে পুনরায় নতুনভাবে প্রথম থেকে রোযা রাখতে হবে। কারণ এতে ধারাবাহিকতা অপরিহার্য। যদি দু'মাস রোযা রাখতে অক্ষম হয়, তাহলে ৬০জন মিসকীনকে খাওয়াবে।

৩। জাগ্রত অবস্থায় চুম্বন করার অথবা হস্তমৈথুনের কারণে বীর্যপাত ঘটলেঃ এতে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে এবং তার উপর কাজা করা ওয়াজিব হবে, কাফফারা নয়। তবে স্বপ্নদোষে রোযা নষ্ট হয় না।

৪। সিঙ্গী ইত্যাদির মাধ্যমে শরীর থেকে দুষিত রক্ত বের করলে কিংবা দানের উদ্দেশ্যে বের করলে, রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। তবে স্বল্প পরিমাণ রক্ত বের করা যেমন পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বের করলে, তাতে রোযা নষ্ট হয় না। অনুরূপ নাকের রক্ত প্রবাহের রোগ অথবা আহত হওয়ার ও দাঁত উপড়ে ফেলার কারণে রক্ত বের হলে রোযা নষ্ট হবে না।

৫। ইচ্ছাকৃত বমি করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবেঃ অনিচ্ছাকৃত হলে নয়।

উপরোক্ত রোযা নষ্টকারী বস্তুসমূহের দ্বারা তখনই রোযাদারের রোযা নষ্ট হবে, যখন সে জেনে-শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে তা গ্রহণ করবে। কিন্তু যদি সে এ সম্পর্কীয় শরিয়তী বিধানের ব্যাপারে অজ্ঞ হয় অথবা ফজর উদিত হয়েছে কি না ও সূর্যাস্ত হয়েছে কি না ইত্যাদি ব্যাপারে সন্দেহ ক'রে কোন কিছু গ্রহণ করে, তাহলে তার রোযা নষ্ট হয় না। অনুরূপ স্বজ্ঞানে গ্রহণ করতে হবে, যদি ভুলে গ্রহণ করে থাকে, তাতে রোযা নষ্ট হবে না। আর উক্ত বস্তু নিজ ইখতিয়ারে গ্রহণ করতে হবে। নিরুপায় বা বাধ্যতামূলক ভাবে গ্রহণ করলে, রোযা নষ্ট হবে না, বরং তার রোযা বিশুদ্ধ বলে গণ্য হবে এবং তাকে কাযাও করতে হবে না।

৬। হায়েজ (মাসিক রক্ত স্রাব) ও নেফাস (প্রসবোত্তর রক্ত স্রাব) হওয়াও রোযা নষ্টকারী বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। রক্ত দেখার সাথে সাথেই মহিলাদের রোযা নষ্ট হয়ে যায়। অনুরূপ হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় নারীদের রোযা রাখা হারাম। তারা রমযানের পর ত্যাগকৃত রোযা কাযা করবে।

এমন কিছু জিনিস যার দ্বারা রোযা নষ্ট হয় না

১। গোসল করা, সাঁতারকাটা ও প্রচন্ড গ্রীষ্মজনিত তাপ হ্রাস করার নিমিত্তে পানি দ্বারা ঠান্ডা উপভোগ করার মত কাজ রোযাদারের রোযা নষ্ট করে না।

২। ফজর উদিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌনবাসনা পূরণ করাতে রোযা নষ্ট হয় না।

৩। দাঁতন করা, দিনে যে কোন সময় দাঁতন করা যাবে তাতে রোযার কোন ক্ষতি হবে না বরং সেটা মুস্তাহাব কাজ।

৪। যে কোন বৈধ ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা সাধন যা খাদ্যের কাজ করে না। তাই যে ইনজেকশন খাদ্যের কাজ করে না তার ব্যবহার এবং চোখে ও কানে ঔষধের ফোটা ফেলা জায়েজ আছে। তাতে রোযা নষ্ট হবে না, যদিও ঔষধের স্বাদ গলায় যায়। প্রেসার ইত্যাদির কারণে উদ্ভুত শ্বাসকষ্ট হ্রাস করার লক্ষ্যে স্প্রে ইত্যাদি ব্যবহার করা রোযাদারের জন্য জায়েয আছে। খাদ্যের স্বাদ (পরীক্ষার জন্যে) গ্রহণে রোযা নষ্ট হয় না। তবে শর্ত

হলো, তার কোন কিছুই যেন পেটে না যায়। কুল্লি করা ও নাকে পানি দেওয়া রোযাদারের জন্য জায়েজ আছে। তবে সতর্ক থাকতে হবে যেন পানির কোন পিছুই পেটে না যায়। অনুরূপ সুগন্ধি ব্যবহার ও শুঁকাতে কোন ক্ষতি নেই।

৫। মহিলাদের রাতের কোন ভাগে হায়েজ ও নেফাসের রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে ফজর উদিত হওয়ার পর পর্যন্ত গোসল বিলম্ব করতে পারে। অতঃপর ফজরের নামাযের উদ্দেশ্যে গোসল করবে। জুনবী (বীর্যপাতজনিত) অপবিত্র ব্যক্তির বিধানও অনুরূপ।

কতিপয় সতর্ক বাণী

১। কোন কাফের রমযান মাসে দিনের কোন অংশে ইসলাম গ্রহণ করলে, যখন ইসলাম গ্রহণ করবে তখন থেকে নিয়ে দিনের অবশিষ্ট অংশটাই পানাহার থেকে বিরত থাকা তার উপর ওয়াজিব। তবে তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে না।

২। ফজর উদিত হওয়ার পূর্বেই রাতের যে কোন ভাগে রোযার নিয়ত করা অপরিহার্য। তবে এটা শুধু ফরজ রোযার ক্ষেত্রে। নফল রোযার নিয়ত ফজর উদিত হওয়ার পরও করা যায়, এমনকি প্রভাত হয়ে গেলেও ক্ষতি নেই, তবে শর্ত হলো কিছু যেন পানাহার না করা হয়।

৩। ইফতারের সময় ইচ্ছামত দুআ করা রোযাদারের জন্য মুস্তাহাব। কারণ, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً لاَ تُرَدُّ)) رواه ابن ماجة ١٧٤٣

অর্থাৎ, "ইফতারের সময় রোযাদারের দুআ প্রত্যাখ্যাত হয় না"।(ইবনে মাজা ১৭৫৩) এই সময় প্রমাণিত দুআর মধ্যে হলো,

((ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ)) أبو داود ٢٣٥٧

(যাহাবায্যামা-উ অবতাল্লাতির উরুকু অ সাবাতাল আজরু ইশাআল্লা-হ)

অর্থাৎ, "পিপাসা দূরীভূত হয়েছে, ধমনীগুলো সিক্ত হয়েছে এবং সাওয়াব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইনশা- আল্লাহ"। (আবু দাউদ ২৩৫৭, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে হাসান/ভাল বলেছেন।)

৪। রোযার শুরুতে যদি কোন ব্যক্তি দিনের কোন ভাগে রমযান সম্পর্কে অবহিত হয়, তাহলে তাকে তখন থেকেই পানাহার ত্যাগ করতে হবে এবং কাজাও করতে হবে।

৫। যার উপর রোযা কাজা আছে, দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে তা তাড়াতাড়ি রেখে নেওয়া মুস্তাহাব। তবে বিলম্বতেও দোষ নেই। অনুরূপ একাধারে রাখা এবং কেটে কেটে রাখা উভয়ই তার জন্য জায়েয। কিন্তু দ্বিতীয় রমযান পর্যন্ত বিলম্ব করা জায়েয নয়।

রোযার সুন্নাত

১। সেহরী খাওয়াঃ কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً)) متفق عليه ١٩٢٣-١٠٩٥

অর্থাৎ, "সেহরী খাও; কেননা সেহরীতে বরকত নিহিত আছে"। (বুখারী ১৯২৩-মুসলিম ১০৯৫) শেষ রাত পর্যন্ত বিলম্ব করে সেহরী খাওয়াও সুন্নাত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ)) متفق عليه ١٩٥٧-١٠٩٨

অর্থাৎ, "যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ইফতারীতে তাড়াতাড়ি ও সেহরীতে বিলম্ব করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা

ভালতেই থাকবে"। (বুখারী ১৯৫৭-মুসলিম ১০৯৫)
২। সূর্যাস্তের পর পরেই শীঘ্র ইফতার করাঃ সদ্যপক্ক খেজুর দিয়ে ইফতার করা সুন্নাত। তা না পেলে শুষ্ক খেজুর, তা না পেলে পানি দিয়ে যদি এসবের কিছুই না পায়, তাহলে যা পাবে তা-ই দিয়ে ইফতার করবে।
৩। রোযা রাখা অবস্থায় বেশী বেশী দুআ করাঃ বিশেষ করে ইফতারীর সময়। কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((ثَلَاثُ دَعْوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ، دَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ)) رواه البيهقي وغيره

অর্থাৎ, 'তিন প্রকারের দুআ গৃহীত হয়, রোযাদারের দুআ, অত্যাচারিত ব্যক্তির দুআ এবং মুসাফিরের দুআ'। (বায়হাক্বী)
রোযাদারের উচিত রমযান মাসে (আল্লাহর ইবাদতের লক্ষ্যে) রাত্রি জাগরণ করা। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَاناً وَّاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) متفق عليه ٢٠٠٩-٧٥٩

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস ও নেকীর আশায় রমযান মাসে রাত্রি জাগরণ করে, তার বিগত সমস্ত গুনাহকে ক্ষমা করা হয়"। (বুখারী ২০০৯-মুসলিম ৭৫৯) তাই সকল মুসলিমের উচিত ইমামের সাথে তারাবীর নামায পূরণ করা। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ)) رواه أهل السنن

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামাযে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর সাথে থাকে, তার (নেকীর খাতায়) পূর্ণ এক রাত্রির ইবাদতের সাওয়াব লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়"। (সুনান গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। দ্রষ্টব্যঃ আল্লামা আলবানীর তিরমিযী ৮০৯, আবূ দাউদ ১৩৭৫, ইবনে মাজা ১৩২৭ এবং নাসায়ী ১৫৮৬) অনুরূপভাবে রমযান মাসে বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াতের যত্ন নেওয়া দরকার কারণ, রমযান মাস কুরআনের মাস। কুরআন তেলাওয়াতকারীর জন্য রয়েছে প্রত্যেক অক্ষরের পরিবর্তে নেকী। আর সে নেকী এক থেকে দশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

তারাবীর নামায

রমযান মাসের রাতে জামা'আত বদ্ধভাবে কিয়াম করার নামই হচ্ছে তারাবীহ। তারাবীর সময় হলো, ঈশার পর থেকে নিয়ে ফজর উদিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তারাবীর নামায আদায় করার ব্যাপারে দারুণভাবে উৎসাহিত করেছেন। এ ব্যাপারে সুন্নত হলো, ১১ রাকআত পড়া এবং প্রত্যেক দু'রাকআতে সালাম ফিরা। ১১ রাক'আতের অধিক পড়াতেও দোষ নেই। তারাবীহ নামাযে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা এবং নামাযকে এতটা লম্বা করা সুন্নত, যাতে মুসাল্লীদের কোন প্রকার অসুবিধা না হয়। ফিৎনার আশঙ্কা না থাকলে, মহিলারাও তারাবীর নামাযে উপস্থিত হতে পারবে। তবে শর্ত হলো, পর্দা বজায় রেখে, সৌন্দর্য প্রদর্শন থেকে বিরত থেকে ও সুগন্ধি ব্যবহার না করে বের হতে হবে।

সুন্নাতী রোযা

নিম্নে বর্ণিত দিনগুলোতে রোযা রাখার উপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আমাদেরকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছেন।

১। শাওয়াল মাসের ছয় দিন রোযা রাখাঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ)) رواه مسلم ١١٦٤

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি রমযান মাসের রোযার পর শাওয়ালের ছয়টি রোযাও রাখলো, সে যেন পুরো বছরটাই রোযা রাখলো"। (মুসলিম ১১৬৪)

২। সোমবার ও বৃহঃবার রোযা রাখাঃ

৩। প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোযা রাখাঃ আর তা চন্দ্র মাসের বিজোড় দিনগুলোতে রাখা উত্তম। যেমন, ১৩, ১৪ ও ১৫ তারীখ।

৪। **আ'শুরার রোযা রাখাঃ** অর্থাৎ, মুহররাম মাসের ১০ তারীখ। ইয়াহুদীদের বিরোধিতা করার জন্য ১০ তারীখের একদিন আগে অথবা পরে রোযা রাখা মুস্তাহাব। আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ)) رواه مسلم ١١٦٢

অর্থাৎ, "আশুরার রোযা রাখলে আল্লাহর নিকট আশা করি যে, তিনি বিগত বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।" (মুসলিম ১১৬২)

৫। আরাফার দিন রোযা রাখাঃ অর্থাৎ জিলহজ্জ মাসের ৯ তারীখে। হাদীসে বর্ণিত যে,

((صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ)) رواه مسلم ١١٦٢

অর্থাৎ, "আরাফার দিনে রোযা রাখলে, আল্লাহর নিকট আশা করি যে, তিনি বিগত বছরের ও আগামী বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।" (মুসলিম ১১৬২)

যে দিনে রোযা রাখা হারাম

১। দু'ঈদে, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে।

২। আয়্যামে তাশরীকে অর্থাৎ, জিলহজ্জ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারীখে। তবে কেরান অথবা তামাত্তো হজ্জকারী যদি কোরবানীর পশু না পায়, তাহলে তারা উক্ত বিধানের আওতায় আসবে না। (অর্থাৎ, তারা আয়্যামে তাশরীকে রোযা রাখতে পারবে।)

৩। হায়েজ ও নেফাসের দিনগুলোতে রোযা রাখা।

৪। স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত রোযা রাখা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

((لاتَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ)) متفق عليه ٥١٩٢-١٠٢٦

অর্থাৎ, "স্বামীর উপস্থিতিতে কোন স্ত্রী তার অনুমতি ছাড়া রমযান ব্যতীত অন্য কোন রোযা রাখতে পারে না"। (বুখারী ৫১৯২-মুসলিম ১০২৬)

أحكام الحج
হজ্জের বিধান

হজ্জের বিধান ও তার ফযীলত

হজ্জ প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর জীবনে একবারই ওয়াজিব হয় এবং তা হলো ইসলামের মূল ভিত্তি-সমূহের পঞ্চম ভিত্তি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران:٩٧]

অর্থাৎ, "লোকদের উপর আল্লাহর অধিকার রয়েছে যে, যার এই ঘর পর্যন্ত পৌঁছবার সামর্থ্য আছে, সে যেন হজ্জ সম্পন্ন করে"। (আলি-ইমরানঃ ৯৭) আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أن لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، ، والحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ)) متفق عليه٨-١٦

অর্থাৎ, "ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা, এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর প্রেরিত রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা এবং হজ্জ করা ও রমযান মাসের রোযা রাখা"। (বুখারী ৮-মুসলিম ১৬) হজ্জ হলো এমন উত্তম ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাজ, যদ্দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। যেমন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((مَنْ حَجَّ هَذاَ البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)) متفق عليه ١٨١٩-١٣٥٠

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি এই ঘরের হজ্জ করলো এবং নির্লজ্জ ও শরীয়ত বিরোধী কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখলো, সে ব্যক্তি হজ্জ থেকে এমন অবস্থায় বাড়ী প্রত্যাবর্তন করে, যেন সেই দিনই তার মা তাকে নব জাত শিশুরূপে প্রসব করছে"।(বুখারী ১৮১৯-মুসলিম ১৩৫০)

হজ্জের শর্তাবলী

জ্ঞানসম্পন্ন প্রত্যেক বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) মুসলিমের উপর হজ্জ ওয়াজিব, যদি সে সামর্থ্যবান হয়। সাওয়ারী ও খরচ-খরচার শক্তি থাকলেই সামর্থ্যের প্রমাণ হয়। তাই যদি কেউ সাওয়ারী, যাতায়াত, এবং খাওয়া-পরা ইত্যাদি সহ সমূহ প্রয়োজনীয় জিনিসের মালিক হয়, তাহলে সে সামর্থ্যবান বলে গণ্য হবে। আর এই খরচ তাদের সাংসারিক খরচ থেকে উদ্বৃত্ত ও অতিরিক্ত হতে হবে, যাদের উপর খরচ করা তার জন্য অত্যাবশ্যক। রাস্তার নিরাপত্তা ও শারীরিক সুস্থতাও সামর্থ্যের অন্তর্ভুক্ত। তাই এমন কোন ব্যাধিগ্রস্থ ও বিপদগ্রস্থ যেন না হয়, যা তার হজ্জ আদায়ে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। মহিলাদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত শর্তাবলী সহ মাহরাম সাথে থাকার শর্তও যুক্ত হবে। অর্থাৎ, হজ্জ যাত্রায় তার সাথে থাকতে হবে তার স্বামীকে অথবা এমন কোন ব্যক্তিকে যার সাথে তার বিয়ে চিরতরে হারাম। আর সে যেন কোন ইদ্দত পালনকারিনী মহিলাও না হয়, কারণ আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে বাড়ী থেকে বের হতে নিষেধ করেছেন। এই সমূহ অন্তরায়ের কোন একটিও যদি কারো ক্ষেত্রে দেখা দেয়, তার উপর হজ্জ ওয়াজিব হবে না।

হজ্জের আদবসমূহ

১। হজ্জ ও উমরাহকারীকে সফরের পূর্বেই হজ্জ ও উমরাহ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানার্জন করে নেয়া দরকার। তা সে পড়ে হোক অথবা জিজ্ঞাসাবাদ করে হোক।

২। এমন সৎ সাথীর সাথে যেতে আগ্রহী হওয়া, যে ভাল কাজে তার সহযোগিতা করবে। আর সে যদি কোন আলেম বা তালেবে ইলম হয়, তাহলে অতি উত্তম।

৩। হজ্জে তার উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর নৈকট্য লাভ।

৪। অনর্থক বাক্যালাপ থেকে জিহবাকে সতর্ক রাখা।

৫। দুআ ও যিক্র বেশী বেশী করা।

৬। লোকজনকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা।

৭। মহিলাদের পর্দা-পুশিদা বজায় রাখা এবং পুরুষদের ভীড় থেকে বাঁচতে চেষ্টা করা।

৮। হাজীদের এই ধারণা পোষণ করা যে, তারা একটি মহান ইবাদত সম্পাদনের জন্য বের হয়েছে। এই নয় যে, তারা কোন সাধারণ ভ্রমণে বের হয়েছে। কারণ, অনেক হাজী (আল্লাহ তাদের হিদায়েত দান করুন) এই ধারণা পোষণ করে যে, হজ্জ, ভ্রমণের একটি সুযোগ মাত্র, তাই তারা বিভিন্ন রকমের ছবি ও চিত্র এই সফরে তুলে।

ইহরাম

হজ্জ ও উমরার কার্যসমূহের মধ্যে প্রবেশ করার নামই হলো ইহরাম। আর ইহরাম বাঁধা তার উপর ওয়াজিব, যে হজ্জ ও উমরাহ আদায়ের ইরাদা করবে। মক্কা ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চল থেকে হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে আগমনকারীকে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) কর্তৃক নির্ধারিত মিকাতসমূহের কোন একটি মিকাত থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে। আর তা হলোঃ

১। মদীনাবাসীদের জন্য 'যুলহুলায়ফা' এটা মদীনার সন্নিকটে একটি ছোট গ্রাম যাকে বর্তমানে 'আবয়ারে আলী' বলা হয়।

২। শামবাসীদের জন্য 'আল-জোহফা' এটি রাবেগের নিকটে একটি গ্রাম। মানুষ বর্তমানে রাবেগ থেকেই ইহরাম বাঁধে।

৩। নাজদবাসীদের জন্য 'কারনুল মানাযেল' (আস্‌সায়লুল কাবীর) এটি তায়েফের সন্নিকটে একটি স্থান।

৪। ইয়ামানবাসী ও (ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে আগমনকারী সকল হাজীদের) জন্য 'ইয়ালামলাম'। মক্কা থেকে ৭০ কিমিঃ দূরে অবস্থিত একটি স্থান।

৫। ইরাকবাসীদের জন্য 'যাতে ইরক'।

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) কর্তৃক নির্ধারিত এই মিকাতসমূহ উপরোল্লিখিত তাদের জন্য এবং হজ্জ ও উমরাহ আদায়ের উদ্দেশ্যে আগমনকারী সকলের জন্য। মক্কাবাসী ও আহলে হিল (মিকাত ও হারাম সীমানার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থানকারী) নিজ নিজ বাসস্থান থেকেই ইহরাম বাঁধবে।

ইহরামের সুন্নাতঃ

১। নখ কাটা, বগলের চুল পরিষ্কার করা, মোচ কাটা, নাভির নিচের চুল পরিষ্কার করা এবং গোসল করা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা। তবে সুগন্ধি শরীরে ব্যবহার করবে, কাপড়ে নয়।

২। সিলাইবিহীন একটি লুঙ্গি ও চাদর ব্যবহার করা। মহিলারা পর্দা বজায় রেখে যে কোন কাপড় ব্যবহার করতে পারবে। তবে পর-পুরুষের সামনে নিজের সৌন্দর্যের প্রদর্শনী ও হাত-মুখ খোলা থেকে সতর্ক থাকতে হবে। হাতমোজা ও (চেহারার সাথে মিলিত কোন) মুখাচ্ছাদন ব্যবহার করবে না।

৩। যদি নামাযের সময় হয়, তাহলে মসজিদে গিয়ে জামা'আতের সাথে নামায আদায় করা, অন্যথায় দু'রাক-

আত (ওযুর সুন্নাতের নিয়ত করে) নামায আদায় করা। অতঃপর নিয়ত করা।

হজ্জ তিন প্রকারেরঃ

১। হজ্জে তামাত্তো। এর নিয়ম হলো, মিকাত থেকে শুধু উমরার ইহরাম বাঁধবে। অতঃপর হজ্জের সময় উপস্থিত হলে মক্কা থেকেই হজ্জের ইহরাম বাঁধবে। মিকাতে এই বলে নিয়ত করবে,

((لَبَّيْكَ عُمْرَةً مُتَمَتِّعاً بِهَا إِلَى الحَجِّ))

(লাব্বায়িক উমরাতান মুতামাত্তিয়াম বিহা ইলাল হাজ্জি)। সর্বোত্তম হজ্জ হলো, হজ্জে তামাত্তো। বিশেষতঃ যখন হাজী হজ্জ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই মক্কা পৌছবে। তাই সর্ব প্রথম উমরাহ আদায় করবে। অতঃপর মক্কা থেকেই 'লাব্বায়িক হাজ্জান' বলে হজ্জের ইহরাম বাঁধবে। আর এই হজ্জে হাজীকে হাদী (কোরবানীর পশু) অবশ্যই লাগবে। একটি ছাগল এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে। আর একটি উট ও গরু সাত ব্যক্তির তরফ থেকে যথেষ্ট হবে।

২। হজ্জে কেরান, অর্থাৎ মিকাত থেকে (লাব্বায়কা উমরাতান অ হাজ্জান) বলে হজ্জ ও উমরার ইহরাম এক সাথে বাঁধেবে কোরবানীর দিন পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় অব্যাহত থাকবে। এই হজ্জ সাধারণতঃ এমন লোককে করতে হয়, যে হজ্জের পূর্বে এতটা সময় পায় না যে, সে উমরা আদায় ক'রে হালাল হয়ে আবার হজ্জের ইহরাম বাঁধবে অথবা যে কোরবানীর পশু তাথে করে নিয়ে আসে। এই জাতীয় হজ্জেও হাদী লাগবে।

৩। হজ্জে ইফরাদ, অর্থাৎ, শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধা। মিকাত থেকে (লাব্বায়কা হাজ্জান) বলে শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধবে। এই জাতীয় হজ্জে হাদী লাগবে না।

যদি হজ্জকারী আকাশ পথে আগমনকারী হয়, তাহলে সে মিকাতের নিকটে অথবা তার কিছু পূর্বেই ইহরাম বাঁধতে পারবে, যদি মিকাত নির্ণয় করতে অসুবিধা হয়। আর মিকাতে করণীয় যাবতীয় কাজ জাহাজে উঠার পূর্বেই কিংবা জাহাজে উঠে করবে। যেমন, নখ কাটা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, বগলের চুল পরিষ্কার করা এবং জাহাজে উঠার পূর্বেই বা জাহাজে উঠে ইহরামের কাপড় পরিধান করা। অতঃপর মিকাত আসার পূর্বেই অথবা মিকাতের ঠিক সোজাসোজি পৌঁছে নিয়ত করবে।

নিয়তের পদ্ধতি

১। যদি হজ্জে তামাত্তোর ইচ্ছা করে, তাহলে বলবে,

((لَبَّيْكَ عُمْرَةً مُتَمَتِّعاً بِهَا إِلَى الحَجِّ))

(লাব্বায়কা উমরাতান মুতামাত্তিয়াম বিহা ইলাল হাজ্জি)

২। যদি হজ্জে কেরানের ইচ্ছা করে, তাহলে বলবে,

((لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَ حَجًّا))

(লাব্বায়কা উমরাতান অ হাজ্জান)

৩। আর যদি হজ্জে ইফরাদের ইচ্ছা করে তাহলে বলবে, (লাব্বায়কা হাজ্জান)। নিয়ত করার পর থেকে নিয়ে তাওয়াফ আরম্ভ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সব সময় তালবীয়াহ পড়তে থাকা সুন্নত। আর তালবীয়াহ হলো,

((لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ))

(লাব্বায়কা আল্লা-হুম্মা লাব্বায়িক, লাব্বায়কা লা-শারীকা লাকা লাব্বায়কা, ইন্নাল হামদা অন্নি'মাতা লাকা অল মুলকা লা-শারীকা লাক।) অর্থাৎ, আমি হাজির হে প্রভু! আমি তোমার দরবারে উপস্থিত, তোমার কোন অংশীদার নেই। তোমার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। সর্ব প্রকার প্রশংসা এবং নিয়ামতের সামগ্রী সবই তোমার।

তোমারই রাজত্ব, তোমার কোন শরীক নেই।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধবস্তুসমূহ

ইহরাম অবস্থায় মুহরিমের উপর এমন কিছু জিনিস হারাম হয়ে যায়, যা ইহরাম বাঁধার পূর্বে তার জন্য হালাল ছিল। কারণ, সে একটি মহান ইবাদত সম্পাদন করতে চলেছে। তাই নিম্নে বর্ণিত বস্তুসমূহ তার উপর হারাম।

১। মাথা ও শরীরের কোন অংশের চুল নষ্ট করা। তবে ধীরস্থিরভাবে মাথা চুলকানোতে কোন দোষ নেই।

২। নখ কাটা। তবে আপনা আপনি কারো নখ নষ্ট হয়ে গেলে অথবা অসুবিধার কারণে কাটতে হলে, তাতে কোন দোষ নেই।

৩। সুগন্ধি ও সুবাসযুক্ত সাবান ব্যবহার করা।

৪। স্ত্রী সঙ্গম ও তাতে উদ্বুদ্ধকারী জিনিস। যেমন, বিবাহ করা, নারীদের প্রতি যৌন কামনার সাথে দেখা, মহিলার শরীরের সাথে শরীরের স্পর্শ ও চুম্বন করা ইত্যাদি।

৫। হাত মোজা ব্যবহার করা।

৬। শিকার করা।

উপরোক্ত জিনিসগুলো পুরুষ ও মহিলা উভয়েরই উপরে হারাম। কিছু জিনিস এমন রয়েছে, যা শুধু পুরুষের উপরে হারাম। যেমন,

(ক) সিলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা। তবে প্রয়োজনীয় জিনিস মুহরিম ব্যবহার করতে পারবে। যেমন, বেল্ট, ঘড়ি এবং চশমা ইত্যাদি ব্যবহার করা।

(খ) কোন এমন জিনিস দিয়ে মাথা ঢাকা, যা মাথার সাথে একেবারে লেগে থাকে। তবে মাথার সাথে লেগে থাকে না এমন জিনিস দ্বারা ছায়া গ্রহণ করাতে কোন দোষ নেই। যেমন, ছাতা, গাড়ীর ছায়া ও তাঁবুর ছায়া ইত্যাদি।

(গ) পায়ের মোজা ব্যবহার করা। তবে জুতা না পেলে চামড়ার মোজা ব্যবহার করতে পারবে।

উপরোক্ত নিষিদ্ধ বস্তুসমূহের কোন একটি যদি কারো দ্বারা সংঘটিত হয়ে যায়, তবে তার তিনটি কারণহতে পারে। যেমন,

১। হয় সে জেনে-শুনে বিনা কোন কারণে তা করবে, এমতাবস্থায় সে গুনাহগার বিবেচিত হবে এবং তাকে ফিদয়া দিতে হবে।

২। কিংবা সে কোন প্রয়োজনে তা করবে, এমতাবস্থায় সে গুনাহগার হবে না। তবে তাকে ফিদয়া দিতে হবে।

৩। কিংবা সে মূর্খতার কারণে অথবা ভুলে বা তাকে করতে বাধ্য করা হবে, এমতাবস্থায় না সে গুনাহগার হবে; আর না তাকে ফিদয়া দিতে হবে।

তাওয়াফ

মসজিদে হারামে পৌঁছে সুন্নত অনুযায়ী ডান পা প্রথমে রাখবে এবং এই দুআ পাঠ ক'রে প্রবেশ করবে,

((بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ))

'বিসমিল্লাহি অস্‌সালাতু অস্‌সালামু আলা রাসূলিল্লাহি। আল্লা-হুম্মাগফিরলি যুনুবি অফতাহ লী আবওয়াবা রাহমাতিকা" অর্থাৎ, আমি আল্লাহর নাম নিয়ে প্রবেশ করছি। তাঁর রাসূলের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।

প্রত্যেক মসজিদে প্রবেশ করার সময় উক্ত দুআ পড়তে হয়। অতঃপর তাওয়াফের উদ্দেশ্যে কা'বা অভিমুখে রওনা হবে। আর তাওয়াফ হলো, আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে কা'বা শরীফের সাত চক্কর প্রদক্ষিণ করা। আর তাওয়াফ কা'বাকে বাঁয়ে রেখে হাজরে আসওয়াদ থেকে আরম্ভ হবে এবং সেখানেই শেষ হবে। ওযু অবস্থায় তাওয়াফ করা প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব। তাওয়াফের নিয়ম হলো,

১। 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার'' বলে ডান হাত দিয়ে হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করবে। আর সম্ভব হলে তাকে চুমা দেবে। হাজরে আসওয়াদকে চুমা দেওয়া সম্ভব না হলে, হাত দিয়ে তাকে স্পর্শ করে হাতে চুমা দেবে। তবে স্পর্শ করা ও চুমা দেওয়া কোনটাই সম্ভব না হলে, তাকে সম্মুখ করে 'আল্লাহু আকবার'' বলে হাত দ্বারা তার দিকে ইশারা করবে। তবে হাতে চুমা দেবে না। অতঃপর কা'বাকে বাঁয়ে রেখে তাওয়াফ আরম্ভ করবে এবং সাধ্যানুসারে দুআ ও কুরআন তেলাওয়াত ইচ্ছামত করতে থাকবে। হজ্জকারী আপন ভাষায় নিজের জন্য ও অন্য যারই জন্য চাইবে, দুআ করতে পারবে। তাওয়াফের জন্য কোন নির্দিষ্ট দোয়া নেই।
২। রুকনে ইয়ামানীর নিকটে পৌঁছে সম্ভব হলে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে হাত দিয়ে তাকে স্পর্শ করবে। তবে হাতে চুমা দেবে না। যদি স্পর্শ করা সম্ভব না হয়, তাহলে তার দিকে কোন ইশারা না করে তাওয়াফ অব্যাহত রাখবে এবং সেখানে তাকবীরও পড়বে না। হাজরে রুকনে ইয়ামানীর ও হাজরে আসও-য়াদের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছে এই আয়াতটি পড়বে,

﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [البقرة:٢٠١]

(রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁউ অ ফিল আখিরাতি হাসানাতাঁউ অ ক্বিনা আযাবান্নার) অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই দুনিয়ায়ও কল্যাণ দান করো এবং পরকালেও আমাদেরকে কল্যাণ দিও। আর আগুনের আযাব হতে আমাদেরকে রক্ষা করো।
৩। হাজরে আসওয়াদের নিকটে পৌঁছে সম্ভব হলে হাত দ্বারা তাকে স্পর্শ করবে। কিন্তু সম্ভব না হলে 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত উঠিয়ে তার দিকে ইশারা করবে। এই ভাবে সাতটি তাওয়াফের মধ্যে একটি তাওয়াফ সুসম্পন্ন হবে।
৪। প্রথম তাওয়াফের ন্যায় অন্যান্য তাওয়াফগুলোও সুসম্পন্ন করবে। প্রথম তাওয়াফে কৃত যাবতীয় করণীয় অবশিষ্ট সমস্ত তাওয়াফেও করবে। যখনই হাজরে আসওয়াদের নিকটে আসবে, তখনই তাকবীর পড়বে। সপ্তম তাওয়াফের শেষেও তকবীর পড়বে। প্রথম তাওয়াফের তিনটি চক্করে রামল করবে। অবশিষ্ট চারটি চক্করে হাঁটবে। আর রামল হলো, ছোট ছোট কদমে বা পদক্ষেপে দ্রুত চলা। পুরা সাত চক্করের এই প্রথম তাওয়াফে ইযতিবা করাও সুন্নাত। আর ইযতিবা হলো, পরিহিত চাদরের মধ্যভাগকে ডান কাঁধের নীচে দিয়ে চাদরের উভয় কোণ বাম কাঁধের উপর ধারণ করা। হজ্জ ও উমরাহকারী সর্ব প্রথম যে তাওয়াফ করবে, সেই তাওয়াফেই শুধু রাম্‌ল ও ইযতিবা হবে।

তাওয়াফের পর

তাওয়াফের পর মাকামে ইবরাহীমে দু'রাকআত নামায আদায় করা সুন্নাত। মাকামে ইবরাহীম তার ও কা'বার মধ্যস্থলে থাকবে। নামায আরম্ভ করার পূর্বে চাদর ঠিক ক'রে উভয় কাঁধ ঢেকে নিবে। প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহা সহ 'কুলইয়া আয়্যোহাল কাফিরুন'' পড়বে। আর দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহা সহ 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ'' পড়বে। অত্যধিক ভীড়ের কারণে যদি মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়া সম্ভব না হয়, তাহলে মসজিদের যে কোন স্থানে পড়ে নেবে।

সাঈঃ

এরপর সাফা-মারওয়া অভিমুখে যাত্রা করবে। সাফায় পৌঁছে এই আয়াতটি পড়বে,

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة:١٥٨]

'ইন্নাস্‌সাফা অল মারওয়াতা মিন শাআ'য়িরিল্লাহ ফামান হাজ্জাল বায়তা আ বি'তামারা ফালা জুনাহা আলাহি আঁই ইত্তাওয়াফা বি হিমা অ মান তাত্বাওয়া খায়রান ফা ইন্নাল্লাহা শাকিরুন আলী-ম' অতঃপর সাফা

পাহাড়ে আরোহণ করে কেবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও ইচ্ছামত দুআ করবে। যেমন এই দুআটি পড়বে,

((لاَ إِلَه إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لاَإِلَهَ إِلاَّاللهُ وَحْدَهُ أَنْجزَ وَعْدَهُ وَنَصرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ))

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুলকু, অলাহুল হামদু য়্যুহয়ী অ য়্যুমীতু অহহুয়া আলা কুল্লি শায়্যিন ক্বাদীর। লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহ, আনজাযা ওয়াদাহ, অ নাসারা আবদাহ, অ হাযামাল আহযাবা অহদাহ'' অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্যিকার উপাস্য নেই, তিনি মহান। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি এক ও একক তাঁর কোন অংশীদার নেই। রাজত্ব ও সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু দান করেন। আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাশীল। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই তিনি এক ও একক। তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূরণ করেছেন, তাঁর বান্দার সহযোগিতা করেছেন এবং সৈন্যদেরকে তিনিই পরাজিত করেছেন। উক্ত দুআটি তিনবার পড়বে এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দুআ করবে।

দুআ শেষ করে সাফা পাহাড় থেকে অবতরণ করে মারওয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হবে। যখন সবুজ বাতির নিকটে পৌছবে, তখন সাধ্যানুসারে দ্বিতীয় সবুজ বাতি পর্যন্ত দৌড়াবে। তবে দৌড়তে গিয়ে কারো কষ্ট যেন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। (আর দৌড় শুধু পুরুষদের জন্য, মহিলাদের জন্য নয়।) মারওয়ায় পৌছে কেবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে সাফা পাহাড়ে পঠিত সমস্ত দুআ পাঠ করবে। এইভাবে সাত চক্করের এক চক্কর পূরণ হবে। দুআর পর মারওয়া থেকে অবতরণ ক'রে সাফার দিকে অগ্রসর হবে এবং প্রথম চক্করে কৃত সমস্ত করণীয় অন্যান্য বাকী চক্করেও করবে। সাঈ করাকালীন বেশী বেশী দুআ করা সুন্নাত। সাঈর পর তামাত্তো হজ্জকারী মাথা নেড়া করে উমরাহ সমাপ্তি ক'রে সাধারণ পোষাক পরিধান ক'রে হালাল হয়ে যেতে পারবে। অতঃপর জিল হজ্জ মাসের ৮ তারীখে যোহরের নামাযের পূর্বেই মক্কায় নিজ বাসস্থান থেকেই হজ্জের ইহরাম বাঁধবে এবং উমরার ইহরাম বাঁধার সময় কৃত যাবতীয় করণীয় করবে। অতঃপর **'লাব্বায়কা হাজ্জান লাব্বায়কা লা-শারীকা লাকা লাব্বায়কা, ইন্নাল হামদা অন্নি'মাতা লাকা অল মুলকা লা-শারীকা লাক'**। বলে হজ্জের নিয়ত করবে। অতঃপর যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজরের নামায কসর করে চার রাকআত নামাযগুলো দু'রাকআত করে মিনায় পড়বে।

যুল হজ্জের আট তারীখঃ

এই দিনে হজ্জ আদায়কারী মিনায় গিয়ে যোহর, আসর, মাগরিব এবং ইশা ও ফজরের নামাযগুলো কসর ক'রে চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযগুলো দু'রাকআত ক'রে পড়বে।

৯তারীখ (আরাফার দিন)

আরাফার দিনে করণীয় কাজ হলো।

১। সূর্যোদয়ের পর হাজী আরাফা অভিমুখে রওনা হবে এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবে। সূর্য ঢলে গেলে যোহর ও আসরের নামায এক সাথে কসর করে পড়বে। নামাযের পর যিকির, দুআ ও তালবীয়াহ পড়াতে মনোনিবেশ করবে। নম্র ও মিনতি সহকারে খুব বেশী বেশী দুআ করবে। আল্লাহর নিকট নিজের ও অন্যান্য সকল মুসলিমদের জন্য কল্যাণ কামনা করবে ও স্বীয় চাহিদা অনুযায়ী প্রার্থনা করবে। দুআর সময় হাত উঠানো মুস্তাহাব। আরাফায় অবস্থান হজ্জের রুকুনসমূহের এমন একটি রুকুন যে, যদি কেউ তা ত্যাগ করে, তবে তার হজ্জ শুদ্ধ হবে না। আরাফায় অবস্থানের সময় হলো, ৯ তারীখের সূর্যোদয়ের পর থেকে নিয়ে ১০ তারীখের ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত। যে ব্যক্তি দিন ও রাতের কোন অংশে কিছু সময়ের জন্যেও সেখানে

অবস্থান করবে, তার হজ্জ পরিপূর্ণ বলে গণ্য হবে। তবে হাজীকে এব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে, সে আরাফার সীমানার অভ্যন্তরেই আছে।

২। আরাফার দিন সূর্যাস্তের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে ধীরস্থির ও নম্রতা সহকারে উচ্চৈঃস্বরে তালবীয়াহ পড়তে পড়তে মুজদালেফা অভিমুখে রওনা হবে।

মুজদালেফায় পৌছা মাত্র সর্ব প্রথম মাগরিব ও ঈশার নামায এক সাথে কসর করে পড়বে। নামাযের পর খাবার ইত্যাদির আয়োজন করতে পারবে। তবে শীঘ্র ঘুমিয়ে যাওয়া উত্তম। যাতে ফজরের নামাযের জন্য চাঙ্গা হয়ে উঠতে সক্ষম হয়।

১০ তারীখ (ঈদের দিন)

১। ফজরের সময় হলে নামায আদায় করে সেই স্থানেই বসে খুব ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত অত্যধিক যিকির ও তেলাওয়াতে মনোনিবেশ করবে।

২। সাতটি ছোট কাঁকর বেছে নিয়ে সূর্যোদয়ের আগেই তালবীয়াহ পাঠরত অবস্থায় মীনা অভিমুখে রওনা হবে।

৩। জামড়ায়ে আকাবা (বড় জামড়া) পর্যন্ত পৌছা অবধি তালবীয়াহ অব্যাহত রাখবে। সাতটি কাঁকর একটি একটি করে মারবে। প্রত্যেক কাঁকর মারার সময় 'আল্লাহু আকবার ' ধ্বনি উচ্চারণ করবে।

৪। কাঁকর মারার পর তামাত্তো ও কেরান হজ্জকারী কোরবানী করবে। কোরবানীর গোশত খাওয়া, হাদিয়া করা ও সাদকা করা সবকিছু তার জন্য মুস্তাহাব।

৫। কোরবানীর পর সম্পূর্ণ মাথা নেড়া করবে অথবা খাটো করবে। তবে নেড়া করা উত্তম। মহিলারা প্রত্যেক চুলের গোছা থেকে এক আঙ্গুল (তিন সেন্টি মিটার) পরিমাণ চুল খাটো করবে। এর পর সাধারণ পোশাক পরিধান করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, চুল-নখ কাটা সহ যা কিছু তার উপর নিষিদ্ধ ছিলো সব বৈধ হয়ে যাবে। তবে তাওয়াফ না করা পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন করতে পারবে না। কিন্তু গোসল করা, পরিষ্কার-পরিছন্ন হওয়া, সুগন্ধি ব্যবহার করা ও সাধারণ পোশাক পরিধান করা তার জন্য মুস্তাহাব।

৬। অতঃপর হজ্জের তাওয়াফ (তাওয়াফে ইফাযাহ)-এর উদ্দেশ্যে কা'বা অভিমুখে রওনা হবে। কা'বার সাত চক্কর সমাপ্ত করে দু'রাকআত নামায আদায় করে সাঈর জন্য সাফা-মারওয়ার দিকে রওনা হয়ে সাত বার সাঈ করবে, যদি সে তামাত্তো হজ্জের নিয়ত করে থাকে। কিন্তু যদি কেরান ও হজ্জে ইফরাদের নিয়ত করে এবং 'তাওায়ফে কদুম' (আগমনী তাওয়াফে)এ সাঈ করে থাকে, তাহলে তাকে এই তাওয়াফে (ইফাযার সময়) আর সাঈ করতে হবে না। কারণ, তার প্রথম তাওয়াফই হজ্জের তাওয়াফ। আর যদি প্রথম তাওয়াফের সাথে সাঈ না করে থাকে, তবে তাকে অবশ্যই সাঈ করতে হবে। সাঈর পর স্ত্রী সহ সমস্ত নিষিদ্ধ বস্তু তার জন্য হালাল হয়ে যাবে, যা ইহরাম অবস্থায় তার উপর হারাম ছিলো।

৭। জিল হজ্জ মাসের ১১/ ও ১২ তারীখের রাতে মীনায় অবস্থান করা প্রত্যেক হাজীর উপর অপরিহার্য। (আর যে বিলম্ব করবে সে, ১৩ তারীখের রাতও মীনায় কাটাবে।) মীনাতে রাত্রিবাস বলতে, রাতের বেশীর ভাগ অংশটা সেখানে কাটানো।

উপরোক্ত পালনীয় কাজগুলো পর্যায়ক্রমে করা সুন্নত ও উত্তম। যেমন, প্রথমে কাঁকর মারা। অতঃপর কোর-বানী করা। অতঃপর মাথা নেড়া করা। অতঃপর তাওয়াফ করা। কিন্তু যদি এর মধ্যে কোনটি আগে-পিছে হয়ে যায়, তবে তাতে কোন দোষ নেই।

১১তারীখঃ

এই দিনে প্রত্যেক হাজীকে প্রত্যেক জামড়াকে কাঁকর মারতে হবে। সূর্য মধ্যাহ্ন গগন হতে পশ্চিমে গড়ে যাওয়ার পর থেকেই কাঁকর মারা আরম্ভ হবে। এর পূর্বে বৈধ হবে না। সর্ব প্রথম ছোট জামড়াতে কাঁকর

মারবে। অতঃপর মধ্যমটাকে। অতঃপর বড়টাকে। সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যে কোন সময় কাঁকর মারা যায়। কাঁকর মারার পদ্ধতি হলোঃ

১। সাথে ২১টি কাঁকর নিয়ে ছোট জামাড়ার নিকটে গিয়ে সাতটি কাঁকর মারবে। প্রত্যেক কাঁকর মারার সময় 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ করতে হবে এবং কাঁকর যেন হওযের মধ্যে পতিত হয় এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। আর কাঁকর একটি একটি করে মারতে হবে। কাঁকর মারার পর ডান দিকে একটু সরে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে দুআ করা সুন্নাত।

২। অতঃপর মধ্যম জামড়ার দিকে অগ্রসর হয়ে সেখানেও প্রত্যেক নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ করে পরপর সাতটি কাঁকর নিক্ষেপ করবে। অতঃপর একটু বাঁ দিকে সরে গিয়ে প্রথম বারের ন্যায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত দোয়া করবে।

৩। অতঃপর জামড়ায়ে আকাবার দিকে অগ্রসর হয়ে প্রত্যেক কাঁকর মারার সময় 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ ক'রে পর পর সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। তবে এখানে দাঁড়িয়ে দুআ করবে না।

১২তারীখঃ

১। ১১তারীখে কৃত যাবতীয় করণীয় অনুরূপ ১২ তারীখেও করবে। **যদি হাজী বিলম্ব করতে ও ১৩ তারীখ পর্যন্ত থাকতে চায়, -আরএটাই উত্তম-।তাহলে সে ১১ ও ১২ উভয় দিনে কৃত যাবতীয় কাজ ১৩ তারীখেও করবে।**

২। ১২ তারীখে অথবা ১৩ তারীখে কাঁকর মারার পর প্রত্যেক হাজী কা'বা শরীফের তাওয়াফ (বিদায়ী তাওয়াফ)-এর উদ্দেশ্যে রওনা হবে। কা'বা শরীফের সাত চক্কর তাওয়াফ সম্পাদন করার পর মাক্বামে ইবরাহীমে দু'রাকআত নামায আদায় করবে। (ভীড়ের কারণে) সেখানে নামায আদায় করা সম্ভব না হলে, মসজিদের যে কোন স্থানে তা আদায় করে নেবে। ঋতুবতী এবং নেফাসওয়ালী মহিলাদের উপর বিদায়ী তাওয়াফ নেই। তাদেরকে এতে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

হাজীরা পূর্বে উল্লিখিত তাওয়াফে ইফাযা (হজ্জের তাওয়াফ)কে এই দিন পর্যন্ত কিলম্ব করতেও পারে এবং বিদায়ী তাওয়াফ তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। তাই তাওয়াফে ইফাযাকে এই দিন পর্যন্ত বিলম্ব করা তাদের জন্য জায়েয। তবে বিদায়ী তাওয়াফ করার সময় নিয়ত হবে তাওয়াফে ইফাযার।, বিদায়ী তাওয়াফের নয়।

৩। বিদায়ী তাওয়াফের পর হাজীগণ অন্য কোন কিছুতে ব্যস্ত না হয়ে যিক্‌র, দুআ ও উপকারী উপদেশাদি শ্রবণে সমস্ত সময়টাকে ব্যস্ত রেখে মক্কা ত্যাগ করবে। তবে স্বল্প সময়ের জন্য অবস্থানে কোন দোষ নেই। যেমন সঙ্গী-সাথীর অপেক্ষা করা অথবা সামানাদি বয়ে আনতে বিলম্ব হওয়া ও রাস্তার প্রয়োজনীয় কোন জিনিস ক্রয় করা ইত্যাদি।

হজ্জের রুক্‌নসমূহ

১। ইহরাম বাঁধা।

২। আরাফায় অবস্থান করা।

৩।তাওয়াফে ইফাযা (ঈদের দিনের তাওয়াফ)।করা।

৪। সাফা মারওয়ার সাঈ করা।

উপরোক্ত রুক্‌নসমূহের কোন একটিও যদি কেউ ত্যাগ করে, তবে তার হজ্জ হবে না।

হজ্জের ওয়াজিবসমূহ

১। মিকাত থেকে ইহরাম বাঁধা।

২। সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা। যদি দিনে অবস্থান করে।

৩। ফজর উদিত হয়ে খুব ফর্সা হওয়া পর্যন্ত মুজদালেফায় রাত্রিবাস করা। তবে দুর্বল ব্যক্তিগণ ও মহিলারা

অর্ধেক রাতের পর প্রত্যাবর্তন করতে পারবে।

৪। তাশরীকের রাতগুলোতে মীনায় অবস্থান করা।

৫। তাশরীকের দিনগুলোতে প্রত্যেক জামড়াতে কাঁকর মারা।

৬। মাথা নেড়া করা অথবা চুল খাটো করা।

৭। বিদায়ী তাওয়াফ করা।

যে ব্যক্তি ওয়াজিব সমূহের কোন কিছুকে ত্যাগ করবে, তাকে একটি ছাগল অথবা এক সপ্তমাংশ গাই বা উট জবাই ক'রে হারাম শরীফের ফকীর মিসকীনদের মাঝে বন্টন করে দিতে হবে।

মসজিদে নববীর যিয়ারত

নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে নববীর যিয়ারত করা মুস্তাহাব। কারণ মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্যান্য মসজিদের তুলনায় মসজিদে নববীতে এক ওয়াক্ত নামায এক হাজার নামাযের চেয়েও উত্তম। আর এই মসজিদের যিয়ারত যে কোন সময় করা যায়, এর জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। আর মসজিদে নববীর যিয়ারত হজ্জের কোন অংশও নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মুসলমান এই মসজিদে থাকবে, তার জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীদ্বয়, আবু বাকার ও উমার (রাযীআল্লাহু আনহুমা)-এর কবর যিয়ারত করা মুস্তহাব। কবরের যিয়ারত কেবল পুরুষদের জন্য, মহিলাদের জন্য নয়। নবীর হুজরার কোন কিছুকে স্পর্শ করা অথবা তার তাওয়াফ করা ও দুআ করাকালীন তার দিকে মুখ করা কারো জন্যে বৈধ নয়।

أحكام الأطعمة

খাদ্য সম্পর্কীয় বিধান

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে পাক ও পবিত্র খাদ্য গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। আর নাপাক অপবিত্র খাদ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তাই তিনি বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ (البقرة ١٧٢

অর্থাৎ, "হে ঈমানদারগণ, আমি তোমাদের যে সব রুযী তোমাদের দান করেছি, তার মধ্যে পবিত্র জিনিস ভক্ষণ করো"। (বাক্বারাঃ ১৭২) বস্তুতঃ হারাম বলে ঘোষিত বস্তু ব্যতীত সব খাদ্যই আমাদের জন্য হালাল। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর মু'মিন বান্দাদের জন্য পাক ও পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করে দিয়েছেন, যাতে তারা তার দ্বারা উপকৃত হতে পারে। সুতরাং আল্লাহর নেয়ামত দ্বারা কোন অন্যায় ও শরীয়ত বিরোধী কাজে সাহায্য গ্রহণ করা বৈধ নয়।। খাদ্য ও পানীয় বস্তুর মধ্যে যা হারাম, তার সুস্পষ্ট বর্ণনা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন,

﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَااضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ (الأنعام١١٩

অর্থাৎ, "আল্লাহ তোমাদের উপর যা কিছু হারাম করেছেন, তা তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন, তবে নিরুপায় অবস্থায় তোমরা উক্ত হারাম বস্তুও আহার করতে পারো"। (আনআমঃ ১১৯) সুতরাং যা হারাম বলে ঘোষিত হয়নি, তা হালাল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন,

((إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ، فَلاَ تُضَيِّعُوْهَا، وَحَدَّدَ حُدُوْداً فَلاَ تَعْتَدُوْهَا؛ وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ، فَلاَ تَنْتَهِكُوْهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ؛ فَلاَ تَبْحَثُوْا عَنْهَا)) رواه الطبراني.

অর্থাৎ, "আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের প্রতি কতগুলো বিষয় ফরয করেছেন, তা নষ্ট করো না। কতগুলো সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা লঙ্ঘন করো না। কতকগুলো জিনিস হারাম (অবশ্য পরিত্যাজ্য) করেছেন, সেগুলোর মধ্যে লিপ্ত হয়ে পাপ করো না। আর তোমাদের প্রতি দয়াপূর্বক হয়ে কতগুকলো জিনিস সম্পর্কে ইচ্ছা করেই নীরব রয়েছেন, সে ব্যাপারে খোঁজাখুঁজি করো না" (তাবরানী)

প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্য, পানীয় ও পোশাকাদি, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক হারাম বলে বর্ণিত হয়নি, সেগুলোকে হারাম বলা যাবে না। মূলতঃ প্রত্যেক পবিত্র ও ক্ষতিবিহীন খাদ্য হালাল। তবে অপবিত্র খাদ্য, যেমন মৃত, রক্ত, মাদকদ্রব্য, ধূমপান সামগ্রী এবং এমন জিনিস, যার সাথে অপবিত্র কোন কিছু মিশে গেছে, এসবই হারাম। কেননা, এগুলি ক্ষতিকর। আর মৃত বলতে, শরীয়তী পদ্ধতিতে জবাই করা ব্যতীতই যার প্রাণ নাশ করা হয়েছে তাকে বুঝানো হয়েছে। আর রক্ত বলতে, যবেহ কৃত পশু থেকে নির্গত প্রবহমান রক্ত। তবে যবেহ করার পর মাংসে এবং রগসমূহে অবশিষ্ট রক্ত বৈধ।

যে সমস্ত খাদ্য হালাল, তা দু'প্রকারের। যথা, (১) পশুজাত (২) সমূহ উদ্ভিদ। এ সবের মধ্যে যাতে কোন প্রকারের ক্ষতি নেই, সেগুলো সবই হালাল। আর পশুজাত দু'প্রকারের। এক প্রকার জীব-জানোয়ার যারা স্থলে বসবাস করে। আর এক প্রকার, যারা সমুদ্রে বসবাস করে। যে সমস্ত পশু সমুদ্রে বাস করে, সে সমস্ত পশুই হালাল, তাতে জবাই করার শর্ত আরোপিত হবে না। কারণ, সমুদ্রের মৃত হালাল। আর স্থলে বসবাসকারী পশুর মধ্যে যে কয়েক প্রকার পশুকে ইসলাম হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছে, সেগুলো ব্যতীত সবই হালাল। যেমন,

১। পাল্তুগাধা।

২। হায়না ব্যতীত এমন দাঁত বিশিষ্ট জানোয়ার, যারা দাঁত দিয়েই ছিঁড়ে খায়।
৩। সব রকমের পাখিই হালাল, তবে যে পাখি থাবা দিয়ে আক্রমণ ক'রে শিকার করে, সে পাখি হারাম। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,

((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِيْ مِخْلَبٍ مِّنَ الطُّيُوْرِ)) رواه مسلم ١٩٣٤

অর্থাৎ, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম প্রত্যেক দাঁত বিশিষ্ট হিংস্র পশু এবং থাবা দিয়ে আক্রমণকারী পাখি খেতে নিষেধ করেছেন"।(মুসলিম ১৯৩৪) অনুরূপ যে সব পাখিরা পচা-গলা ও নোংরাজাতীয় জিনিস খায়, সে সব পাখিও হারাম। যেমন, শকুনি, বাজপাখি এবং কাক। নোংরা আবর্জনা আহার করার কারণেই এগুলো হরাম বলে ঘোষিত হয়েছে। ঘৃণিত জীব-জন্তুও হারাম। যেমন, সাপ, ইন্দুর ও যমীনে বিচরণশীল কীট-পতঙ্গ।

উপরোল্লিখিত পশু-পাখি ব্যতীত সবই হালাল। যেমন, ঘোড়া, গৃহপালিত পশু (উট, গরু-মোষ, ছাগল-ভেঁড়া) মুরগী, জংলী গাধা, হরিণ, উট পাখি এবং খরগোশ ইত্যাদি। তবে 'জাল্লালাহ' এসবের ব্যতিক্রম। 'জাল্লালাহ' ঐ পশুকে বলা হয়, যার অধিকাংশ খাদ্যই হচ্ছে নোংরাজাতীয় জিনিস ও অপবিত্র মল। এই ধরনের পশুকে তিন দিন পর্যন্ত বন্ধ রেখে পবিত্র খাদ্য দিতে হবে। তবেই তাকে খাওয়া বৈধ হবে। অন্যথায় তা হারাম হবে। পিয়াজ, রশুন সহ অতি দুর্গন্ধময় জিনিস আহার করা অপছন্দনীয়। বিশেষ করে মসজিদে আসার সময়। যদি কেউ নিরুপায় হয়ে হারাম কৃত বস্তু আহার করতে বাধ্য হয়, অর্থাৎ আহার না করলে প্রাণ নাশের আশঙ্কা থাকে, তাহলে ততটুকু পরিমাণ তা থেকে আহার করা তার জন্য বৈধ, যাতে তার প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়। তবে বিষ কোন অবস্থাতেই গ্রহণ করা যাবে না। যদি কেউ ঘেরাবিহীন বাগানের কোন গাছের ফল গাছের মধ্যে অথবা পড়ে থাকা অবস্থায় পায়, যার কোন রক্ষক নেই,সে ফল আহার করা তার জন্য জায়েয। তবে বয়ে নিয়ে যাওয়া ও গাছে আরোহণ করে, বা কোন কিছু দিয়ে ফল পাড়া তার জন্য বৈধ নয়। অনুরূপ বিনা প্রয়োজনে জমা করা ফলও সে খেতে পারে না।

জবাই করার বিধান

যেহেতু স্থলচর প্রাণী বৈধ হওয়ার শর্তই হলো, শরীয়তী পদ্ধতিতে তা জবাই করা। আর জবাই বলতে স্থলচর বৈধ পশুর কণ্ঠনালী ও খাদ্যনালীকে কর্তন করা বুঝায়। যে জীব-জন্তু জবাই করা সম্ভব, তা বিনা জবাইয়ে হালাল হবে না। কারণ, বিনা জবাইয়ের পশু মৃত বলে গণ্য হয়।

জবাইয়ের শর্তাবলী

১। জবাইকারীর জবাই করার উপযুক্ত হওয়া। অর্থাৎ, তাকে জ্ঞানসম্পন্ন ও আসমানী দ্বীনে বিশ্বাসী হতে হবে। তাতে সে মুসলিম হোক অথবা আহলে কিতাব হোক। সুতরাং কোন পাগল, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি ও ছোট শিশুর জবাই করা পশু হালাল হবে না। কেননা, অজ্ঞতার কারণে তাদের দ্বারায় জবাইয়ের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে অর্জিত হয় না। কোন মূর্তিপূজক, কাফের অথবা অগ্নিপূজক কিংবা কবরপূজক কর্তৃক জবাই করা পশুও বৈধ নয়।

২। অস্ত্রের দ্বারা জবাই করা। সুতরাং এমন সব ধারালো অস্ত্র দিয়ে জবাই করা যায়, যার ধারে রক্ত প্রবাহিত হয়, তা সে লোহা হোক অথবা পাথর হোক কিংবা অন্য কোন কিছু হোক। তবে হাড় ও নখ দিয়ে জবাই করা জায়েয নয়।

৩। কণ্ঠনালী কর্তন করা। অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস যাতায়াত নালী, খাদ্যনালী এবং ঘাড়ের উভয় রগের কোন এক রগ কর্তন করা।

এই স্থানটির মধ্যে জবাইকে সীমাবদ্ধ করা এবং বিশেষভাবে এই জিনিসগুলো কর্তন করতে বলার মধ্যে কৌশল বা হিকমত হলো, যাতে রক্ত প্রবাহিত হয়। কারণ এই স্থানটি অনেকগুলো রগের মূল কেন্দ্র। তাছাড়া এতে তাড়াতাড়ি প্রাণ নাশ হয়, যাতে গোশত হয় সুস্বাদু ও পশুর কষ্ট হয় কম। উপায় না থাকার কারণে যে পশুর উল্লিখিত স্থানে জবাই করতে অক্ষম হবে, যেমন শিকার ইত্যাদি, সে পশুর যে কোন স্থানে আহত বা জখম করাই তার জবাই বলে পরিগণিত হবে। আর যে পশু কোন দুর্ঘটনায় আহত হবে, যেমন গলায় ফাঁস পড়ে যাওয়া, উপর হতে কোন ভারী জিনিসের আঘাত লাগা, কোন সংঘর্ষে আহত হওয়া, কিংবা কোন হিংস্র জন্তুর আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাওয়া ইত্যাদি পশুগুলো জীবিত অবস্থায় পাওয়া গেলে, জবাই করে তা খাওয়া হালাল।

৪। জবাইকারীর জবাই করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা। 'বিসমিল্লাহ'এর সাথে 'আল্লাহু আকবার' বলাও সুন্নাত।

জবাই করার আদব

১। ভোঁতা কোন অস্ত্র দিয়ে জবাই করা অপছন্দনীয়।

২। পশুকে দেখিয়ে অস্ত্রে ধার দেওয়া ঠিক নয়।

৩। কেবলা ব্যতীত পশুর মুখ অন্য দিকে করিয়ে জবাই করাও ঠিক নয়।

৪। মরার পূর্বে পশুর ঘাড়কে মোচড়ানো মাকরুহ (ঘৃণিত) কাজ। গরু ও ছাগলকে বাম দিকে কাত করে ফেলে জবাই করা সুন্নাত। (আর উটের ব্যাপারে সুন্নাত হলো) দাঁড় করিয়ে ডান হাত বেঁধে জবাই করা। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

শিকার করা

প্রয়োজনে শিকার করা জায়েয। তবে খেলাধূলার জন্য শিকার করা একটি অপছন্দনীয় কাজ। শিকার কৃত পশু-পাখির দু'টি অবস্থা হতে পারেঃ-

১। হয় তাকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া যাবে, এমতাবস্থায় তাকে জবাই করা অত্যাবশ্যক।

২। কিংবা তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যাবে, অথবা জীবিত অবস্থায়, কিন্তু সে জীবন খুবই সাময়িক, এমতাবস্থায় সে পশু হালাল।

জবাইকারীর উপর আরোপিত শর্ত শিকারীর উপরেও অর্পিত হবে। যেমন-

১। জ্ঞানসম্পন্ন মুসলিম অথবা কিতাবী হওয়া। সুতরাং কোন পাগল, অথবা নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি অথবা অগ্নিপূজক, কিংবা মূর্তিপূজক দ্বারা শিকার কৃত পশু মুসলমানদের জন্য খাওয়া বৈধ নয়।

২। অস্ত্র এমন ধারালো হতে হবে, যাতে রক্ত প্রবাহিত হয়। আর তা যেন নখ ও হাড়জাতীয় কোন কিছু না হয়। আর শিকার যেন অস্ত্রের ধারে আহত হয়, তার ভারে নয়।তবে শিকারী কুকুর ও পাখি, যাদের দিয়ে শিকার করা হয়, তারা যদি শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে তাদের দ্বারা শিকার কৃত পশু হালাল। আর এদের শিক্ষা হলো, যখন শিকারের জন্য যেতে বলবে, তখনই যাবে। না বললে যাবে না। আর শিকার যখন ধরবে, তখন তার এই ধরা মালিকের জন্য হবে, নিজের জন্য নয়।

৩। অস্ত্র যেন শিকারের উদ্দেশ্যেই চালানো হয়। সুতরাং কোন অস্ত্র যদি হাত থেকে পড়ে কোন শিকার হত্যা করে ফেলে, তাহলে তা খাওয়া হালাল হবে না। কেননা তাতে শিকারের উদ্দেশ্য থাকছে না। অনুরূপ শিকারী কুকুর যদি নিজেই গিয়ে কোন শিকার হত্যা করে ফেলে, তাহলে সেটাও হালাল হবে না। কারণ, তাকে তার মালিক শিকারের উদ্দেশ্যে পাঠাইনি। যদি কেউ শিকারকে নিশানা করে কোন কিছু চালায়, আর তা গিয়ে যদি অন্য কাউকে লাগে অথবা একদল শিকার যদি তাতে মারা যায়, তাহলে সমস্ত শিকারই হালাল হবে।

৪। তীর ও শিকারী কুকুর ইত্যাদি পরিচালনা করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা। 'বিসমিল্লাহ' এর সাথে 'আল্লাহু আকবার' বলাও সুন্নাত।

সাবধান! রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) যে তিনটি ব্যাপারে কুকুর পোষার অনুমতি দিয়েছেন, তা ব্যতীত অন্য কোন কিছুর উদ্দেশ্যে তা পোষা হারাম। আর যে তিনটে কারণে অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তা হলো, শিকারের উদ্দেশ্যে অথবা গবাদিপশু কিংবা চাষ ক্ষেতের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে।

أحكام اللباس
পোশাক-পরিচ্ছদের বিধান

ইসলাম হলো সৌন্দর্য ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার দ্বীন। সুন্দর পরিস্কার পোশাকে সেজেগুজে নিজেকে প্রকাশ করা মুসলিমের জন্য বৈধ এবং এতে উদ্বুদ্ধও করা হয়েছে। পূত-পবিত্র মহান আল্লাহ সৌন্দর্য ও আবরণের জন্য পোশাক সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ (لأعراف:٢٦)

অর্থাৎ, "হে বনী-আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজ-সজ্জার বস্ত্র। আর (বেশভুষার তুলনায়) পরহেযগারীর পোশাক, এটি সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর কুদরতের অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।" (আ'রাফঃ ২৬) পোশাকের ব্যাপারে (ইসলামের) মূল নীতি হলো, সব পোশাকই বৈধ, কেবল সে পোশাক ছাড়া, যার হারাম হওয়ার কথা পরিস্কারভাবে (ইসলামে) বর্ণিত হয়েছে। ইসলাম এমন কোন পোশাককে নির্দিষ্ট করেনি যে, কেবল তা-ই পরিধান করা উচিত। তবে এ ব্যাপারে কিছু নীতিমালা পেশ করেছে। প্রত্যেক মুসলিমের পোশাক এই নীতির আওতাভুক্ত হওয়া জরুরী। আর তা হলো,

১। পোশাকটি লজ্জাস্থান আবৃতকারী যেন হয়, তার প্রকাশকারী যেন না হয়।
২। এমন পোশাক যেন না হয়, যা কাফেরদের অথবা কোন কোন অন্যায় কাজ সম্পাদনকারী বলে পরিচিত ব্যক্তিদের সাদৃশ্য গ্রহণ ক'রে পরা হয়।
৩। তাতে যেন অপচয় না করা হয়।

পোশাকের ব্যাপারে এই নীতিমালার খেয়াল রেখে মানুষ তার প্রয়োজনানুযায়ী এবং তার সমাজে প্রচলিত যে কোন পোশাক পরিধান করতে পারবে। পোশাকের ব্যাপারে যা যা নিষেধ তা হলো,

১। পুরুষদের জন্য রেশমের কাপড় ও সোনা পরা। তবে মহিলারা এ সবকিছু পরতে পারবে। কারণ, আলী ইবনে আবী ত্বালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) রেশমের কাপড় স্বীয় ডান হাতে ও সোনা স্বীয় বাম হাতে ধারণ ক'রে বললেন,

((إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي)) {رواه النسائي٥٠٥٩ وأبوداود ٤٠٥٧ وابن ماجة ٣٥٩٥}

অর্থাৎ, "এই জিনিস দু'টি আমার উম্মতের পুরুষদের উপর হারাম।" (নাসায়ী ৫০৫৯, আবূ দাউদ ৪০৫৭, ইবনে মাজা ৩৫৯৫, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে ইবনে মাজা আলবানীঃ ৩৫৯৫) তবে পুরুষদের রূপার আংটি পরাতে অথবা এমন জিনিস পরাতে কোন দোষ নেই যাতে সামান্য রূপা আছে এবং যেটা পরতে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

২। এমন পোশাক যাতে কোন প্রাণীর ছবি আছে। সুতরাং এমন পোশাক পরা মুসলিমের জন্য জায়েয নয়, যার মধ্যে কোন মানুষ অথবা পশু-পাখীর ছবি আছে। তাতে তা কাপড়ে হোক বা সোনার তৈরী জিনিসে হোক এবং পরা হয় এমন যে কোন জিনিসে হোক না কেন। আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত যে, তিনি একটি বালিশ কিনে ছিলেন যাতে ছবি ছিলো। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তা দেখে দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন, প্রবেশ করলেন না। আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা) বলেন, আমি তাঁর চেহারায় অপছন্দের ভাব বুঝতে পারলাম। তাই বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করছি, আমি কি অন্যায় করেছি? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন, "এই বালিশটা কোত্থেকে এলো? আমি বললাম, এটা

আপনার বসার ও হেলান দেওয়ার জন্য ক্রয় করেছি। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন,

((إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهم أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ)) ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ)) متفق عليه٢١٠٥-٢١٠٧

অর্থাৎ, "অবশ্যই এই চিত্রকারদের কিয়ামতের দিন কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা চিত্রিত করেছো তাতে প্রাণ দাও।" অতঃপর তিনি বললেন, "নিশ্চয় সে বাড়িতে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না, যে বাড়িতে ছবি থাকে।" (বুখারী২ ১০৫-মুসলিম ২ ১০৭)

৩। পুরুষদের গাঁটের নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরাও হারাম। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ)) رواه البخاري ٥٧٨٧

অর্থাৎ, "গাঁটের নীচের সে অংশটুকু জাহান্নামে যাবে, যার নীচে কাপড় ঝুলে।" (বুখারী ৫৭৮৭) লম্বা জামা, পায়জামা, প্যান্ট এবং লুঙ্গি ইত্যাদি সবই (গাঁটের নীচে) ঝুলানো নিষেধ। আর এটা তার সাথে নির্দিষ্ট নয়, যে অহংকার ক'রে ঝুলায়। হ্যাঁ, যে গর্ব ও অহংকার ক'রে ঝুলায় তার শাস্তি হবে অতীব কঠিন। যেমন, ইবনে উমার (রাযীআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) متفق عليه ٣٦٦٥-٢٠٨٥

অর্থাৎ, "যে গর্ব ও অহংকার ক'রে(গাঁটের নীচে) কাপড় ঝুলায়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে রহমতের দৃষ্টিতে দেখবেন না।" (বুখারী ৩৬৬৫-মুসলিম ২০৮৫) তবে মহিলারদের জন্য জরুরী হচ্ছে, তারা ততদূর পর্যন্ত কাপড় ঝুলাবে, যাতে তাদের পা দু'টি ঢাকা যায়।

৪। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য এমন পাতলা-ঝলঝলে কাপড় পরা জায়েয নয়, যা লজ্জাস্থান আবৃত করে না এবং এমন সংকীর্ণ যেন না হয়, যাতে তা (লজ্জাস্থান) প্রকাশ হয়ে পড়ে।

৫। পোশাকে পুরুষদের উপর মহিলাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা এবং মহিলাদের উপর পুরুষদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা হারাম। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

((لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ)) رواه البخاري ٥٨٨٥

অর্থাৎ, "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) অভিসম্পাত করেছেন সেই পুরুষদের, যারা মহিলাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে এবং সেই মহিলাদের, যারা পুরুষদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে।" (বুখারী ৫৮৮৫)

৬। কাফেরদের পোশাকের সাদৃশ্য গ্রহণ করাও হারাম। কাজেই মুসলিমের এমন পোশাক পরা জায়েয নয়, যা কাফেরদের জন্য নির্দিষ্ট। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আ'স (রাযীআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আমার পরিহিত দু'টি গেরুয়া রঙের কাপড় দেখে বললেন,

((إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا)) مسلم ٢٠٧٧

অর্থাৎ, "অবশ্যাই এটা কাফেরদের কাপড়, অতএব তা পরিধান করো না।" (মুসলিম ২০৭৭)

পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে বর্ণিত সুন্নাত ও আদবসমূহ

১। নতুন পোশাক পরার সময় যে সুন্নাতটি মুসলিমকে পালন করতে হয়, তা হলো দুআ পড়া। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) যখন কোন নতুন কাপড় পেতেন, তখন

সেটা জামা অথবা পাগড়ি যা হতো সেই নাম উচ্চারণ ক'রে বলতেন,

((اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ ، أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ ، وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ)) [رواه أبو داود: ٤٠٢٠].

'আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু, আন্তা কাসাউতানী-হ, আসআলোকা মিন খায়রিহি অ খায়রি মা সুনিয়া লাহু, অ আউযু বিকা মিন শার্‌রিহি অ শার্‌রি মা সুনিয়া লাহ্'। অর্থাৎ, হে আল্লাহ তোমারই জন্য সকল প্রশংসা। তুমিই আমাকে এ কাপড় পরিয়েছো। আমি তোমার কাছে এর মধ্যে নিহিত কল্যাণ ও এটা যে জন্য তৈরী করা হয়েছে সেসব কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর আমি এর অনিষ্ট এবং এটি যার জন্য তৈরী করা হচ্ছে তার অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করছি। (আবূ দাউদ ৪০২০, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে আবূ দাউদ আলবানীঃ ৪০২০)

২। ডান দিক থেকে পরতে আরম্ভ করাও সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে। তিনি বলেছেন,

((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ)) متفق عليه: ٤٢٦-٢٦٨

অর্থাৎ, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পবিত্রতা অর্জন, মাথা আঁচড়া এবং জুতা পরা সহ প্রত্যেক কাজে যতদূর সম্ভব ডান দিক থেকে আরম্ভ করাকেই ভালবাসতেন।" (বুখারী ৪২৬-মুসলিম২৬৮) অনুরূপ যখন জুতা পরিধান করবে, তখনও ডান দিক হতে শুরু করবে এবং যখন খুলবে, তখন বাম দিক থেকে খুলবে। কেননা, আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا)) رواه البخاري ٥٨٥٦، مسلم ٢٠٩٧

অর্থাৎ, "তোমাদের কেউ যখন জুতো পরে, তখন সে যেন ডান পা দিয়ে শুরু করে এবং যখন জুতো খুলে, তখন যেন বাঁ পা থেকে আরম্ভ করে। আর জুতো পরলে দু'টোই পরবে, খুলে রাখলে দু'টোই খুলে রাখবে।" (বুখারী ৫৮৫৬, মুসলিম ২০৯৭)

৩। মুসলিমের স্বীয় কাপড় ও শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাও সুন্নাতের আওতাভুক্ত বিষয়। কাজেই সে এ দু'টোর (কাপড় ও শরীরের) পবিত্র রাখার যত্ন নিবে। কেননা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা হলো প্রত্যেক সৌন্দর্যের এবং চমৎকার দৃশ্যের মূল। ইসলাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং শরীর ও কাপড়ের পরিচ্ছন্নতার বিশেষ যত্ন নিতে বলেছে।

৪। সাদা কাপড় পরিধান করা মুস্তাহাব। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ)) رواه أبوداود وغيره ٣٨٧٨

অর্থাৎ, "তোমাদের কাপড়ের মধ্যে সাদা (রঙের) কাপড় পরো। কারণ এটা তোমাদের উত্তম কাপড় এবং এতেই তোমাদের মৃতদেরকে কাফনাও।" (আবূ দাউদ ৩৮৭৮, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে আবূ দাউদ আলবানীঃ ৩৮৭৮)

৫। রকমারি পোশাক ও বৈধ সৌন্দর্য গ্রহণের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ﴾ [الفرقان:٦٧]

অর্থাৎ, "এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী।" (ফুরক্বানঃ ৬৭) আর বুখারী শরীফের হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ)) رواه البخاري

অর্থাৎ, "খাও, পান করো, পরিধান করো এবং সাদক্বা করো অপচয় ও অহংকার ছাড়াই।" (বুখারী)

أحكام النكاح
বিবাহের বিধান

বিবাহের শর্তাবলী

১। **স্বামী-স্ত্রীর সম্মতি।** অতএব কোন প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষকে এমন নারীর সাথে বিবাহ করতে বাধ্য করা যাবে না, যাকে সে চায় না। অনুরূপ কোন প্রাপ্তবয়স্কা, বুদ্ধিসম্পন্না নারীকে এমন কোন পুরুষের সাথে বিবাহ করতে বাধ্য করা যাবে না, যাকে সে চায় না। নারীর সম্মতি ব্যতীত তার বিবাহ দেওয়াকে ইসলাম নিষেধ করেছে। যখন নারী কোন পুরুষের সাথে বিবাহ করতে অসম্মতি প্রকাশ করবে, তখন এ ব্যাপারে কেউ তাকে বাধ্য করতে পারবে না, যদিও সে তার পিতা হয়।

২। **ওয়ালী।** ওয়ালী ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হবে না। কারণ, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "ওয়ালী ব্যতীত বিবাহ নেই।" (তিরমিজী ১০২০, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে তিরমিযী আলবানী ১১০১) সুতরাং যদি কোন নারী ওয়ালী ব্যতীতই বিবাহ করে, তাহলে তার বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। চাই সে নিজে নিজেই বিয়ে করুক, কিংবা অন্য কাউকে অভিভাবক নিযুক্ত করে বিয়ে করুক। আর কোন কাফির কোন মুসলিম নারীর অভিভাবক হতে পারে না। যার ওয়ালী নেই, তার ওয়ালী হবে দেশের বাদশাহ।

আর ওয়ালী হলো, প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিসম্পন্ন নারীর 'আসবা' জাতীয় আত্মীয়-স্বজন। যেমন, পিতা ও পিতা যাকে অসীয়ত করবে। অতঃপর দাদা। এইভাবে পর্যায়ক্রমে উর্ধ্বে যাবে। যে যত নিকটের হবে, তার তত অগ্রাধিকার থাকবে। অতঃপর পুত্র ও পুত্রের পুত্র এইভাবে পর্যায়ক্রমে নিম্নে যাবে। অতঃপর আপন ভাই। তারপর বৈমাত্রেয় ভাই। অতঃপর আপন ভায়ের ও বৈমাত্রেয় ভায়ের পুত্ররা। যে যত নিকটের হবে, তার তত অগ্রাধিকার থাকবে। অতঃপর আপন চাচা। তারপর বৈমাত্রেয় চাচা। অতঃপর চাচাদের পুত্ররা। অতঃপর বাপের চাচা ও তার ছেলেরা। তারপর দাদার চাচা ও তার ছেলেরা। প্রত্যেক ওয়ালীর কর্তব্য হলো, বিবাহের পূর্বে মেয়ের নিকট অনুমতি নেওয়া। আর ওয়ালীর শর্ত আরোপ করার মধ্যে কৌশল হলো, ব্যভিচারের উপকরণাদি বন্ধ করে দেওয়া। কারণ ব্যভিচারী এ ব্যাপারে অক্ষম নয় যে, সে মহিলাকে বলবে, তুমি তোমাকে এতটা মহরের বিনিময়ে আমার সাথে বিবাহ করিয়ে দাও। অতঃপর আপন দু'জন সঙ্গী-সাথী, অথবা অন্য দু'জন কাউকে এই বিয়ের সাক্ষীরূপে রেখে নেবে।

৩। **দু'জন সাক্ষীদাতা।** বিবাহে দুই বা দুয়ের অধিক ন্যায়পরায়ণ (দ্বীনদার) মুসলিমের উপস্থিত থাকা অত্যাবশ্যক। অনুরূপ এই দু'জনকে বিশ্বস্ত এবং চুরি, ব্যভিচার, শারাবপান ইত্যাদি কাবিরাহ গুনাহ থেকে মুক্ত ব্যক্তি হতে হবে। বিবাহ-বন্ধনের শব্দ হলো, স্বামী অথবা তার অভিভাবক বলবে, 'তোমার মেয়েকে অথবা যার সম্পর্কে তোমাকে অসীয়ত করা হয়েছে, তাকে আমার সাথে বিবাহ দিয়ে দাও' অতঃপর ওয়ালী বলবে, 'আমার মেয়েকে অথবা অমুককে আমার তত্ত্বাবধানে তোমার সাথে বিবাহ দিয়ে দিলাম'। অতঃপর স্বামী বলবে, 'আমার সাথে তার বিবাহকে গ্রহণ করলাম' স্বামী তার তরফ থেকে কাউকে উকীল নিযুক্ত করতে চাইলে, তা করতে পারে।

৪। **মহর প্রদান।** আর মোহর কম হওয়াই হলো শরীয়তের বিধান। তাই মোহর যত কম হবে ও সাধ্যানুসারে হবে, ততই উত্তম। মোহরকে সেদাক্বও বলা হয়। বিবাহের সময় মোহরের উল্লেখ করা এবং তখনই তা আদায় করে দেওয়া সুন্নাত। অনুরূপ সম্পূর্ণ মোহর পরে আদায় করা বা কিছু অংশ পরে আদায় করা ইত্যাদিতেও কোন দোষ নাই। যদি স্বামী স্ত্রীকে তার সাথে যৌনবাসনায় লিপ্ত হওয়ার পূর্বে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে স্ত্রী অর্ধেক মহরের অধিকারিণী হবে। কিন্তু যদি যৌনবাসনায় লিপ্ত হওয়ার পূর্বে স্বামী মৃত্যু বরণ করে, তাহলে সম্পূর্ণ মোহর ও মিরাস উভয়েরই সে মালিক হবে।

বিবাহের পর যা আরোপিত হয়

১। **ব্যয়ভার।** সঠিক প্রচলিত পন্থায় স্ত্রীর খাওয়া-পরা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা স্বামীর উপর ওয়াজিব। যদি সে এসব আদায়ে কৃপণতা করে, তাহলে সে গুনাহগার বিবেচিত হবে। আর এমতাবস্থায় স্ত্রী তার মাল থেকে প্রয়োজনানুযায়ী অর্থ নিতে পারবে। অথবা কারো নিকট থেকে ঋণ নেবে, যা স্বামী পরিশোধ করবে। ওলীমাহ করাও ব্যয়ভারের অন্তর্ভুক্ত। আর ওলীমাহ হলো, বিবাহের দিনে স্বামী কর্তৃক আয়োজিত খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা, যাতে লোকদের আমন্ত্রণ করা হয়। এটা একটি এমন নির্দেশিত সুন্নাত, যা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলা-ইহি অসাল্লাম) নিজে করেছেন এবং করতে নির্দেশও দিয়েছেন।

২। **উত্তরাধিকার।** যখনই কোন পুরুষ কোন মহিলাকে সঠিক পন্থায় বিবাহ করবে, তখনই তাদের উভয়ের মধ্যে ওয়ারেসীস্বত্ব স্থাপিত হয়ে যাবে। এর প্রমাণ আল্লাহতা'য়ালার বাণী। তিনি বলেন,

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾

(النساء:١٢)

অর্থাৎ, "আর তোমাদের স্ত্রীগণ যা কিছু রেখে গেছে, তার অর্ধেক তোমরা পাবে, যদি তারা নিঃসন্তান হয়। আর সন্তানশীলা হলে, রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ তোমরা পাবে তখন যখন তাদের কৃত অসীয়ত পূরণ করা হবে এবং যে ঋণ অনাদায় রেখে গেছে, তা আদায় করা হবে। আর তারা তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক চতুর্থাংশের অধিকারিণী হবে, যদি তোমরা নিঃসন্তান হও। আর তোমাদের সন্তান থাকলে তারা পাবে আটভাগের একভাগ। এটাও তখনই কার্যকরী হবে, যখন তোমাদের অসীয়ত পূরণ করা হবে, আর যে ঋণ রেখে গেছ, তা আদায় করা হবে।" (৪ঃ ১২) এ ব্যাপারে স্বামী স্ত্রীর সাথে যৌনবাসনায় লিপ্ত হোক বা না হোক, তাকে নিয়ে নির্জনে থেকে থাকুক বা না থেকে থাকুক, তাতে কোন কিছু এসে যায় না।

বিবাহের সুন্নাত ও আদব

১। বিবাহের ঘোষণা ও প্রচার করা। অনুরূপ স্বামী-স্ত্রীর জন্য দো'য়া করা সুন্নাত। সুতরাং তাদের উভয়ের জন্য এই দোয়াটি করবে,

((بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ))

(বারাকাল্লাহু লাকা অবারাকা আলায়কা, অজামাআ' বায়নাকুমা ফি খায়রিন) অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে বাহ্যিক ও অভ্যান্তরীণ উভয় বরকতে ধন্য করুন এবং তোমাদের উভয়কে মঙ্গলের সাথে প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

২। যৌনবাসনায় লিপ্ত হওয়ার পূর্বে নিম্নের দুআটি পড়া সুন্নাত।

((بِسْمِ اللهِ، اَللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا))

(বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিব নাশ্বায়ত্বানা অজান্নিবিশ্বায়তানা মা রাযাক্ব তানা) অর্থাৎ, আল্লাহর নাম নিয়ে আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচাও এবং আমাদেরকে যে সন্তান দান করবে তাকেও শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচাও।

৩। স্বামী-স্ত্রীর মিলনের গোপন রহস্য প্রকাশ করা উভয়ের জন্য হারাম।

৪। ঋতু ও নিফাস অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হারাম, যতক্ষণ না সে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করে নেয়।

৫। নারীর পায়খানার দ্বার যৌনসঙ্গমের সময় ব্যবহার করা স্বামীর উপর হারাম। কারণ, এটা এমন কাবীরাহ গুনাহ, যা ইসলাম হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছে।
৬। সহবাসে স্ত্রীকে সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত করা স্বামীর উপর ওয়াজিব। অনুরূপ তার অনুমতি ও প্রয়োজন ব্যতীত গর্ভধারণের আশঙ্কায় আযল (যোনি পথের বাহির্দেশে বীর্য পাত করা) করতে পারবে না।

কোন নারীকে বিয়ে করা উচিত?

বিবাহের উদ্দেশ্য হলো, স্বাদ গ্রহণ সহ সুন্দর পরিবার ও সুষ্ঠ সমাজ গঠন। তাই যদি এমন নারীকে অর্জন করা সম্ভব হয় যে নারী বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় সৌন্দর্যে ও গুণে গুণান্বিতা-বাহ্যিক সৌন্দর্য বলতে জন্মগত পরিপূর্ণতাকে বুঝানো হয়েছে, আর অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য বলতে দ্বীন ও চরিত্র উভয়ের পরিপূর্ণতাকে বুঝানো হয়েছে-সে বহু কল্যাণ লাভকারী বিবেচিত হবে এবং আল্লাহর তৌফীকে এটাই হবে পূর্ণতা ও সফলতা। তবে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো দ্বীনদার নারীকে প্রাধান দেওয়া। কারণ, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এ ব্যাপারে ওসীয়ত করেছেন। নারীদেরও কর্তব্য হলো, সৎ ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিকে বিবাহ করতে আগ্রহী হওয়া।

যে সমস্ত নারীদের বিবাহ করা হারাম

যে সমস্ত নারীদের বিবাহ করা হারাম, তারা দুই প্রকার। এক, চিরকালের জন্য যাদের সাথে বিবাহ হারাম। দুই, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যাদের সাথে বিবাহ হারাম। প্রথমতঃ চিরকালের জন্য যাদের সাথে বিবাহ হারাম তারা তিন প্রকারেরঃ
১। বংশীয় সম্পর্কের কারণে যাদের সাথে বিবাহ চলে না। আর এরা সাত প্রকারের নারী, যার উল্লেখ মহান আল্লাহ কুরআনে করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء٢٣]

অর্থাৎ, "তোমাদের উপর হারাম করে দেওয়া হয়েছে, তোমাদের মা, তোমাদের মেয়ে, ভগ্নি, ফুফু, খালা, ভাইঝি, ভাগ্নী এবং তোমাদের সেই সব মা, যারা তোমাদের দুধ পান করিয়েছে। আর তোমাদের দুধ বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মা, তোমাদের স্ত্রীদের মেয়েরা যারা তোমাদের কোলে লালিতা-পালিতা হয়েছে। আর সেই সব স্ত্রীদের মেয়েরা, যাদের সাথে তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু যদি (কেবল বিবাহ হয়ে থাকে আর) স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত না হয়ে থাকে, তাহলে (তাদের পরিবর্তে মেয়েদের সাথে বিবাহ করায়) তোমাদের কোন দোষ হবে না। আর তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীগণ এবং একই সংগে দুই বোনকে বিবাহ করা তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে, কিন্তু পূর্বে যা হয়েছে তাতো হয়ে গেছে। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। (সূরা নিসাঃ ২৩)
(ক) মা বলতে এখানে মা, দাদী-নানী উভয়েই শামিল।
(খ) মেয়ে বলতে আপন মেয়ে, ছেলের মেয়ে ও মেয়ের মেয়ে সকলেই মেয়ের অন্তর্ভুক্ত।
(গ) বোন বলতে আপন বোন, বৈপিত্রেয়ী বোন ও বৈমাত্রেয়ী বোন সকলেই বোনের আওতায় আসে।
(ঘ) ফুফ বলতে আপন ফুফু, বাপের ফুফু, দাদার ফুফু, মায়ের ফুফু ও দাদী-নানীর ফুফু সকলেই ফুফুর অন্তর্ভুক্ত।

(ঙ) খালা বলতে আপন খালা, বাপের খালা, দাদার খালা, মায়ের খালা ও দাদী-নানীর খালা সকলেই খালার আওতায় পড়ে।
(চ) ভায়ের মেয়ে বলতে আপন ভায়ের মেয়ে, বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয় ভায়ের মেয়ে এবং এদের ছেলে ও মেয়েদের মেয়ে এইভাবে যতই নিচে যাওয়া যাবে।
(ছ) বোনের মেয়ে বলতে আপন বোনের মেয়ে, বৈপিত্রেয়ী ও বৈমাত্রেয়ী বোনের মেয়ে এবং এদের ছেলে ও মেয়েদের মেয়ে ও এইভাবে যতই নিচে যাওয়া যাবে।
২। দুধ সম্পর্কের কারণে যে সমস্ত মহিলাদের সাথে বিবাহ করা হারাম। এরা বংশীয় সম্পর্কের কারণে হারাম কৃতা নারীদের মতই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাস বলেছেন,

((يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)) متفق عليه ١٤٤٧-٢٦٤٥

অর্থাৎ, “দুধ পানেও ঐরূপ হারাম হয়ে যায়, যেরূপ বংশীয় সম্পর্কের কারণে হারাম হয়ে যায়”। (বুখারী ১৪৪৭-মুসলিম ২৬৪৫) তবে দুধ পানে হারাম হওয়ার কিছু শর্ত রয়েছে। যেমন,
(ক) কমপক্ষে পাঁচবার অথবা পাঁচাধিকবার দুধ পান করতে হবে। তাই যদি কোন শিশু চারবার দুধ পান করে, তাহলে দুধদানকারিনী মহিলা শিশুর মা বলে গণ্য হবে না।
(খ) এই দুধ পান দুধ ছাড়ার পূর্বেই হতে হবে। অর্থাৎ, পাঁচবার দুধ পান করা, দুধ ছাড়া সময়ের পূর্বেই হতে হবে। সুতরাং যদি দুধ পান দুধ ছাড়া সময়ের পরে হয় কিংবা কিছু আগে ও কিছু পরে হয়, তাহলে এই দুগ্ধদাত্রী মহিলা শিশুর মা বলে গণ্য হবে না।

দুধ পানের শর্তাবলী পরিপূর্ণ হলে, শিশু দুধদানকারিণীর ছেলে বলে পরিগণিত হবে এবং মহিলার ছেলে-মেয়েরা তার ভাই-বোন বলে গণ্য হবে। তাতে তারা এর আগের হোক কিংবা পরের হোক। মহিলার স্বামীর ছেলে-মেয়েরাও তার ভাই-বোন বলে গণ্য হবে। তাতে তারা ঐ মহিলারই হোক, যার সে দুধ পান করেছে, কিংবা অন্য মহিলার হোক। এখানে একটি জিনিস জেনে রাখা অত্যাবশ্যাক যে, দুধ পানকারী শিশুর সন্তানাদি ব্যতীত তার আত্মীয় স্বজনদের সাথে দুধ পানের কোন সম্পর্ক নেই। দুধ পান তাদের উপর কোন প্রভাব সৃষ্টি করবে না।

৩। বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে যে সমস্ত মহিলাদেরকে বিবাহ করা হারাম, তা হলো নিম্নরূপ,
(ক) পিতা ও দাদাদের স্ত্রীগণ, যখনই কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করবে, তখনই সেই মহিলা তার ছেলে, ছেলের ছেলে এবং মেয়ের ছেলের উপর হারাম হয়ে যাবে।তাতে সে তার সাথে সহবাস করুক, বা না করুক।
(খ) **ছেলেদের স্ত্রীগণ,** যখনই কোন ব্যক্তি কোন নারীকে বিবাহ করবে, তখনই সেই নারী তার পিতা ও দাদা-নানাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে। তাতে সে যৌনবাসনায় লিপ্ত হোক, বা না হোক।
(গ) **স্ত্রীর মা ও দাদী-নানী,** যখনই কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করবে, তখনই মহিলার মা ও দাদী-নানী তার উপর হারাম হয়ে যাবে। কেবল বিয়ে হলেই হবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হোক বা না হোক।
(ঘ) **স্ত্রীর মেয়েরা এবং স্ত্রীর ছেলের ও মেয়ের মেয়েরা,** যখনই কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করবে এবং তাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কও স্থাপিত হবে, তখনই মহিলার মেয়েরা ও ছেলের ও মেয়ের মেয়েরা তার উপর হারাম হয়ে যাবে। তাতে এই মেয়েরা আগের স্বামীর হোক কিংবা পরের স্বামীর হোক। তবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পূর্বেই যদি তারা একে অপর থেকে বিছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে স্ত্রীর মেয়েরা স্বামীর জন্য হারাম হবে না।

নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যাদের সাথে বিবাহ করা হারাম, তারাও কয়েক প্রকারের। যেমন,

১। স্ত্রীর বোন, ফুফু ও খালা যতক্ষণ না মৃত্যু অথবা তালাকের কারণে স্ত্রী স্বামীর থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং তার ইদ্দতও শেষ হয়ে যাবে।
২। অন্যের ইদ্দত পালনকারিণী, অর্থাৎ, যখন কোন নারী অন্য স্বামীর ইদ্দত পালন করবে, তখন তার ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে বিবাহ করা বৈধ হবে না। অনুরূপ ইদ্দত পালন করাকালীন তাকে বিয়ের পায়গাম দেওয়াও বৈধ হবে না।
৩। হজ্জ অথবা উমরার নিয়তকারিণী, যতক্ষণ না সে হজ্জ অথবা উমরাহ থেকে সম্পূর্ণভাবে হালাল হবে, ততক্ষণ তার সাথে বিবাহ করা বৈধ হবে না।

তালাক

প্রকৃত পক্ষে তালাক একটি অপছন্দনীয় বস্তু। কিন্তু যেহেতু কখনো কখনো স্বামীর সাথে স্ত্রীর অবস্থান অথবা স্ত্রীর সাথে স্বামীর অবস্থান খুবই পীড়াদায়ক হয়ে যাওয়ার কারণে বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে তালাক দেওয়া অতি প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তাই আল্লাহ রহমত স্বরূপ তা বান্দাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন। কাজেই উল্লিখিত (সমস্যার) কোন কিছু দেখা দিলে, স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারবে। তবে তালাক দেওয়ার সময় তাকে নিম্নে বর্ণিত বিধানের খেয়াল রাখতে হবে।
১। ঋতু অবস্থায় তাকে তালাক দেবে না। যদি ঋতু অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে সে একজন হারাম কাজ সম্পাদনকারী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফারমান বিবেচিত হবে। আর এমতাবস্থায় তালাক প্রত্যাহার করে নেওয়া এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তালাক না দেওয়া তার উপর ওয়াজিব হবে। অতঃপর পবিত্র হয়ে গেলে, সে ইচ্ছা করলে তাকে তালাক দিতে পারবে। তবে উত্তম হলো, দ্বিতীয় হায়েয পর্যন্ত তালাক না দেওয়া। দ্বিতীয় হায়েয থেকে পবিত্র হয়ে গেলে, ইচ্ছা করলে তাকে তালাক দিতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে রাখতেও পারে।
২। এমন তহুরে (পবিত্রাবস্থায়) তালাক দিবে না, যে তহুরে সে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে, যতক্ষণ না তার গর্ভ প্রকাশ হয়ে যায়। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে মাসিকের পর সহবাস করে থাকে, তাহলে পুনরায় মাসিক হয়ে তা থেকে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাকে তালাক দিতে পারবে না, যদিও এ সময় সুদীর্ঘ হয়। অতঃপর ইচ্ছা করলে তাকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিতে পারবে। তবে যদি তার গর্ভ প্রকাশ হয়ে যায় অথবা সে যদি অন্তঃসত্ত্বা থেকে থাকে, তাহলে তালাক দেওয়াতে কোন দোষ নেই।

তালাকের পর যা আরোপিত হয়

যেহেতু তালাকের অর্থই হলো, স্ত্রীর স্বামীর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। তাই এই বিচ্ছেদের উপর কিছু বিধান আরোপিত হয়। যেমন,
১। যদি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে থাকে অথবা স্বামী স্ত্রীর সাথে নির্জনে থেকে থাকে, তাহলে ইদ্দত পালন করা স্ত্রীর উপর ওয়াজিব হবে। তবে যদি স্বামী যৌনবাসনায় লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই তাকে তালাক দিয়ে দেয় এবং তার সাথে নির্জনে না থেকে থাকে, তাহলে তাকে কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না। আর ইদ্দত হলো, তিন ঋতু, যদি ঋতুমতী হয়। আর যদি ঋতুমতী না হয়, তাহলে তিন মাস। আর গর্ভবতী হলে, প্রসবকাল পর্যন্ত। আর এই ইদ্দতের উদ্দেশ্য হলো, স্বামীকে তার স্ত্রী প্রত্যাহার করে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া। অনুরূপ মহিলা গর্ভবতী কি না, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া।
২। স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে যদি এই তালাকের পূর্বে দুইবার তালাক দিয়ে থাকে। অর্থাৎ, স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দেওয়া পর রুজু' করে থাকে অথবা ইদ্দত শেষ হওয়ার পর বিবাহ ক'রে দ্বিতীয় তালাক দিয়ে ইদ্দতের মধ্যেই আবার রুজু' করে থাকে কিংবা ইদ্দতের পর বিবাহ করে থাকে, তারপর আবার তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে যতক্ষণ না স্ত্রী অন্য কারো সাথে সঠিক পন্থায় বিবাহ করবে এবং তাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর

সম্পর্ক স্থাপিত হবে, ততক্ষণ তার জন্য এই স্ত্রী হালাল হবে না। অতঃপর যদি সে (দ্বিতীয় স্বামী) তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে সে প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ হবে। নারীদের প্রতি রহম করে এবং স্বামীদের অত্যাচার থেকে তাদেরকে নিষ্কৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ পাক তিন তালাকদাতার উপর তার স্ত্রীকে হারাম করে দিয়েছেন।

খুলআ'

খুলআ' হলো, মালের বিনিময়ে সেই স্বামীর নিকট থেকে স্ত্রীর তালাক চাওয়া, যাকে সে ঘৃণা করে। তবে স্বামীই যদি স্ত্রীকে ঘৃণা করে তার থেকে তাকে দূর করতে চায়, তাহলে স্ত্রীর নিকট থেকে কোন কিছু নেওয়া তার জন্য বৈধ হবে না। বরং তার কর্তব্য হবে, হয় সে ধৈর্য ধরবে, না হয় তালাক দিবে। আর স্ত্রীর উচিত স্বামীর সাথে তার থাকা একান্তই পীড়াদায়ক ও অসহ্যকর না হলে, খুলআ' না চাওয়া। অনুরূপ ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রীকে খুলআ' চাওয়াতে বাধ্য করার জন্য কষ্ট দেওয়া স্বামীর জন্য বৈধ নয়। আর মোহরের অধিক স্ত্রীর কাছ থেকে নেওয়া অপছন্দনীয়।

বিবাহে একে অপরের অধিকার

কোন কারণবশতঃ বিবাহ বন্ধনকে প্রতিষ্ঠিত রাখার অথবা তা বানচাল করার অধিকার স্বামী-স্ত্রীর রয়েছে। যেমন, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অথবা স্ত্রী স্বামীর মধ্যে এমন রোগ বা জন্মগত দোষ পেলো, যা উভয়কে আক্বদের সময় জ্ঞাত করানো হয়নি। এমতাবস্থায় তাদের উভয়ের এ বিবাহ বন্ধনকে প্রতিষ্ঠিত রাখা ও না রাখার অধিকার রয়েছে। যেমন মনে করুন,

১। তাদের উভয়ের মধ্যে কেউ পাগল অথবা এমন রোগাক্রান্ত, যা অপরকে বিবাহের সম্পূর্ণ অধিকার পূরণে অন্তরায় সৃষ্টি করে, এমতাবস্থায় অপরজনের এ বিবাহকে বানচাল করার অধিকার থাকে। আর যদি এটা সঙ্গমের পূর্বে হয়, তাহলে স্বামী স্ত্রীকে দেওয়া মোহর ফিরত নিবে।

২। যদি সাথে সাথে মোহর দিতে অক্ষম হয়, তাহলে স্ত্রী যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে বিবাহকে বানচাল করতে পারে। কিন্তু সহবাসের পর হলে, তা পারবে না।

৩। ব্যয়ভার বহনে অক্ষম হওয়া। যদি স্বামী ব্যয়ভার বহনে অক্ষম হয়, তাহলে স্ত্রী সাধ্যানুসারে কিছু দিন অপেক্ষা করার পর কাজীর মাধ্যমে এ বিবাহ বানচাল করতে পারবে।

৪। যদি স্বামী অদৃশ্য হয়ে যায়, সে কোথায় আছে তা যদি কাউকে না জানায়, স্ত্রীর খরচের জন্য যদি কিছু রেখে না যায় বা কাউকে এ ব্যাপারে অসিয়ত না করে যায়, কেউ যদি তার ব্যয়ভার গ্রহণ না করে এবং তার নিকট ব্যয় করার মত যদি কিছু না থাকে, তাহলে সে শরীয়তের কাজীর মাধ্যমে এ বিবাহ বানচাল করতে পারবে।

অমুসলিমকে বিবাহ করা

ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান ব্যতীত অন্য কোন অমুসলিম নারীকে বিবাহ করা মুসলমানদের জন্য হারাম। আর ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান সহ কোন অমুসলিমকে বিবাহ করা মুসলিম নারীর জন্য বৈধ নয়। অনুরূপ যদি কোন নারী স্বামীর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তাহলে যতক্ষণ না স্বামী ইসলাম গ্রহণ করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীর জন্য জায়েয হবে না যে, সে নিজেকে স্বামীর জন্য পেশ করবে। নিম্নে অমুসলিমদের সাথে বিবাহ করার কতিপয় বিধান পেশ করা হলো,

১। যদি কাফের স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তাহলে তারা কোন শরীয়তী নিষেধ ব্যতীত তাদের বিবাহে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। শরীয়তী নিষেধ বলতে যেমন, নারী যদি স্বামীর জন্য হারাম হয়, অথবা তাকে বিবাহ করা যদি হালাল না হয়, তাহলে তাদের উভয়কে একে অপর থেকে পৃথক করে দেওয়া হবে।

২। যদি কোন ইয়াহুদী বা খ্রীষ্টান নারীর স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তাহলে তারা তাদের বিবাহে প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

৩। ইয়াহুদী বা খ্রীষ্টান ব্যতীত স্বামী-স্ত্রীর কেউ যদি সঙ্গমের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তাহলে নিকাহ বাতিল গণ্য হবে।
৪। যদি ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান বা অন্য কোন অমুসলিম স্বামীর স্ত্রী সহবাসের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তাহলে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে, কেননা, কোন মুসলিম নারী কাফেরের জন্য বৈধ নয়।
৫। যদি কোন কাফেরের স্ত্রী সঙ্গমের পর ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিষয় স্থগিত থাকবে। অতঃপর ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে এবং স্বামী ইসলাম কবুল না করলে, তা বাতিল গণ্য হবে। এরপর স্ত্রী চাইলে বিবাহ করতেও পারে, আবার স্বামীর জন্য অপেক্ষা করতেও পারে। আর এই সময়ের মধ্যে স্ত্রীর স্বামীর উপর কোন অধিকার থাকবে না। অনুরূপ স্ত্রীর উপর স্বামীরও কোন আধিপত্য থাকবে না। যদি স্বামী ইসলাম কবুল করে নেয়, তাহলে আগের স্ত্রী স্ত্রীই থাকবে নতুনভাবে বিবাহ করার প্রয়োজন হবে না, যদিও অপেক্ষার সময় সুদীর্ঘ হয়ে যায়। ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান ব্যতীত অন্য অমুসলিম নারীর স্বামী ইসলাম কবুল করলে, তার বিধানও অনুরূপ।
৬। যদি যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই স্ত্রী মুর্তাদ (ধর্ম বিমুখ) হয়ে যায়, তাহলে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে এবং সে মোহরও পাবে না। তবে যদি স্বামীই মুর্তাদ হয়ে যায়, তাহলে বিবাহ বানচাল হয়ে যাওয়া সহ অর্ধেক মহরও দিতে হবে। তাদের মধ্যে যে মুর্তাদ হয়েছিল, সে যদি পুনরায় ইসলাম স্বীকার করে নেয়, তাহলে তারা প্রথম বিবাহের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যদি তাদের মধ্যে কোন তালাক সংঘটিত না হয়ে থাকে।

ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান নারীদেরকে বিবাহ করার ক্ষতি

আল্লাহ তা'য়ালার বিবাহ ব্যবস্থাকে বৈধ করার মধ্যে উদ্দেশ্য হলো, চরিত্রের পরিশুদ্ধি করণ, সমাজকে অশ্লীলতা থেকে পবিত্র করণ, লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ এবং সমাজের জন্য একটি সুষ্ঠু ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সংস্থাপন সহ এমন মুসলিম উম্মার গঠন, যার মুখ থেকে উচ্চারিত হবে- لاإله إلا الله محمد رسول الله 'আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকার উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর প্রেরিত রাসূল'। সুতরাং কোন নেক, ধার্মিকা, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্না ও চরিত্রবান মহিলাকে বিবাহ করা ব্যতীত উক্ত উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের মেয়েকে বিয়ে করার কতিপয় কুপ্রভাবের কথা নিম্নে উল্লেখ করা হলো,

১। **পরিবারে তার প্রভাব।** ছোট পরিবারে স্বামী যদি ব্যক্তিগতভাবে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হয়, তাহলে তার প্রভাবে স্ত্রীর প্রভাবিতা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ও বড় আশা থাকে যে, সে ইসলাম কবুলে ধন্য হয়ে যাবে। আবার এর বিপরীতও হতে পারে। কারণ কখনো স্ত্রী অন্য ধর্মকে আকঁড়ে ধরে থাকে এবং ঐ সমস্ত জিনিস সে পালন করে, যে ব্যাপারে সে মনে করে যে, তার ধর্ম এগুলোকে বৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছে। যেমন, শারাব পান ও শূকরের মাংস ভক্ষণ করা এবং গোপনে প্রেম করা ইত্যাদি। আর এইভাবে একটি মুসলিম পরিবার ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়ে। সে পরিবারের ছেলেরা নৈতিক শৈথিল্যের উপর গড়ে উঠে। আবার কখনো সমস্যা আরো জঘন্য পরিস্থিতির শিকার হয়, যখন এই অন্ধভক্তা বা নাফারমান স্ত্রী আপন সন্তানদেরকে সাথে করে গীর্জায় নিয়ে গিয়ে খ্রীষ্টানদের নামায দেখায় এবং তাদের মধ্যে এর বিশ্বাস সৃষ্টি হয়। কথায় বলে, যে ব্যক্তি যে জিনিসের উপর লালিত-পালিত হয়, সে সেই জিনিসের স্বভাবে স্বভাবসিদ্ধ হয়।

২। **সমাজে তার প্রভাব।** মুসলিম সমাজে ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান নারীদের আধিক্য খুবই ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক ব্যাপার। কারণ, এই নারীরা মুসলিম উম্মার চিন্তাধারার উপর বিপজ্জনক আক্রমণ চালাতে ও পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে এবং খ্রীষ্টীয় কার্য-কলাপ ও জঘন্য স্বভাব প্রচারের জন্য দূতের কাজ করে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, নারী-পুরুষের নগ্নতার সাথে অবাধ মিলামিশার অভ্যাস সহ অন্য আরো ইসলামী শিক্ষা বিরোধী প্রচেষ্টা।

أحكام المرأة المسلمة
মুসলিম নারীর বিধান

ইসলামে নারীর মর্যাদা

ইসলামে নারীদের অধিকার সম্পর্কে উপস্থাপনের পূর্বে অন্যান্য জাতির নিকট তাদের মর্যাদা এবং তাদের সাথে কি ধরনের আচরণ করা হতো, সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা অতি আবশ্যাক মনে করছি।

ইউনানদের নিকট মেয়েরা ছিল বেচা-কেনার সামগ্রী। তাদের কোন প্রকার অধিকার ছিল না। সমস্ত অধিকার পুরুষদের জন্যই বরাদ্দ ছিল। মিরাস থেকে তারা ছিল বঞ্চিতা। ধন-সম্পদে তাদেরকে কোন হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া হত না। প্রসিদ্ধ দার্শনিক সুক্বরাতেরের বক্তব্য হলো, 'পৃথিবীর অধঃপতনের বড় ও প্রধান কারণই হলো নারীদের অস্তিত্ব। নারীরা হলো এমন একটি বিষাক্ত বৃক্ষের মত, যার বাহ্যিক অতি সুন্দর কিন্তু চড়ুই পাখি যখনই সেই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করে , সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু বরণ করে'।

রোমকরা নারীদেরকে একটি আত্মাহীন বস্তু বলে গণ্য করতো। নারীদের কোন অধিকার এবং কোন মূল্য তাদের নিকট ছিল না। তাদের কথা হলো, 'নারীদের রুহ বা আত্মা নেই'। তাই তাদেরকে খুঁটির সাথে বেঁধে শরীরে গরম ও ফুটন্ত তেল ঢেলে মর্মান্তিক শাস্তি দেওয়া হতো। কখনো কখনো এই নিষ্পাপ নারীদেরকে দ্রুতগামী ঘোড়ার লেজের সাথে বেঁধে দ্রুতগতিতে ছুটিয়ে তাদের প্রাণ নাশ করা হতো।

হিন্দু ধর্মে নারীর অবস্থা আরো জঘন্য ও নিকৃষ্ট ছিল। তারা নারীকে তার স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিত।(যাকে সতীদাহ প্রথা বলা হয়)

চীনারা বলে, নারীরা এমন যাতনাদায়ক পানি সদৃশ, যা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধিকে ধুয়ে-মুছে বিনাশ করে দেয়। প্রত্যেক চীনার তার স্ত্রীকে বিক্রয় করার এবং জীবদ্দশায় তাকে সমাধিস্থ করার অধিকার ছিল।

ইয়াহুদীরা নারীদের মনে করে এক অভিশপ্ত প্রাণী। কারণ, এই নারীই আদমকে পথভ্রষ্ট করেছে এবং তাঁকে (নিষিদ্ধ) বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করতে বাধ্য করেছে। অনুরূপ তারা নারীকে অপবিত্রা মনে করে। তাই যখন তার মাসিক হয়, তখন সমস্ত ঘর ও তার স্পর্শকৃত সমস্ত বস্তু অপবিত্র হয়ে যায়। অনুরূপ ভায়ের উপস্থিতিতে পিতার সম্পদ থেকে সে মিরাসও পেত না।

খ্রীষ্টানদের নিকট নারী হলো, শয়তান। খ্রীষ্টান ধর্মের একজন পুরোহিতের কথা হলো, মানব জাতির সাথে নারীর কোন সম্পর্ক নেই। সাধু বুনাফান্তুর বলে, 'যখন কোন নারীকে দেখবে, তখন এটা মনে করবে না যে, তোমরা কোন মানব মূর্তি দেখেছ, এমনকি কোন চতুষ্পদ পশুও না, বরং যা দেখেছ, তা নিছক শয়তান। আর তা হতে যা শুন, তা হলো, আজদাহার বাঁশি'। ব্রিটিশ আইনানুসারে বিগত শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত নারীরা দেশের নাগরিক হিসাবে গণ্য হত না। অনুরূপ ব্যক্তিগত কোন অধিকার তাদের ছিলো না। সব রকমের মালিকানা থেকে তারা হত বঞ্চিতা। এমনকি পরিহিত পোশাকটারও তারা মালিক হত না। ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে স্কটল্যান্ড পার্লামেন্টে এ আইন প্রণয়ন হয় যে, নারীদেরকে কোন কিছুর উপর আধিপত্য দেওয়া বৈধ নয়। অনুরূপ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সপ্তম হেনরীর যুগে নারীদের জন্য ইঞ্জীল পাঠ নিষিদ্ধ করে দেয়। কারণ, তারা অপবিত্রা। নারীরা মানুষ কিনা এ ব্যাপারে পর্যবেক্ষণের জন্য ৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে এটাই স্বীকৃতি পায় যে, নারীরা মানুষ, তবে তাদেরকে পুরুষের সেবার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। ব্রিটিশ আইনানুযায়ী ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বামীর জন্য তার স্ত্রীকে বিক্রয় করা বৈধ ছিল। ছয় পেনী (ব্রিটিশ মুদ্রা) পর্যন্ত তার মূল্য নির্দিষ্ট ছিল।

ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে আরবে নারীরা খুবই তুচ্ছ, ত্যাজ্য ও হেয় প্রতিপন্না ছিল। না তারা মিরাস পেত, না কোন অধিকার। এমনকি তাদেরকে কোন কিছু গণ্যই করা হত না। আবার অনেকে তাদের মেয়েদেরকে জীবন্ত সমাধিস্থ করতো। অতঃপর নারীদেরকে নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে মুক্তি দিতে এবং নারী-পুরুষ সকলে

সমান, পুরুষের ন্যায় তাদেরও অধিকার আছে-এর উদাত্ত ঘোষণা দিতে আবির্ভাব হয় ইসলাম। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ الحجرات١٣

অর্থাৎ, "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী হতে সৃষ্টি করেছি। তার পর তোমাদেরকে জাতি ও ভ্রাতৃগোষ্ঠী বানিয়ে দিয়েছি, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। বস্তুতঃ আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানী সে, যে তোমাদের মধ্যে সব চেয়ে আল্লাহভীরু"। (হুজরাতঃ ১৩) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْأُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُوْنَ الجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُوْنَ نَقِيْراً ﴾ النساء١٢٤

অর্থাৎ,"'আর যে নেক কাজ করবে-সে পুরুষ হোক বা মহিলা হোক- সে যদি ঈমানদার হয়, তবে এই ধরনের লোকই বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং তাদের বিন্দু পরিমাণ হক্বও নষ্ট হতে পারবে না"। (নিসাঃ ১২৪) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً ﴾ العنكبوت٨

অর্থাৎ, "আমি মানুষকে নিজের পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি।" (আনকাবুতঃ ৮) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((أَكْمَلُ المؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا)) رواه الترمذي ١١٦٢

অর্থাৎ, "সম্পূর্ণ ঈমানদার তো সে-ই, যার চরিত্র সুন্দর। আর তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীদের জন্য উত্তম"। (তিরমিজী, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে তিরমিযী আলবানীঃ ১১৬২) এক ব্যক্তি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞাসা করে বলল,

((مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحابَتِي؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قال أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أَبُوْكَ))

متفق عليه ٥٩٧١، ٢٥٤٨

অর্থাৎ, "মানুষের মধ্যে আমার উত্তম ব্যবহারের সর্বাধিক অধিকারী কে? উত্তরে তিনি বললেন, তোমার মা। অতঃপর সে বললো, তারপর কে? বললেন, তোমার মা। অতঃপর বললো, তারপর কে? বললেন, তোমার মা। বললো, তার পর কে? বললেন, তোমার বাপ"।(বুখারী৫৯৭১-মুসলিম২৫৪৮) এই হলো নারীদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে ইসলামের ধ্যান-ধারণা।

নারীর সাধারণ অধিকার

নারীর এমন সাধারণ অধিকার রয়েছে, যা তার নিজেরও জানা উচিত এবং সকলের এই মৌলিক অধিকার গুলোর স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। ফলে যখনই চাইবে তা পুরোপুরি উপভোগ করতে পারবে। আর এই অধিকারের সার কথা হলো,

১। মালিক হওয়ার অধিকার। নারী ঘর-বাড়ী, চাষাবাদ, জমি, শিল্পকারখানা, উদ্যান, সোনা-রূপা ও বিভিন্ন প্রকারের গবাদি পশু সহ সব কিছুর মালিক হতে পারবে। চায় সে- স্ত্রী হোক বা মা হোক অথবা কন্যা বা বোন হোক।

২। বিয়ে করা, স্বামী নির্বাচন, খুলআ' কামনা এবং ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার তার রয়েছে। আর এগুলো নারীর প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত অধিকার।

৩। তার উপর ওয়াজিব তথা অত্যাবশ্যক বস্তুর শিক্ষা গ্রহণের অধিকার ও অনস্বীকার্য বিষয়। যেমন, মহান আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন, তাঁর ইবাদত করার পদ্ধতি শিক্ষা, নৈতিক দায়িত্ব ও করণীয় বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা, তার সামগ্রিক জীবনের শিষ্টাচার সম্পর্কে জানা এবং উৎকৃষ্ট চরিত্রের জ্ঞান অর্জন করা প্রভৃতি। কারণ এ ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ সকলের জন্যই। তিনি বলেন,

﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ﴾ محمد١٩

অর্থাৎ, "জেনে রাখো! আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই।" (৪৭ঃ ১৯) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)) ابن ماجة ٢٢٤

অর্থাৎ, "প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরয"। (ইবনে মাজা, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে ইবনে মাজা আলবানী ঃ২২৪)

৪। নিজের ধন-সম্পদ ও অর্থবিত্ত থেকে স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী সাদকা করতে ও স্বামী, সন্তান-সন্ততি এবং পিতা-মাতার জন্য ব্যয় করতে পারবে, যতক্ষণ না সেটা অপচয় ও অপব্যয়ের পর্যায়ে পৌঁছে। এ ব্যাপারে তার অধিকার সম্পূর্ণরূপে পুরুষের অধিকারের মত।

৫। ভালবাসা ও ঘৃণা করার অধিকার। সে সৎ ও নির্মলচরিত্রা নারীগণকে ভালবাসতে পারবে। ফলে স্বামী থাকলে তার অনুমতিক্রমে তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ, তাদেরকে উপহার প্রদান, পত্র বিনিময়, কুশলাদি জিজ্ঞেস, বিপদ ও দুর্যোগের দিনে সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করবে। (এটা নারীর শুধু অধিকার নয়, বরং এটা তার উচ্চ মানসিকতা ও দায়িত্ব সচেতনতার পরিচয়) অধিকন্তু চরিত্রহীনা মহিলাদের ঘৃণা করবে এবং আল্লাহর নিমিত্তে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে।

৬। জীবদ্দশায় নিজ ধন-সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের অসীয়ত করতে পারবে এবং কোন অভিযোগ আপত্তি ছাড়া তার মৃত্যুর পর তা কার্যকর হবে। কেননা, অসীয়ত সাধারণ ব্যক্তিগত অধিকার। এ অধিকার যেমনি পুরুষের রয়েছে তেমনি নারীরও আছে। কারণ আল্লাহর সাওয়াব ও প্রতিদান থেকে কেউ অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। তবে অসীয়ত কৃত অর্থ ও ধন-সম্পদ এক তৃতীয়াংশের বেশী হতে পারবে না। আর এতেও পুরুষ ও নারীর অধিকার সমান।

৭। স্বর্ণ ও রেশম যা চায় পরিধান করতে পারবে। আর এদুটি পুরুষদের জন্য হারাম। কিন্তু পরিধানের অধিকার ও স্বাধীনতার অর্থ কখনো এ নয় যে, পোশাক শূন্য হয়ে যাবে, অথবা অর্ধাংশ, এক চতুর্থাংশ কাপড় পরবে কিংবা মাথা, গলা ও বক্ষোদেশ উন্মুক্ত রাখবে। হ্যাঁ, যদি এমন কোন ব্যক্তি হয় যার সামনে এগুলো করা যেতে পারে তার ব্যাপার ভিন্ন।

৮। রূপচর্চার অধিকার, অর্থাৎ, আপন স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য রূপচর্চা করতে পারবে। সুরমা লাগাতে পারবে। গালে ও ঠোঁটে লাল লিপস্টিক ব্যবহার করতে পারবে, যদি সে ইচ্ছা করে। সর্বোৎকৃষ্ট মনোহারী ও সুন্দর পোশাক এবং হার ও গহনা পরতে পারবে। বাতিল ও সন্দেহ-সংশয়ের স্থান থেকে দূরে থাকার সংকল্পে পোশাক পরিচ্ছদে অমুসলিম নারীদের অথবা বেশ্যা, পতিতা ও দেহ ব্যবসায়ী লম্পট নারীদের ফ্যাশন অবলম্বন করবে না।

৯। পানাহারের অধিকার। যা-ই স্বাদ লাগে ও পছন্দ হয়, তা-ই সে পানাহার করতে পারবে। পানাহারের ব্যাপারে নারী-পুরুষের কোন ভেদাভেদ নেই। যেমনি হালাল বস্তু উভয়ের জন্য হালাল, তেমনি হারাম বস্তু উভয়ের জন্য হারাম। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَتُسْرِفُوْا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ﴾الأعراف٣١

অর্থাৎ, "খাও, পান কর এবং অপচয় কর না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীকে ভালবাসেন না"। (আ'রাফঃ ৩১) এ সম্বোধনে উভয় জাতিই অন্তর্ভুক্ত।

স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার

স্বামীর উপর স্ত্রীর বিশেষ অধিকার রয়েছে। এ সমস্ত অধিকার স্ত্রীর স্বামীর কিছু অধিকার পালন করার জন্য ওয়াজিব হয়। আর তা হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা না হলে, স্বামীর আনুগত্য করা, তার খাবার তৈরী করা, বিছানা পরিপাটি রাখা, তার সন্তানদের দুধ পান করানো, তাদের লালন-পালন করা, তার অর্থ ও মান মর্যাদা রক্ষা করা, নিজের সম্ভ্রম ও সতীত্ব রক্ষা করা, তার জন্য বৈধতার আওতায় রূপচর্চা করা ও নিজেকে সৌন্দর্যময় রাখা। নিম্নোক্ত জিনিসগুলো স্বামীর উপর স্ত্রীর অত্যাবশ্যকীয় অধিকার, যা আল্লাহর বাণী প্রমাণ করে,

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ﴾ البقرة٢٢٨

অর্থাৎ, "নারীদের জন্য সঠিকভাবে সে রূপ অধিকার নির্দিষ্ট রয়েছে, যেমন তাদের উপর পুরুষদের অধিকার রয়েছে।" (বাক্বারাঃ২২৮) আমরা সে অধিকারগুলো তুলে ধরছি, যেন মু'মিন নারী তা জেনে নেয় এবং লজ্জা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও ভয় ভীতি ছাড়াই তা দাবী করে। আর স্বামীর দায়িত্ব হলো, সেগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আদায় করা। হ্যাঁ, স্ত্রী তার অধিকারের কোন কিছু স্বামীকে ক্ষমা করতে চাইলে, তা সে করতে পারে।

১। স্বামী স্বীয় আর্থিক সচ্ছল বা সংকটজনক অবস্থা অনুসারে স্ত্রীর সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে। স্ত্রীর পোশাক, পানাহার, চিকিৎসা ও বাসস্থান এ ব্যয়ভারের আওতায় পরে।

২। স্বামী স্ত্রীর অভিভাবক হেতু তার মান-সম্ভ্রম, দেহ, অর্থ-সম্পদ ও দ্বীন রক্ষা স্বামীর দায়িত্ব। কেননা, কোন কিছুর অভিভাবক হওয়ার মানেই হলো তার দেখা-শুনা, পরিচর্যা ও হেফাজত করা।

৩। দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে, দ্বীনের জরুরী বিষয় শিক্ষা দেওয়া। তবে স্বামী তাতে সক্ষম না হলে, অন্ততপক্ষে মহিলাদের জন্য আয়োজিত ইলমের সমাবেশগুলোতে যোগদান করার অনুমতি দেবে। তা মসজিদ, মাদ্রাসায়, হোক বা অন্য কোথাও। তবে শর্ত এই যে, সেখানে ফেতনা বা স্বামী-স্ত্রীর ক্ষতি সাধিত না হওয়ার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত থাকতে হবে।

৪। স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ভাবে জীবন-যাপন করা তার অন্যতম অধিকার। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ﴾ النساء١٩

অর্থাৎ, "তাদের (স্ত্রীলোকদের) সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর"। (৪ঃ ১৯) স্ত্রীর যৌন কামনা পূরণের অধিকার হরণ না করা, গালি-গালাজ ও মন্দ ব্যবহার না করা। ফিতনার ভয় না থাকলে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সাক্ষাৎ করতে বাধা না দেওয়া, শক্তি ও সামর্থ্যের উর্ধ্বে কাজের চাপ না দেওয়া এবং কথা ও আচরণে সুন্দর ব্যবহার করা সদ্ভাবে জীবন-যাপন করার আওতাভুক্ত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيْ)) ٣٨٩٥

অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে নিজ স্ত্রীর কাছে সর্বোত্তম। আর আমি আমার পরিবারের নিকট তোমাদের চেয়ে উত্তম"। (তিরমিজী হাদীসটি সহীহ।দ্রষ্টব্যঃ সুনানে তিরমিযী আলবানীঃ৩৮৯৫)

পর্দা

পরিবারকে ধ্বংস ও অবনতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ইসলাম সুষ্ঠু ব্যবস্থা দিয়েছে, এবং তাকে চরিত্র ও শিষ্টাচারের শক্ত জালের মাধ্যমে সুরক্ষিত করেছে। যাতে পরিবার ও সমাজ এমন সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়, যেখানে থাকবে

না প্রবৃত্তির উপদ্রব এবং স্বেচ্ছাচারিতার দৌরাত্ম্য। ফিতনা সৃষ্টিকারী সকল উত্তেজনামূলক পথকে অবরোধ করতে নারী-পুরুষকে দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ দেয়। আল্লাহ তা'য়ালা নারীর সম্মানার্থে, তার মান সম্ভ্রমকে লাঞ্ছনা ও অবমাননার হাত থেকে রক্ষার্থে,কুপ্রবৃত্তি ও অসৎলোকের কুদৃষ্টি থেকে তাকে দূরে রাখতে, যাদের নিকট মান-মর্যাদার কোন মূল্য নেই, তাদের কবল থেকে তাকে হেফাজত করতে, বিষাক্ত দৃষ্টির সৃষ্ট ফিতনার দরজা বন্ধ করতে এবং তার সম্ভ্রম ও নৈতিক পবিত্রতাকে সম্মান ও শ্রদ্ধার জালে সুরক্ষিত রাখতে পর্দার বিধান দানকরেন।

আলেমদের ঐকমত্যানুযায়ী হাত ও মুখমন্ডল ব্যতীত সর্বাঙ্গ আবৃত রাখা ওয়াজিব। নারীর কর্তব্য হলো, অপরিচিত পর পুরুষের সামনে সৌন্দর্যের প্রকাশ না করা। আর হাত ও মুখমন্ডলকে আবৃত রাখার ব্যাপারে আলেমরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছেন। প্রত্যেক দলের নিকট তাঁদের মতের সমর্থনে প্রমাণাদিও রয়েছে। আর পর্দা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে দলীলাদির সংখ্যা অনেক। প্রত্যেক দল পর্দা সম্পর্কে বর্ণিত প্রমাণাদির কিছু অংশকে স্বীয় মতের সমর্থনে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং তার পরিপন্থী দলীলসমূহকে বিভিন্ন উক্তির দ্বারা খন্ডন করেছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوْهُنَّ مِن وَّرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ﴾ الأحزاب٥٣

অর্থাৎ, "নবীর স্ত্রীদের নিকট থেকে তোমাদের কিছু চেয়ে নিতে হলে পর্দার বাইরে থেকে চাও। তোমাদের ও তাঁদের অন্তরের পবিত্রতা রক্ষার জন্য এটা উত্তম পন্থা"। (আহযাবঃ ৫৩) তিনি আরো বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِساَءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ، ذَٰلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُوْراً رَّحِيْماً ﴾ الأحزاب٥٩

অর্থাৎ, "হে নবী! তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও ঈমানদার লোকদের মহিলাগণকে বলে দাও, তারা যেন নিজেদের উপর নিজেদের চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়। এটা অধিক উত্তম নিয়ম ও রীতি। যেন তাদেরকে চিনতে পারা যায় ও তাদেরকে উত্যক্ত করা না হয়। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান"। (আহযাবঃ৫৯) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِناَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصاَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ ماَ ظَهَرَ مِنْهاَ، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ... ﴾ النور٣

অর্থাৎ, "আর হে নবী, মু'মিন স্ত্রীলোকদের বল, তারা যেন নিজেদের চোখকে বাঁচিয়ে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে ও নিজেদের সাজ-সজ্জা না দেখায়, কেবল সেইসব জিনিস ছাড়া যা আপনা আপনিই প্রকাশ হয়ে পড়ে। এবং নিজেদের বক্ষদেশের উপর ওড়নার আঁচল ফেলে রাখে। আর নিজেদের সাজ-সজ্জা প্রকাশ করবে না, কিন্তু কেবল এই লোকদের সামনে, তাদের স্বামী, পিতা, স্বামীদের পিতা, নিজেদের পুত্র, স্বামীদের পুত্র, নিজেদের ভাই, ভাইদের পুত্র, বোনদের পুত্র, নিজেদের মেলা-মেশার স্ত্রীলোক, নিজের দাসী, সেইসব অধীনস্থ পুরুষ যাদের অন্য কোন রকম গরয নাই, আর সেইসব বালক যারা স্ত্রীলোকদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে এখনো ওয়াকিফহাল হয় নাই। আর তারা নিজেদের পা যমীনের উপর সজোরে ফেলে চলা-ফেরা করবে না, এইভাবে যে, নিজেদের যে সৌন্দর্য তারা গোপন করে রেখেছে লোকেরা তা জানতে পারে"। (নুরঃ ৩১) হাদীসে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

((كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ)) متفق عليه ٥٧٨، ٦٤٥

অর্থাৎ, "মু'মিনা নারীরা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর সাথে ফজরের নামাযে যোগদান করতেন। অতঃপর নামায শেষে চাদরে নিজেদেরকে আবৃত করে আপন আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করাকালীন অন্ধকারের জন্য তাঁদেরকে কেউ চিনতে পারত না"। (বুখারী ৫৭৮-মুসলিম ৬৪৫) আয়েশা থেকেই বর্ণিত। তিনি বলেন,

((كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّوْنَ بِنَا، وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مُحْرِمَاتٍ فَإِذَا حَاذُوْا بِنَا أَسْدَلَتْ إِحْدَاهُنَّ جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُوْنَا كَشَفْنَا)) أخرجه أبوداود ١٨٣٣ وأحمد ٢٢٨٩٤

অর্থাৎ, "আমরা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর সাথে ইহরাম অবস্থায় থাকাকালীন সাওয়ারীরা যখন আমাদের নিকট হয়ে অতিক্রম করতো, তখন আমাদের কেউ তার চাদর মাথা থেকে মুখমন্ডল পর্যন্ত ঝুলিয়ে নিতো। অতঃপর যখন তারা চলে যেতো, আমরা মুখমন্ডল খুলে নিতাম"। (আবূ দাউদ ১৮৩৩, আহমদ ২২৮৯৪) আয়েশা থেকেই বর্ণিত। তিনি বলেন,

((يَرْحَمُ اللهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلَ لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ....} شَقَقْنَ مُرُوْطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا)) رواه البخاري

অর্থাৎ, "সর্ব প্রথম হিজরতকারীদের স্ত্রীগণের উপর আল্লাহ রহম করুন! যখন আল্লাহর এই বাণী, "এবং নিজেদের বক্ষদেশের উপর ওড়নার আঁচল ফেলে রাখে" অবতীর্ণ হয়, তখন নিজেদের চাদরকে দু'ভাগ করে একাংশকে ওড়না বানিয়ে ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন"। (বুখারী)

পর্দার ব্যাপারে বর্ণিত প্রমাণাদির সংখ্যা অনেক। এ ব্যাপারে মতভেদের উল্লেখ না করেও বলা যায় যে, প্রয়োজন বোধে নারী তার মুখমন্ডল খুলতে পারে এ ব্যাপারে সকলের একমত। যেমন ডাক্তারের সামনে চিকিৎসার জন্য খোলা ইত্যাদি। অনুরূপ সকলে মনে করেন যে, ফিতনার আশঙ্কা থাকলে মুখমন্ডল খুলে রাখা বৈধ হবে না। যাঁরা মুখমন্ডলকে খুলে রাখা বৈধ বলে মনে করেন তারাও ফিতনার আশঙ্কাকালীন তা আবৃত রাখা ওয়াজিব বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আর বর্তমানে যখন ফিতনা-ফ্যাসাদ ব্যাপক রূপ ধারণ করেছে, অসৎ ও ফাসেক প্রকৃতির মানুষ এত আধিক্য লাভ করেছে যে, শহর-বাজার ও সর্বত্র তা ছেয়ে গেছে এবং সৎ ও আল্লাহভীরু লোকের হার কমে গেছে, এর থেকে ফিতনার আশঙ্কা আর কি হতে পারে? অনুরূপ যে নারীরা তাদের মুখমন্ডল খুলে রাখে, তারা (সেজেগুজে) নিজেদের চেহারা ও চক্ষুকে শোভান্বিত করে যেটা সকলের ঐক্যমতে হারাম।

চরিত্র, পরিবার ও মান-সম্মানকে সুরক্ষিত রাখার জন্যই পরপুরুষের সাথে অবাধ মেলা-মেশা নারীর উপর ইসলাম হারাম করে দিয়েছে। ইসলাম মানুষের হেফাযত ও ফেতনা-ফ্যাসাদের সমস্ত পথকে বন্ধ করতে খুবই তৎপর। আর নারীর পর্দাহীনভাবে চলা-ফেরায়, অপরিচিত লোকদের সাথে বাধাহীনভাবে মেলা-মেশায় প্রবৃত্তির তাড়ণা জেগে উঠে, অন্যায়ের পথ সুগম হয়ে যায় এবং অন্যায় অনৌচিত্য কর্ম-কান্ড অনায়াসে সংঘটিত হয়ে যায়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ الأحزاب٣٣

অর্থাৎ, "নিজেদের ঘরে অবস্থান কর এবং পূর্বতন জাহেলী যুগের সাজগোজ দেখিয়ে বেড়াইও না"। (আহযাবঃ ৩৩) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ﴾ الأحزاب٣٣

অর্থাৎ, "নবীর স্ত্রীদের নিকট থেকে তোমাদের কিছু চেয়ে নিতে হলে পর্দার বাইরে থেকে চেয়ে পাঠাও। এটা তোমাদের ও তাদের অন্তরের পবিত্রতা রক্ষার জন্য উত্তম পন্থা"। (আহযাব ঃ ৫৩)

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) নারী-পুরুষের অবৈধ মেলা-মেশাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এমনকি এ পথে উদ্বুদ্ধকারী সকল উপায় উপকরণকেও অবরোধ করে দিয়েছেন, যদিও তা ইবাদতের ক্ষেত্রে ও ইবাদতের স্থানেও হয়। কখনো কখনো নারী নিজ বাড়ী থেকে ঐ স্থানে যেতে বাধ্য হয়, যেখানে পুরুষের সমাগম। যেমন, তার নিকট তার প্রয়োজন পূরণ করে দেওয়ার মত কেউ না থাকাকালীন প্রয়োজনাদি পূরণের জন্য যাওয়া অথবা তার নিজের জন্য বা তার অধীনস্থদের জন্য জীবিকার কেনা-বেচা সহ অন্যান্য প্রয়োজনাদির জন্য যাওয়া, এমতাবস্থায় তার বাড়ী থেকে বের হওয়াতে কোন দোষ নেই। তবে শরীয়তের বিধি-বিধানকে খেয়াল রেখে চলা-ফেরা করতে হবে। যেমন, ইসলামী বেশভূষায়, সর্বাঙ্গ ঢেকে, সৌন্দর্যের প্রকাশ না ক'রে বের হওয়া এবং পুরুষদের থেকে সব সময় পৃথক থাকা, তাদের সাথে মিশে না যাওয়া। পরিবার ও সমাজকে (অন্যায় ও অনাচার থেকে) রক্ষার জন্য ইসলাম যে সমস্ত বিধান প্রণয়ন করেছে, তন্মধ্যে বেগানা কোন ব্যক্তির সাথে নারীর নির্জনে অবস্থান করাকে হারাম বলে ঘোষণা দেওয়া হলো অন্যতম বিধান। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বেগানা কোন ব্যক্তির সাথে নারীর নির্জনে থাকাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন যদি তার সাথে তার স্বামী বা মাহরাম (যাদের সাথে তার বিয়ে হারাম) না থাকে। কেননা, শয়তান মানুষের আত্মা ও চরিত্রকে কলঙ্কিত করার কাজে দারুণভাবে তৎপর।

মাসিক ও নিফাস (প্রসবোত্তর রক্তপাত)-এর বিধান

মাসিকের সময় সীমা

১। অধিকাংশ যে বয়সে মাসিক আসতে দেখা যায় তা হলো, ১২ থেকে ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত। তবে নারীর মাসিক এর আগে অথবা পরেও আসতে পারে তা নির্ভর করে তার অবস্থা ও আবহাওয়ার উপরে।

২। মাসিকের সময়সীমা কম-সে-কম এক দিন এবং সর্বাধিক ১৫দিন।

গর্ভবতীর মাসিক। অধিকাংশ নারীরা যখন গর্ভবতী হয়, তখন তাদের ঋতু বন্ধ হয়ে যায়। তবে যদি গর্ভবতী রক্ত দেখে, আর তা যদি প্রসবের দু'দিন অথবা তিন দিন আগে হয়, আর তার সাথে প্রসব বেদনাও যদি অনুভব করে, তাহলে সেটা নিফাসের খুন বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি প্রসবের অনেক দিন অথবা অল্প দিন আগে হয়, আর বেদনা যদি না থাকে, তাহলে সেটা না নিফাসের খুন হবে আর না হায়েযের। তবে যদি অনবরত হায়েযের রক্ত আসতে থাকে গর্ভবতী হওয়ার পরও যদি তা বন্ধ না হয়, তাহলে সেটা মাসিক বলেই গণ্য হবে।

মাসিকের ব্যতিক্রম। মাসিকের ব্যতিক্রম কয়েক প্রকারের হয়। যেমন,

১। কম-বেশী হওয়া। অর্থাৎ, নারীর নির্ধারিত অভ্যাস হলো ছয় দিন কিন্তু মাসিক সাত দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকছে, অথবা তার নিয়ম সাত দিন অথচ সে ছয় দিনেই পবিত্রা হয়ে গেছে।

২। আগে-পরে হওয়া। অর্থাৎ, নারীর নিয়ম হলো মাসের শেষে হায়েয আসা কিন্তু মাসের শুরুতেই হায়েয আসতে দেখলো অথবা তার নিয়ম মাসের প্রথম দিকেই হায়েয আসা কিন্তু হায়েয মাসের শেষে আরম্ভ হল। সে যখনই রক্ত দেখবে, তখনই সে হায়েযগ্রস্ত বলে পরিগণিতা হবে। আর যখনই তা থেকে পবিত্রতা অর্জন করবে, তখনই পবিত্রা বলে গণ্য হবে, তাতে তার নিয়মের বেশী হোক, কিংবা কম হোক, আগে হোক কিংবা পরে হোক।

৩। মাসিকের তৃতীয় ব্যতিক্রম হলো, রক্তের রঙ হলুদবর্ণ বা ঘোলাটে হওয়া। অর্থাৎ, রক্তের রঙ দেখল আহত স্থান থেকে নির্গত পানির ন্যায় হলুদবর্ণ, অথবা হলদে ও কালো মিশ্রিত ঘোলাটে, যদি এটা হায়েয চলাকালীন

দিনে অথবা হায়েযের পরে পরেই পবিত্র হওয়ার পূর্বেই দেখে, তাহলে তা হায়েয বলে গণ্য হবে এবং হায়েযের বিধান এতে কার্যকরী হবে। কিন্তু যদি পবিত্রতা অর্জনের পর দেখে, তাহলে তা হায়েয বলে গণ্য হবে না।

৪। কেটে কেটে খুন আসা। যেমন, একদিন রক্ত দেখে আর একদিন পরিষ্কার ইত্যাদি। এর দু'টি অবস্থা যথা,

(ক) যদি এটা মহিলার সাথে সব সময় ঘটে থাকে, তাহলে ইস্তিহাযার খুন বলে পরিগণিত হবে এবং ইস্তিহাযার বিধান এতে বাস্তবায়িত হবে।

(খ) এটা সব সময় মহিলার সাথে ঘটে না বরং কখনো কখনো হয় এবং এর পর সে সঠিক পবিত্রাবস্থা পায়। তবে একদিনের কমে যদি খুন বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে পবিত্রা বলে গণ্য হবে না। হ্যাঁ, এমন কোন জিনিস যদি দেখে যা পবিত্রতাকে প্রমাণ করে, তাহলে ভিন্ন কথা। যেমন, যদি তার নিয়মের ঠিক শেষের দিকে খুন বন্ধ হয় অথবা সে যদি 'কাসসাতুল বায়যা' দেখে। আর 'কাসসাতুল বায়যা' হলো, সাদা স্রাব যা হায়েয বন্ধ হওয়ার পর রেহেম থেকে নির্গত হয়।

৫। শুকনো ধরনের রক্ত আসা। অর্থাৎ ঠিক রক্ত নয়, রক্তের দাগ বা চিহ্ন দেখে। এটা যদি হায়েয আসার দিনে, অথবা হায়েয বন্ধ হওয়ার পরে পরেই পবিত্র হওয়ার পূর্বেই দেখে, তাহলে হায়েয বলে গণ্য হবে। আর যদি পবিত্র হওয়ার পর দেখে, তাহলে তা হায়েয হবে না।

মাসিকের বিধান

প্রথমতঃ নামায। ঋতুমতী মহিলার উপর ফরয ও নফল প্রত্যেক নামাযই হারাম। কোন নামাযই পড়া ঠিক হবে না। অনুরূপ নামাযগুলোর কাযাও তার উপর ওয়াজিব হবে না। তবে যদি হায়েয আরম্ভ হওয়ার পূর্বে অথবা শেষ হওয়ার পর এতটা সময় পায়, যাতে পূর্ণ এক রাকআত নামায আদায় করা সম্ভব, তাহলে সেটা তার উপর ওয়াজিব হবে। যেমন একটি মহিলার সূর্যাস্তের এতটা সময় পর হায়েয আরম্ভ হলো যে, এক রাকআত নামায পড়া যেত, এমতাবস্থায় পবিত্রতা হাসেলের পর তাকে মাগরিবের নামায কাযা করতে হবে। কারণ, সে হায়েযগ্রস্ত হওয়ার পূর্বে এক রাকআত নামায পড়ার মত সময় পেয়ে ছিল। অনুরূপ একটি মহিলার সূর্যোদয়ের এতটা সময় পূর্বে হায়েয থেকে পবিত্রা হলো যে, এক রাকআত নামায পড়ার জন্য তা যথেষ্ট ছিল, এমতাবস্থায় পবিত্রতা অর্জনের পর ফজরের নামায তাকে কাযা করতে হবে। কারণ, হায়েযের পূর্বে এতটা সময় তার হাতে ছিল, যা এক রাকআত নামায পড়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। হ্যাঁ, যিক্র, তাকবীর, 'সুবহা নাল্লাহ' 'আলহামদুলিল্লাহ' পাঠ করা, খাবার ইত্যাদির সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা, ফিক্বাহ ও হাদীস পাঠ করা, দুআ করা ও দোয়ার উপর আমিন বলা এবং কুরআন শোনা ইত্যাদি কোন কিছুই হায়েযগ্রস্ত মহিলার উপর হারাম নয়। স্বয়ং তার কুরআন পড়ার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, যদি চোখে দেখে, অথবা মনে মনে পড়ে মুখে উচ্চারণ না করে পড়ে, তাহলে কোন দোষ নেই। যেমন কুরআন অথবা রেহেল সামনে রেখে তার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে মনে মনে পড়া। তবে এ অবস্থায় তার কুরআন পাঠ না করাই উত্তম। হ্যাঁ একান্ত প্রয়োজনে পাঠ করতে পারবে। যেমন, সে শিক্ষিকা, ছাত্রীদের পড়াতে হয় অথবা পরীক্ষার সময় পরীক্ষার জন্য পড়ার প্রয়োজন বোধ করে ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ রোযা। ঋতুমতী নারীর উপর ফরয ও নফল সব রোযাই হারাম। কোন রোযা রাখা তার পক্ষে ঠিক নয়। তবে ফরয রোযার কাযা তার উপর ওয়াজিব। রোযা রাখা অবস্থায় যদি তার হায়েয আরম্ভ হয়ে যায়, তাহলে তার রোযা বাতিল গণ্য হবে যদিও তা সূর্যাস্তের সামান্য পূর্বে হয়। এদিনের রোযার কাযা করা তার উপর ওয়াজিব, যদি সেটা ফরয রোযা হয়। হ্যাঁ, যদি সে সূর্যাস্তের পূর্বে হায়েয অনুভব করে কিন্তু তা নির্গত হয় সূর্যাস্তের পর, তাহলে তার রোযা সঠিক বলে গণ্য হবে। যদি হায়েয অবস্থায় ফজর হয়ে যায়, তাহলে এ দিনের রোযা শুদ্ধ হবে না, যদিও সে ফজরের সামান্য পরই পবিত্রতা অর্জন করে থাকে। আর যদি ফজরের পূর্বেই পবিত্র হয়ে যায়, তাহলে তার রোযা সঠিক বলে গণ্য হবে, যদিও সে ফজরের পরে গোসল করে থাকে।

তৃতীয়তঃ কা'বা শরীফের তাওয়াফ করা। ফরয ও নফল সব রকমের তাওয়াফই তার উপর হারাম। কোন তাওয়াফ করা ঠিক হবে না। তাওয়াফ ব্যতীত অন্যান্য কাজ যেমন, সাফা-মারওয়ার সাঈ করা, আরফায় অবস্থান, মুজদালেফা ও মিনায় রাত্রিবাস এবং জামড়াসমূহে কাঁকর মারা ইত্যাদি সহ হজ্জ ও উমরাহর যাবতীয় কাজ সে করতে পারবে। কোন কিছুই তার উপর হারাম নয়। সুতরাং কোন মহিলা যদি পবিত্রাবস্থায় তাওয়াফ আরম্ভ করে, অতঃপর যদি তাওয়াফের পরে পরেই কিংবা সাঈী করার সময় হায়েযের খুন নির্গত হয়, তাহলে এতে কোন দোষ নেই।

চতুর্থতঃ মসজিদে অবস্থান করা তার উপর হারাম।

পঞ্চমতঃ সঙ্গম করা। তার সাথে যৌনবাসনা চরিতার্থ করা তার স্বামীর উপর হারাম এবং স্বামীকে এ সুযোগ দেওয়া তার উপর হারাম। তবে আল্লারই প্রশংসা যে, সঙ্গম ব্যতীত চুমা ও লজ্জাস্থান ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গের সংস্পর্শের মাধ্যমে যৌনক্ষুধা নিবারণের অনুমতি রয়েছে।

ষষ্ঠতঃ তালাক। হায়েয অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া স্বামীর উপর হরাম। যদি সে হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়, তাহলে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যকারী এবং হারাম কাজ সম্পাদনকারী বিবেচিত হবে। এমতাব-স্থায় তালাক প্রত্যাহার করা ও পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাকে নিজের কাছে রাখা তার উপর ওয়াজিব। অতঃপর পবিত্র হয়ে গেলে ইচ্ছা করলে তাকে তালাক দিতে পারবে। তবে উত্তম হলো দ্বিতীয় হায়েয পর্যন্ত তাকে ছেড়ে দেওয়া। দ্বিতীয় হায়েয থেকে পবিত্র হয়ে গেলে ইচ্ছা হলে রাখতেও পারে, আবার তালাক দিতেও পারে।

সপ্তমতঃ গোসল ওয়াজিব হওয়া। হায়েয সমাপ্তির পর সর্বাঙ্গ শরীরকে ধুয়ে পবিত্রতা অর্জন করা তার উপর ওয়াজিব। মাথার বেণী খুলা অপরিহার্য নয়, কিন্তু যদি এমন শক্ত করে বাঁধা থাকে, যাতে আশংকা বোধ করে যে চুলের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছবে না, তাহলে তা খুলতে হবে। যদি নামাযের সময়ের মধ্যে পবিত্র হয়ে যায়, তাহলে তড়িঘড়ি গোসল করা অপরিহার্য হবে যাতে সময়ে নামাযটা আদায় করতে সক্ষম হয়। যদি সে সফরে থাকে আর কাছে পানি না থাকে, অথবা পানি আছে কিন্তু তার ব্যবহারে ক্ষতির আশঙ্কা বোধ করে, অথবা সে রোগাক্রান্ত, পানি তাকে ক্ষতি করবে বলে ধারণা হয়, তাহলে সে গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করবে। অতঃপর আশঙ্কা দূরীভূত হয়ে গেলে গোসল করে নেবে।

ইস্তিহাযাহ ও তার বিধান

ইস্তিহাযা হলো, হায়েযের পরও রক্ত প্রবাহ অব্যাহত থাকা, বন্ধ না হওয়া, অথবা সাময়িকের জন্য বন্ধ হওয়া। যেমন মাসে মাত্র এক দু'দিনের জন্য বন্ধ হওয়া। কেউ কেউ বলে ১৫দিনের বেশী খুন আসাকে ইস্তিহাযা বলে যদি সেটা তার নিয়ম না হয়। ইস্তিহাযার তিনটি অবস্থা। যেমন,

১। ইস্তিহাযার পূর্বে তার হায়েযের একটি নির্দিষ্ট সময় ছিল, এমতাবস্থায় সে তার সাবেক নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী কাজ করে সেই দিনগুলিই হায়েযের দিন গণ্য করবে ও হায়েযের বিধান এতেই কার্যকরী হবে,বাকী অন্য দিনগুলো ইস্তিহাযা বলে বিবেচিত হবে এবং ইস্তিহাযার বিধান তাতে পালনীয় হবে। এর উদাহরণ হলো, একটি মহিলার প্রত্যেক মাসের শুরুতেই ছয় দিন খুন আসত, অতঃপর সে ইস্তিহাযায় পতিত হওয়ায় রক্ত প্রবাহ অব্যাহত থাকতে লাগল, এমতাবস্থায় মাসের প্রথম ছয় দিনই তার হায়েয বলে গণ্য হবে আর বাকীগুলো ইস্তিহাযা। তাই সে নির্দিষ্ট দিনগুলিই হায়েয গণ্য করবে। তার পর গোসল করবে ও নামায পড়বে। ছয় দিনের অতিরিক্ত খুনের কোন পারোয়া করবে না।

২। ইস্তিহাযার পূর্বে তার হায়েযের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। অর্থাৎ, যখন থেকে সে খুন দেখেছে, তখন থেকেই তার এই অবস্থা, এমতাবস্থায় যে কটা দিন রক্তের রঙ কালো অথবা গাঢ় হবে, অথবা এমন গন্ধ, যা হায়েযই প্রমাণ করে, সেই দিন কটিই হায়েয বলে গণ্য হবে। বাকী দিনগুলো ইস্তিহাযা পরিগণিত হবে এবং তাতে ইস্তিহাযার বিধান আরোপিত হবে। এর উদাহরণ হলো, একটি মহিলা প্রথম যে দিন থেকে খুন দেখে সেই

দিন থেকেই খুন বন্ধ হয় না। কিন্তু কিছু পার্থক্য সে দেখেছে, যেমন, দশদিন রক্তের রঙ দেখেছে কালো, বাকী দিনগুলো লাল, অথবা দশদিন রক্তের রঙ দেখেছে গাঢ়, বাকী দিনগুলো পাতলা, অথবা দশদিন রক্তের গন্ধ হায়েযের মত ছিল, বাকী দিনগুলিতে কোন গন্ধ ছিল না, তাই যে দিনগুলোতে রক্তের রঙ কালো ও গাঢ় ছিল এবং হায়েযের গন্ধ ছিল, সেই দিনগুলোই হায়েয বলে গণ্য হবে, বাকী ইস্তিহাযা।

৩। তার হায়েযের কোন নির্দিষ্ট সময় ও সঠিক পার্থক্য নেই। যেমন, প্রথম যখন থেকে সে রক্ত দেখেছে, তখন থেকেই তার ইস্তিহাযার খুন অব্যাহত আছে। আর রক্তের রঙ এক রকম, অথবা এমন বিভিন্ন ধরনের জটিল রক্তের স্বরূপ যাকে হায়েয বলা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় সে অধিকাংশ নারীর নিয়মানুযায়ী কাজ করবে। তাই প্রত্যেক মাসে যখন থেকে সে হায়েয দেখবে, তখন থেকে ছয়দিন বা সাতদিন হায়েয গণ্য হবে, বাকী ইস্তিহাযা।

ইস্তিহাযার বিধান।

ইস্তিহাযার বিধান পবিত্রতার বিধানের মতই। ইস্তিহাযাগ্রস্ত ও পবিত্রতা মহিলাদের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। তবে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। তা হলো,

১। প্রত্যেক নামাযের সময় তাকে ওযু করতে হবে।

২। যখন সে ওযুর ইচ্ছা করবে, রক্তের দাগ ধুয়ে নেবে এবং রক্তকে শোষণ করার জন্য লজ্জাস্থানে কোন সুতির কাপড়ের টুকরা রেখে নেবে।

নিফাসের বিধান

সন্তানাদির ভূমিষ্ঠের সময় অথবা তার দু'দিন বা তিনদিন আগে-পিছে বেদনাজড়িত যে রক্ত রেহেম থেকে বের হয়, তাকেই নিফাসের রক্ত বলে। আর যখনই এই রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, তখনই পবিত্রা বলে গণ্য হয়। তবে যদি ৪০দিন অতিক্রম করে, তাহলে সে গোসল করে নেবে, যদিও রক্ত প্রবাহ অব্যাহত থাকে। কারণ, ৪০ দিনই হলো নিফাসের সর্বশেষ সময়। তবে ৪০ দিনের পর প্রবহমান রক্ত যদি মাসিকের রক্ত হয়, তাহলে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত মাসিকের নিয়ম পালন করবে। তার পর গোসল করবে। আর নিফাস তখনই প্রমাণিত হবে, যখন সৃষ্টের মধ্যে মানব আকৃতির প্রকাশ পাবে। কিন্তু যদি ছোট অসম্পূর্ণ ভ্রূণ হয়, মানব আকৃতির প্রকাশ যদি না থাকে, তাহলে তার রক্ত নিফাসের রক্ত বলে প্রমাণিত হবে না, বরং তা কোন রগের রক্ত বলে গণ্য হবে এবং এমতাবস্থায় ইস্তিহাযার বিধান তাতে কার্যকরী হবে। মানব আকৃতি প্রকাশ হওয়ার সর্ব নিম্ন সময় হলো গর্ভধারণ আরম্ভ থেকে ৮০ দিন। আর সর্বোচ্চ হলো ৯০ দিন। আর নিফাসের বিধান হলো উল্লিখিত মাসিকের বিধানের মত।

মাসিক প্রতিরোধক

মাসিক প্রতিরোধক কোন জিনিস নারী ব্যবহার করতে পারে দুই শর্তের ভিত্তিতে। যেমন,

১। তার ব্যবহারে কোন ক্ষতির আশঙ্কা যেন না থাকে, ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে তা জায়েয হবে না।

২। এটা স্বামীর অনুমতিতে হতে হবে যদি তা স্বামীর সম্পর্কিত কোন বিষয় হয়। মাসিক নিয়ে আসে এমন কোন জিনিসও ব্যবহার করতে পারে দু'টি শর্তের ভিত্তিতে। যেমন,

১। স্বামীর অনুমতি।

২। কোন পালনীয় ওয়াজিব থেকে রক্ষার বাহানায় যেন এ কাজ না করা হয়। যেমন রোযা রাখা ও নামায পড়া ইত্যাদি থেকে বাঁচার জন্য ব্যবহার করা।

গর্ভধারণ প্রতিরোধক ব্যবহার করা দু'প্রকারের। এক, সব সময়ের জন্য প্রতিরোধ করা এটা জায়েয নয়। দুই, সাময়িকের জন্য প্রতিরোধ করা। যেমন, নারী যদি অত্যধিক প্রসবকারিণী হয়, আর প্রসব তাকে দুর্বল করে দেয়, তাহলে দু'বছর অন্তর একবার প্রসব হওয়ার ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা ভাল। আর এটা জায়েয তবে স্বামীর অনুমতি থাকতে হবে এবং নারীর যেন কোন ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে।

مختصر السيرة النبوية
সংক্ষিপ্ত নবী জীবনী

নবী আগমনের পূর্বে আরবের অবস্থা

মূর্তি পূজাই ছিল আরবদের প্রচলিত ধর্ম। সত্য ধর্মের পরিপন্থী এ ধরণের মূর্তিপূজাবাদ অবলম্বন করার কারণে তাদের এ যুগকে আইয়্যামে জাহেলিয়াত তথা মূর্খতার যুগ বলা হয়। লাত, উযযা, মানাত ও হুবল ছিল তাদের প্রসিদ্ধ উপাস্যগুলোর অন্যতম। আরবের কিছু লোক ইহুদী, খ্রীষ্টান ও অগ্নি পূজকদের ধর্মও গ্রহণ করেছিল। আবার স্বল্প সংখ্যক লোক এমনও ছিল, যারা ইবরাহীম (আলাইহিস্‌সালাম)-এর প্রদর্শিত পথে ছিল অবিচল, আঁকড়ে ধরেছিল তাঁর আদর্শ।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বেদুঈনরা সম্পূর্ণ ভাবে চরে খাওয়া পশুসম্পদের উপর নির্ভর করতো। আর নগর-বাসীদের নিকট অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি ছিল কৃষিকাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্য। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব দেশের মক্কাই ছিল বৃহত্তর বাণিজ্য নগরী। অন্যান্য বিভিন্ন অঞ্চলেও উন্নয়ন ও স্থাপত্য সভ্যতা ছিল। সামাজিক দিক দিয়ে যুলুম চরমপর্যায়ে সর্বত্র বিরাজমান ছিল। তাদের সেখানে দুর্বলের ছিলনা কোন অধিকার। কন্যা সন্তানকে জীবদ্দশায় দাফন করা হতো। মান-ইজ্জত ও সম্মানকে করা হতো পদদলিত। সবল দুর্বলের অধিকার হরণ করতো। বহুবিবাহ প্রথার কোন সীমা ছিল না। ব্যভিচার অবাধ ভাবে চলতো। নগণ্য ও তুচ্ছ কারণে যুদ্ধের অগ্নিশিখা জ্বলে উঠতো। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায় যে,ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব দ্বীপের সার্বিক পরিস্থিতি অত্যধিক ভয়াবহই ছিল।

ইবনুযযাবিহাঈন

রাসূলের দাদা আব্দুল মুত্তালিবের সাথে কুরাইশরা ছেলে-সন্তান ও সম্পদের গৌরব ও অহংকার প্রদর্শন করতো। তাই তিনি মানত করলেন যে, আল্লাহ যদি তাঁকে দশ জন ছেলে দান করেন, তাহলে তিনি একজনকে কথিত খোদার নৈকট্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে জবাই করবেন। তাঁর সাধ বাস্তব রূপ পেল। দশ জন ছেলে জুটলো তাঁর ভাগ্যে। তাদের একজন ছিলেন নবীর পিতা আব্দুল্লাহ। আব্দুল মুত্তালিব মানত পূরণ করার ইচ্ছায় সন্তানদের মধ্যে লটারী করলে তাতে আব্দুল্লাহর নাম বের হলো। তিনি তাকে জবাই করতে চাইলে লোকজন তাঁকে বাধা দেয়, যাতে এটা মানুষের মধ্যে প্রথা না হয়ে যায়। অতঃপর সবাই আব্দুল্লাহ এবং দশটি উটের মধ্যে লটারীর তীর নিক্ষেপ করতে সম্মত হয়। কিন্তু লটারীতে আব্দুল্লাহর নাম আসে, ফলে উটের সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হয়। এইভাবে লটারী বারংবার আব্দুল্লাহর নামে আসতে থাকে। দশমবারে লটারী উটের নামে আসে যখন তার সংখ্যা ১০০ তে দাঁড়ায়। ফলে তিনি তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহর পরিবর্তে উট জবাই করেন।

আব্দুল্লাহ তাঁর পিতা আব্দুল মুত্তালিবের সব চাইতে প্রিয় ছেলে ছিলেন। বিশেষতঃ এই ঘটনার পর। আব্দুল্লাহ তারুণ্যের সীমায় পা রাখলে, তাঁর পিতা বনী যোহরা গোত্রের আমেনা বিনতে ওয়াহাব নামক এক তরুণীর সাথে তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করেন। আমেনা অন্তঃসত্ত্বা হলেন। তাঁর অন্তঃসত্ত্বা হবার তিন মাস পর আব্দুল্লাহ এক বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হোন।কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পথে রোগাক্রান্ত হয়ে মদীনায় বনীনাজ্জার গোত্রে তাঁর মামাদের কাছে অবস্থান করেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় সেখানে।

এদিকে গর্ভের মাসগুলো পুরো হয়ে প্রসবের সময় ঘনিয়ে আসলো এবং সোমবারের দিন নবী করীম (সাল্লা-ল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) জন্ম গ্রহণ করলেন। তবে তাঁর জন্মের তারীখ ও মাস দৃঢ়তার সাথে নির্দিষ্ট নয়। বরং কেউ বলেছে, তিনি ৯ই রাবিউল আওয়াল জন্ম গ্রহণ করেছেন। কেউ বলেছে, ১২ই রাবিউল আওয়াল এবং কেউ বলেছে, রমযান মাসে। এ ছাড়া আরো উক্তিও আছে। আর এই ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়

ইংরাজী সনের ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে। এই বছরটা 'আ'মুল ফীল' (হস্তি বাহিনীর বছর) নামে পরিচিত।

হস্তী বাহিনীর ঘটনা

আবরাহা ছিল ইথিওপিয়ার শাসক কর্তৃক নিযুক্ত ইয়ামানের গভর্নর। সে যখন দেখলো যে, আরবরা মক্কায় অবস্থিত কা'বার হজ্জ করছে, তার তাযীম করছে এবং দূর-দুরান্ত থেকে সেখানে আগমন করছে, তখন সে সানআতে (বর্তমানে ইয়ামানের রাজধানী) এক বিরাট গির্জা নির্মাণ করলো, যেন আরবরা এ নব নির্মিত গির্জায় হজ্জ করে। অতঃপর কেনানা গোত্রের (আরবের একটা গোত্র) এক লোক তা শুনার পর রাতে প্রবেশ করে, গির্জার দেয়ালগুলোকে মলদ্বারা পঙ্কিল করে দেয়। আবরাহা এ কথা শুনার পর রাগে ক্ষেপে উঠলো এবং ৬০হাজারের এক বিরাট সেনা বাহিনী নিয়ে কাবাশরীফ ধ্বংস করার জন্য রওয়ানা হলো। সেনাবাহিনীর মধ্যে নয়টি হাতী ছিল। নিজের জন্য সে সব চেয়ে বড় হাতীটা পছন্দ করলো। মক্কা নিকটবর্তী হওয়া পর্যন্ত তারা যাত্রা অব্যাহত রাখলো। তারপর সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করে মক্কায় প্রবেশ করার জন্য উদ্যত হলো, কিন্তু হাতী বসে গেল কোনক্রমেই কাবার দিকে অগ্রসর করানো গেলো না। যখন তারা হাতীকে কাবার বিপরীত দিকে অগ্রসর করাতো, দ্রুত সে দিকে অগ্রসর হতো কিন্তু কাবার দিকে অগ্রসর করাতে চাইলেই, বসে পড়তো। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাদের প্রতি প্রেরণ করেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি, যা তাদের উপর জাহান্নামের আগুনে পক্ত করা ছোট ছোট পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করা শুরু করলো। প্রত্যেক পাখি তিনটি করে কাঁকর বহন করে এনেছিলো। ১টি পাথর ঠোঁটে আর দুটি দুই পায়ে। পাথর দেহে পড়া মাত্র দেহের সব অঙ্গ-প্রতঙ্গ টুকরো টুকরো হয়ে ধ্বংস হয়ে যেতো। যারা পলায়ন করে, তারাও পথে মৃত্যুর ছোবল থেকে রক্ষা পায়নি।

আবরাহার উপর মহান আল্লাহ এমন মারাত্মক এক রোগ প্রেরণ করলেন যে, সে রোগের ফলে তার সব আঙ্গুল খসে পড়তে লাগলো এবং সে এমন অবস্থায় সানআয় পৌঁছলো যে, কষ্ট তার শেষ সীমা পর্যন্ত তাকে গ্রাস করে ফেলেছিলো। সে সেখানে মৃত্যুবরণ করলো। কুরাইশরা গিরিউপত্যকায় বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং সেনাবাহিনীর ভয়ে পর্বতে আশ্রয় নিয়েছিল। আবরাহার সেনাবাহিনীর এ অশুভ পরিণামের পর তারা নিরাপদে ঘরে ফিরে আসলো। রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর জন্মের ৫০দিন পূর্বে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো।

দুগ্ধ পান

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর জন্মের পর প্রথমে তাঁকে দুধ পান করায় তাঁর চাচা আবু লাহাবের ক্রীতদাসী সুআইবা। এই মহিলা ইতিপূর্বে তাঁর (রাসূলের) চাচা হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকেও দুধ পান করিয়ে ছিলো। তাই হামযা (রাঃ) ছিলেন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর দুধ ভাই। আরবদের প্রথা ছিল যে, তারা তাদের শিশুদেরকে বেদুঈন অধ্যুষিত মরু অঞ্চলে লালন-পালন করার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিত। সেখানে তাদের দৈহিক সুস্থতার অনুকূল পরিবেশ ছিল। তাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)ও অন্য দুধদাত্রীর কাছে স্থানান্তরিত হলেন। রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাই অসাল্লাম)-এর পবিত্র জন্ম লাভের পর বনীসাদ গোত্রের এক মহিলার দল দুধপানকারী সন্তানের খোঁজে মক্কায় আসে। মহিলারা মক্কার ঘরে ঘরে শিশুর অনুসন্ধানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু রাসূলের পিতৃহীনতা ও দারিদ্র্যের কারণে সকল মহিলারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে গ্রহণ করা থেকে ছিলো বিমুখ। হালিমা সাদিয়াও ছিলেন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বিমুখ প্রদর্শনকারিনী মহিলাদের মধ্যে একজন। সবার মত তিনিও ছিলেন বিমুখ। শিশু পালনের পারিশ্রমিক দিয়ে জীবনের অভাব অনটন বিমোচন করা ও জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা দূর করার লক্ষ্যে মক্কার অধিকাংশ ঘরে শিশুর অনুসন্ধান করেও সফল হোননি তিনি। অধিকন্তু সে বছরে ছিল অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ। তাই স্বল্প পারিশ্রমিকে ইয়াতীম সন্তানকে নেয়ার উদ্দেশ্যে আমেনার ঘরে আবার ফিরে আসেন তিনি। হালিমা আপন স্বামীর সাথে মক্কায় মন্থর গতিতে চলে এমন একটি দুর্বল গাধী

নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পথে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে কোলে নেয়ার পর গাধী অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলছিলো এবং অন্যান্য সব জানোয়ারকে পিছনে ফেলে আসছিল। ফলে সফর সঙ্গীরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়। হালিমা আরো বর্ণনা করেন যে, তাঁর স্তনে কোন দুধ ছিল না, তাঁর ছেলে ক্ষুধায় সর্বদা কাঁদতো। রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁর পবিত্র মুখ স্তনে রাখার পর প্রচুর পরিমাণে দুধ তাঁর স্তনে আসতে লাগলো। বনী সাদ গোত্রের অধ্যুষিত অঞ্চলের অনাবৃষ্টি সর্ম্পকে তিনি বলেন যে, এ শিশু (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) দুধ পান করার বদৌলতে জমিতে উৎপন্ন হতে লাগলো ফল-মূল এবং ছাগল ও অন্যান্য পশু দিতে লাগলো বাচ্চা। অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনের পরিবর্তে সুখ ও সমৃদ্ধি সর্বত্র বিরাজমান হয়।

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) হালিমার পরিচর্যায় দু'বছর পালিত হোন। তিনি তাঁর প্রতি সর্বতোভাবে যত্নশীলা ছিলেন। এই শিশুকে কেন্দ্র করে হৃদয়ের গভীরে তিনি বহু অলৌকিক কর্ম-কান্ড ও অবস্থা উপলব্ধি করতেন। দু'বছর শেষ হবার পর হালিমা তাঁকে মক্কায় মাতা ও দাদার কাছে নিয়ে আসলেন। কিন্তু তিনি যেহেতু রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর বদৌলতে বহু এমন এমন বরকত অবলোকন করেন, যে বরকত তাঁর অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়, তাই আমেনার কাছে রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে দ্বিতীয় বার দেয়ার জন্য আবেদন করেন। আমেনা তাতে সম্মত হোন। হালিমা ইয়াতীম শিশুকে নিয়ে নিজ এলাকায় আনন্দ ও সন্তোষ সহকারে ফিরে আসেন।

বক্ষ বিদারণ

এক দিন শিশু মুহাম্মাদ তাঁর দুধভাইয়ের (হালিমার ছেলের) সাথে তাঁবু থেকে দূরে খেলা-ধুলা করছিলেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল চার বছরের কাছা কাছি। এমতাবস্থায় হালিমার ছেলে ভীত সন্ত্রস্ত ও আতংকগ্রস্ত হয়ে মায়ের কাছে দৌড়ে এসে তাকে কুরাইশী ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানালো। ঘটনা কি জিজ্ঞেস করা হলে সে উত্তর দিলো যে, দু'জন সাদা পোশাক পরিহিত লোককে আমাদের কাছ থেকে মুহাম্মাদকে নিয়ে মাটিতে চিৎ ক'রে তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করতে দেখেছি। তার বর্ণনা শেষ না করতেই হালিমা ঘটনাস্থলের দিকে দৌড়ে যান। গিয়ে দেখেন মুহাম্মাদ নিজ স্থানে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। হলুদ বর্ণ মুখমন্ডলে ভেসে গেছে। দেহ ফ্যাকাশে। তাঁকে ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে অত্যন্ত শান্তভাবে জবাব দেন যে, তিনি ভাল আছেন। তিনি আরো বলেন, সাদা পোশাক পরিহিত দু'ব্যক্তি এসে তাঁর বক্ষবিদীর্ণ করে হৃদয় বের ক'রে কাল জমাট বাঁধা রক্ত বের ক'রে ফেলে দেয়, এবং হৃদয়কে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে আবার যথাস্থানে রেখে দেয়। বক্ষে হাত ফিরিয়ে দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায়। এর পর হালিমা মুহাম্মাদকে নিয়ে তাঁবুতে ফিরে আসেন। পরের দিন ভোর হতেই তিনি মুহাম্মাদকে তাঁর মায়ের কাছে মক্কায় নিয়ে আসেন। আমেনা অনির্ধারিত সময়ে হালিমাকে ছেলে নিয়ে আসতে দেখে আশ্চর্যান্বিত হোন, অথচ তিনি ছেলের (নিজের কাছে রাখার) প্রতি ছিলেন অত্যধিক আগ্রহী। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে হালিমা বক্ষ বিদারণের ঘটনার পুরো বিবরণ দেন।

আমেনা নিজের ইয়াতীম শিশু মুহাম্মাদকে নিয়ে ইয়াসরাবে (মদীনায়) বনী নাজ্জার গোত্রে মামাদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য যাত্রা করেন। সেখানে কিছু দিন অবস্থান ক'রে ফেরার পথে "আবওয়া" নামক স্থানে মৃত্যু বরণ করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। ফলে মুহাম্মাদ ছয় বছর বয়সে মাতৃ-স্নেহ ও আদরের ছায়া থেকে বঞ্চিত হোন। দাদা আব্দুল মুত্তালিবকে এ অপূরণীয় ক্ষতির কিছুটা লাঘব করতে হবে। তাই তিনি তাঁর দেখা-শুনা ও পরিচর্যার দায়িত্ব নেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) যখন আট বছর বয়সে পা রাখেন, তখন তাঁর দাদা ইহকাল ত্যাগ করেন। অতঃপর চাচা আবুতালিব আর্থিক অভাব-অনটন ও পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশী থাকা সত্ত্বেও তাঁর দেখা-শুনার দায়িত্ব নেন। রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর চাচা আবূ তালেব ও তার স্ত্রী তাঁর (রাসুলের) সাথে আপন ছেলের ন্যায় আচরণ করেন। ইয়াতীম

ছেলের সম্পর্ক আপন চাচার সাথে অনেকটা গভীর হয়ে উঠে। এ পরিবেশে তিনি বড় হয়ে উঠেন। সত্যবাদিতা ও আমানতদারীর মত গুণে গুণান্বিত হয়ে যৌবনে পদার্পন করেন। এমন কি উক্ত গুণ দু'টি তাঁর পরিচায়ক উপাধিরূপে প্রসিদ্ধ লাভ করে। সুতরাং কেউ যদি বলে, আল-আমীন উপস্থিত হয়েছেন, বুঝা হতো মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) যখন কিছুটা বড় হয়ে যৌবনে পদার্পণ করেন, তখন স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে জীবিকার্জনের চেষ্টা করেন। ফলে শ্রম ব্যয় ও উপার্জনের পালা আরম্ভ হয়। তিনি স্বল্প পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরাইশের কিছু লোকের ছাগলের রাখাল হিসেবে কাজ করেন। খাদীজা বিনতে খোয়াইলিদ কর্তৃক আয়োজিত এক বাণিজ্যিক ভ্রমণে সিরিয়া গমন করেন। খাদীজা ছিলেন বিত্তশালিনী বিধবা মহিলা। সে ভ্রমণে সম্পদ ও ব্যবসায়িক সামগ্রীর তত্ত্বাবধায়ক ছিল তাঁরই দাস "মাইসারাহ"। রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসল্লাম)-এর বরকত ও সততার কারণে খাদীজার এ ব্যবসায়ে নজীরবিহীন লাভ হয়। তিনি স্বীয় দাস মাইসা-রাহর কাছে এত লাভ হওয়ার কারণ কি জানতে চাইলে বলা হয়, মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ নিজেই বেচা-কেনার দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন। ক্রেতার ঢল নামে। ফলে কারো প্রতি কোন যুলুম করা ব্যতিরেকেই লাভ হয় প্রচুর। খাদীজা তাঁর দাসের বর্ণনা মনোযোগ দিয়ে শুনেন। এমনিতেও তিনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) সম্পর্কে অনেক কিছু জানতেন। তিনি মুহাম্মাদের প্রতি হয়ে পড়েন মুগ্ধ ও অভিভূত। তিনি তাঁকে বিবাহ করতে আগ্রহী হোন। তাই এ ব্যাপারে মুহাম্মাদের মনোভাব জানার উদ্দেশ্যে নিজের এক আত্মীয়াকে পাঠান। তখন তাঁর বয়স পঁচিশে উন্নীত হয়। তাঁর নিকট খাদীজার আত্মীয়া বিয়ের প্রস্তাব রাখলে তিনি তা গ্রহণ করেন। বিয়ে সম্পাদিত হয়। তাঁরা একে অপরকে পেয়ে সুখী হোন। তিনি খাদীজার অর্থ সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় স্বীয় যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রমাণ দেন। কয়েক বছর অতিবাহিত হয়। খাদীজা গর্ভধারণ ও প্রসব করেন। ফলে খাদীজার গর্ভে জন্ম লাভ করেন কন্যাদের মধ্যে যয়নাব, রুকাইয়্যাহ, উম্মেকুলসুম ও ফাতিমা। আর ছেলেদের মধ্যে কাসিম ও আব্দুল্লাহ, যাঁরা শৈশবেই মারা যান।

কা'বা গৃহ পুনঃ নির্মাণ

যখন নবী করীম ﷺ-এর বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ বছর ঠিক এ সময় কুরাইশরা কা'বা গৃহ পুনঃ নির্মাণের ইচ্ছা করে। কারণ, তার দেওয়ালগুলো ফেটে গিয়েছিল এবং অনেক পূর্বে নির্মিত হওয়ার কারণে তা ভেঙ্গে পড়ার মত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তাছাড়া মহা এক প্লাবন মক্কাকে গ্রাস করার কারণে এবং কা'বামুখী জলধারা প্রবল বেগে প্রবাহিত হওয়ার কারণে কা'বার চরম অবনতি ঘটেছিলো। ফলে কুরাইশরা কা'বার মান-মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার তাগিদে তার পুনঃ নির্মাণ করতে বাধ্য হয়ে পড়েছিলো। আর তারা সকলে মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, তার নির্মাণে কেবল হালাল ও পবিত্র অর্থই ব্যবহার করা হবে। এই নির্মাণ কাজ যখন 'হাজরে আসওয়াদ' পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল, তখন তাদের মধ্যে এ নিয়ে ঝগড়ার সৃষ্টি হলো যে, ঐ পাথরকে তার যথাস্থানে রাখার গৌরব লাভে কে বা কারা ধন্য হবে। চার অথবা পাঁচ দিন পর্যন্ত এ বিবাদ অব্যাহত থাকলো। আর এ বিবাদ কঠিনতর হয়ে তাদের মধ্যে ধ্বংসকারী এক যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলো। অতঃপর তারা ঐক্যবদ্ধ হলো যে, তারা তারই মীমাংসাকে মেনে নিবে, যে (আগামী কাল) সর্ব প্রথম মসজিদে প্রবেশ করবে। এ দিকে আল্লাহ চাইলেন যে, সর্ব প্রথম প্রবেশকারী রাসূলুল্লাহ ﷺ হোক। তারা যখন তাঁকে দেখলো, তখন সকলে চিৎকার করে বলে উঠলো যে, ইনি তো 'আল আমীন' (বিশ্বাসী)। আমরা সকলে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। ইনি হলেন মুহাম্মাদ ﷺ। তিনি তাদের কাছে পৌঁছলে বিস্তারিত ঘটনা তাঁকে জানানো হলো। তিনি একটি চাদর চাইলেন এবং 'হাজরে আসওয়াদ' কে তার মধ্যেখানে রেখে দিলেন। অতঃপর বিবাদকারী গোত্রের সর্দারদেরকে বললেন, আপনারা চাদরের একটি করে কোণা ধরে সেটাকে উঠিয়ে নিয়ে চলুন। যখন তারা সেটাকে নিয়ে যথাস্থানে পৌঁছলো, তখন তিনি ﷺ সেটা (পাথরটা)কে সহস্তে উঠিয়ে যথাস্থানে রেখে দিলেন।

এটা ছিলো এক সুবিজ্ঞ মীমাংসা যাতে সকলেই সন্তুষ্ট হয়েছিলো।

এদিকে কুরাইশদের বৈধ অর্থ কমে গেলো, তাই উত্তর দিক থেকে কা'বা গৃহের দৈর্ঘ প্রায় ছয় হাত পর্যন্ত কমিয়ে দেওয়া হলো। আর এই অংশটুকুকেই বলা হয় 'হিজ্‌র' এবং 'হাতীম'। কাব'ার নিমার্ণ কার্য সম্পন্ন হলে তা প্রায় চার কোণা আকারের একটি গৃহের রূপ ধারণ করলো। তারা (কুরাইশরা) তার দরজাকে যমীন থেকে উঁচু করে দিলো, যাতে তার মধ্যে কেবল সেই ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারে, যাকে তারা অনুমতি দিবে। যখন দেওয়ালগুলো পনের হাত উঁচু হলো, তখন ছয়টি পিলার বা স্তম্ভের উপর তার ছাদ দেওয়া হলো।

হিলফুল ফুযূল বা ন্যায়নিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা

হিলফুল ফুযূল বা ন্যায়নিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা হওয়ার কারণ হলো, ইয়ামানের যুবাইদী গোত্রের এক ব্যক্তি তার দ্রব্যাদি নিয়ে (বিক্রয়ের জন্য) মক্কায় আসে। আ'স ইবনে ওয়ায়েল তার কাছ থেকে তা ক্রয় করে নেয়। এই লোকের মক্কায় বড়ই মান-মর্যাদা ছিলো। সে তাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করলো। আর যুবাইবী গোত্রের এই লোক এমন কাউকে পেলো না যে তার থেকে তার ন্যায্য প্রাপ্ত ও অধিকার আদায় করে দিবে। তাই সে পাহাড়ের উপরে আরোহন ক'রে তার যুলুমের প্রতিকারের জন্য ফরিয়াদ করলো। ফলে মক্কার বিভিন্ন গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা একত্রিত হয় এবং তারা যুলুমের প্রতিকারের জন্য সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অঙ্গীকার ব্যক্ত করে যে, মক্কার ও মক্কায় প্রবেশকারী সকল অত্যাচারিত ব্যক্তির পক্ষ নিয়ে তার যুলুমের প্রতিকার করবে। কুরাইশরা এর নাম দেয় 'হিলফুল ফুযূল'। নবী করীম ﷺ এই অঙ্গীকার গ্রহণের সভায় উপস্থিত ছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিলো বিশ বছর।

নবূওয়াত লাভ

তাঁর বয়স চল্লিশের নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথে মক্কার সন্নিকটে পূর্বদিকে (নূর নামক) এক পাহাড়ের হেরা নামক গুহায় তিনি নিরিবিলি ও নির্জন অবস্থায় কয়েক দিন ও কয়েক রাত আল্লাহর ধ্যানে কাটিয়ে দিতেন। পবিত্র রমযানের ২১ তারিখের রাতে গুহায় তাঁর কাছে জিবরীল (আঃ) আসেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৪০ বছর। জিবরাঈল বলেন,পড়ুন। তিনি বললেন, আমি পড়তে জানি না। জিবরাঈল দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বারের মত পুনরায় বললেন। তৃতীয়বার জিবরাঈল বলেন,

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْأِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾

অর্থঃ "পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন,আপনার পালনকর্তা মহাদয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না। (সূরা আলাক্ব ১-৫) অতঃপর জিবরীল (আলাইহিস্‌সালাম) চলে গেলেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলা- ইহি অসাল্লাম) আর হেরা গুহায় অবস্থান করতে পারলেন না। তিনি ঘরে এসে খাদীজাকে হৃদয় স্পন্দিত অবস্থায় বললেন, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করো, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর। তাঁকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করা হলো। ভয় ও আতংক দূর হয়ে গেলে তিনি সবকিছু খাদীজাকে খুলে বললেন। এর পর তিনি বললেন,আমি নিজের ব্যাপারে আশংকা বোধ করছি। খাদীজা দৃঢ়তার সাথে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "কখনো নয়,আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আপনাকে অপমানিত করবেন না। নিশ্চয় আপনি আত্নীয় স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন, অভাবীদের সাহায্য করেন, গরীব ও নিঃস্ব ব্যক্তিদেরকে প্রদান করেন। অতিথিকে সমাদর করেন এবং বিপদগ্রস্তদের সহায়তা করেন"।

কিছু দিন পরে তিনি আল্লাহর ইবাদত অব্যাহত রাখার জন্য আবার হেরা গুহায় ফিরে আসেন। ইবাদত শেষে গুহা থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের জন্য অবতরণ করছিলেন, যখন তিনি উপত্যকায় পৌঁছলেন, তখন জিবরাঈল আকাশ ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে একটি চেয়ারে উপবিষ্ট অবস্থায় তাঁর কাছে এসে তাঁর প্রতি অহী করেন।

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنْذِرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ [المدثر ١-٥]

অর্থাৎ, "হে চাদরাবৃত! উঠুন,সতর্ক করুন, আপনার পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন। আপনার পোশাক পবিত্র করুন এবং অপবিত্রতা দূর করুন।" (সূরা মুদ্দাস্‌সিরঃ ১-৫) পরবর্তী সময়ে ওহী অব্যাহত থাকে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) পবিত্র দাওয়াতী ব্রত শুরু করলে সর্ব প্রথম তাঁর গুণবতী স্ত্রী খাদীজা (রাঃ) ঈমানের ডাকে সাড়া দেন। আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর স্বামীর নবুওয়াতের সাক্ষ্য দেন। তাই তিনি ছিলেন সর্ব প্রথম মুসলিম নারী। অতঃপর রাসূল তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু আবূ বাকারের সাথে ইসলামের ব্যাপারে আলাপ করলে দ্বিধাহীন চিত্তে তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সত্যতার সাক্ষ্য দেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আপন চাচা আবূ তালিবের স্নেহ পরিচর্যা ও অবদানের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ, যিনি রাসূলের মাতা ও দাদার পর দেখা-শুনার দায়িত্ব বহন করেন, তাঁর ছেলে আলীর লালন-পালন ও দেখা-শুনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এ সুন্দর পরিবেশ আলীর অন্তর ও বিবেক খুলে দেয়। তিনিও ঈমান আনয়ন করেন। অতঃপর খাদীজার দাস যাইদ ইবনে হারেসাহ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে সমবেত হোন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) গোপন ভাবে দাওয়াতী মিশন চালিয়ে যেতে থাকলেন। নবাগত মুসলিমরা তাঁদের ইসলাম গোপন করতেন। কারো ইসলাম গ্রহণের বিষয়টা প্রকাশ হয়ে গেলে কুরাইশের কাফেরদের কঠিন নির্যাতনের শিকার হতেন।

প্রকাশ্য দাওয়াত

এ ভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) ৩ বছর পর্যন্ত ব্যক্তিগত দাওয়াতের গোপন ব্রতে ব্যস্ত থাকেন। অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ আসে যে,

﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الحجر: ٩٤]

অর্থাৎ, "আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দেন, যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরোয়া করবেন না।" (সূরা হিজরঃ৯৪) এ আদেশ পেয়ে এক দিন তিনি সাফা পর্বতে আরোহণ ক'রে কুরাইশদেরকে ডাক দেন। তাঁর ডাক শুনে অনেক লোকের সমাগম ঘটে। তন্মধ্যে তাঁর চাচা আবূ লাহাবও একজন ছিল। সে কুরাইশদের মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সব চাইতে কট্টর শত্রু ছিল। মানুষ সমবেত হবার পর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন,আমি যদি আপনাদেরকে এ কথার সংবাদ দিই যে, পাহাড়ের পেছনে এক শত্রুদল আপনাদের উপর আক্রমণ করার জন্য অপেক্ষা করছে।আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করবেন? সবাই এক স্বরে বললো, আমরা আপনার মধ্যে সততা ও সত্যবাদিতা ছাড়া কিছুই দেখিনি। তিনি বললেন, আমি আপনাদেরকে কঠিন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করছি। অতঃপর তিনি তাদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করলেন এবং মূর্তিপূজা বর্জন করতে বললেন। একথা শুনে আবুলাহাব রাগে ক্ষেপে উঠে বললো, তোমার ধ্বংস হোক। এ জন্যেই কি আমাদেরকে একত্রিত করেছো? এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক সূরা লাহাব অবতীর্ণ করে

﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ، مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ، سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ﴾ [المسد ١-٥]

অর্থাৎ, "আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে। কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে। সত্বর সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে এবং তার স্ত্রীও যে ইন্ধন বহন করে। তার গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে।" (সূরা লাহাব ১-৫)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) দাওয়াতী কাজ পুরো দমে অব্যাহত রাখলেন। জন সমাবেশ স্থলে তিনি প্রকাশ্যভাবে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতেন। তিনি কা'বা শরীফের নিকটে নামায আদায় করতেন। মানুষের সমাবেশে তিনি উপস্থিত হতেন। তিনি বাজারে মুশরিকদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতেন। এ কারণে তিনি বহু কষ্টের শিকার হতেন। মুসলিমদের উপরে কাফেরদের অত্যাচার ও নিপীড়নের মাত্রা বেড়ে গেলো। ইয়াসের, সুমাইয়্যা ও তাদের সন্তান আম্মারের বেলায় তাই ঘটেছে। আল্লাহদ্রোহীদের নির্যাতনে আম্মারের পিতা-মাতা শহীদ হোন। সুমাইয়্যা ইসলামে প্রথম শহীদের মর্যাদায় ভূষিত হোন।বিলাল ইবনে রাবাহ উমাইয়া ইবনে খালাফ ও আবূ জেহেলের অকথ্য নির্যাতনের শিকার হোন। অবশ্যই বিলাল হযরত আবূ বাকারের (রাঃ) মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ খবর শুনে তাঁর মুনিব উমাইয়া ইবনে খালাফ অত্যাচারের সব রকম পন্থা অবলম্বন করে, যাতে বিলাল ইসলাম ত্যাগ করে। কিন্তু তিনি আকঁড়ে ধরেন ইসলামকে এবং অস্বীকার করেন ইসলাম ত্যাগ করতে। উমাইয়া তাঁকে শিকলে বেঁধে মক্কার বাইরে নিয়ে গিয়ে বুকের উপর বিরাট পাথর রেখে উত্তপ্ত বালিতে হেঁচড়াইয়া টানতো। অতঃপর সে ও তার সঙ্গীরা বেত্রাঘাত করতো আর বিলাল শুধু আহাদ, আহাদ, অদ্বিতীয়, অদ্বিতীয়, বলতে থাকতেন। এহেন অবস্থায় এক বার আবূ বাকর তাঁকে দেখেন। তিনি বিলালকে উমাইয়্যার কাছ থেকে ক্রয় ক'রে আল্লাহর নিমিত্তে স্বাধীন করে দেন।

এ সব পৈশাচিক ও বর্বর অত্যাচারের কারণে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) কৌশল অবলম্বন ক'রে মুসলিমদেরকে ইসলাম প্রকাশ করতে নিষেধ করেন। তাদের সাথে মিলিত হতেন অত্যন্ত সংগোপনে। কেননা প্রকাশ্যভাবে মিলিত হলে মুশরিকরা রাসূলের শিক্ষা প্রদানের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। তাছাড়া দু'দলের সংঘর্ষের আশঙ্কাও ছিল। আর এ কথা সুবিদিত যে, এহেন নাজুক পরিস্থিতিতে সংঘর্ষ মুসলিমদের ধ্বংস ও সমূলে বিনাশই ডেকে আনবে। কারণ মুসলিমদের সংখ্যা ও শক্তি-সামর্থ্য ছিল খুবই স্বল্প। তাই তাদের ইসলাম গোপন রাখাটাই ছিল দূরদর্শিতা। অবশ্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) কাফেরদের অত্যাচার সত্ত্বেও প্রকাশ্যভাবে দাওয়াত ও ইবাদতের কাজ করে যেতেন।

নবীর চাচা হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের ইসলাম গ্রহণ

একদা মুশরিকদের নেতা এবং ইসলামের শত্রু আবূ জেহেল নবী করীম ﷺ-এর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলো তিনি তখন কা'বা শরীফে ছিলেন। সে তাঁকে অনেক গালাগালি করলো এবং কষ্ট দিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কথার কোন উত্তর দিলেন না এবং তাঁর সাথে কথাও বললেন না। ব্যাপারটা কোন এক মহিলা লক্ষ্য করলো। সামান্য পরেই হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ﵁ মক্কার বাইরে থেকে শিকার সফর হতে ফিলে এলেন। উক্ত মহিলা তাঁকে জানিয়ে দিলো আবূ জেহেলের নবী করীম ﷺকে গালমন্দ করার কথা। এ কথা শুনে হামযা ﵁ ক্রোধে ফেটে পড়লেন এবং আবূ জেহেলকে খুঁজতে বের হলেন। তাকে তিনি তার গোত্রের লোকদের সাথে বসা অবস্থায় পেয়ে ধনুক দিয়ে তার মাথায় সজোরে আঘাত করলেন এবং বললেন, 'তুমি মুহাম্মাদকে গালমন্দ করো, অথচ আমি তাঁর দ্বীনেই রয়েছি?' অতএব, এটাই ছিলো তাঁর (হামযা ﵁) ইসলাম গ্রহণের কারণ। আর তাঁর ইসলাম গ্রহণ ছিলো মুসলিমদের জন্য বড়ই শক্তি ও সামর্থ্যের উৎস। কেননা, মক্কাবাসীদের মাঝে তাঁর ছিলো অতীব মর্যাদা ও প্রভাব।

উমার ইবনে খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ

উমার ইবনে খাত্তাব ﵁র ইসলাম গ্রহণে মুসলিমদের শক্তি-সামর্থ্য আরো দ্বিগুণ হয়ে গেলো। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন হামযা ﵁র ইসলাম গ্রহণের তিন দিন পর। তিনি একদিন নবী করীম ﷺকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বের হোন। পথিমধ্যে এক ব্যক্তির সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, হে উমার! কোথায় যাচ্ছ? তিনি বললেন, মুহাম্মাদকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। লোকটি বললো, মুহাম্মাদকে হত্যা করে হাশিম এবং যোহ্‌রা গোত্রের হাত থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে? উমার ﵁ বললেন, মনে হচ্ছে তুমিও সে

ধর্ম ত্যাগ করেছো, যে ধর্মে তুমি ছিলে। লোকটি বললো, হে উমার! একটি আজব কথা তোমাকে শুনাব না কি? তোমার বোন ও তার স্বামীও ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং সেই ধর্মকে ত্যাগ করেছে, যার উপর তুমি আছ। এ কথা শুনে তিনি ক্রোধে জ্বলে উঠলেন এবং সোজা ভগ্নীপতির গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন। সেখানে তখন খাব্বাব ইবনে আরাত ছিলেন। তাঁর সাথে ছিলো একটি সহীফা, যাতে ছিলো সূরা ত্বাহার অংশ যা তিনি (খাব্বাব ﷺ) তাদেরকে তালীম দিচ্ছিলেন। খাব্বাব ﷺ যখন সেখানে উমার ﷺর আগমন টের পেলেন, তখন তিনি বাড়ীর মধ্যে আত্ম- গোপন করলেন। আর ফাতিমা (উমারের বোন) সহীফা খানা লুকিয়ে দিলেন। কিন্তু উমার ﷺ বাড়ীর কাছাকাছি আসার সময় খাব্বাব ﷺর সহীফা পাঠ শুনতে পেয়েছিলেন। তাই তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদেরকে কি যেন পড়তে শুনলাম? তারা বললো, তেমন কিছুই না। আমরা আপসে কথাবার্তা বলছিলাম। উমার ﷺ বললেন, সম্ভবতঃ তোমরা উভয়েই ধর্ম ত্যাগ ক'রে বেদ্বীন হয়ে গেছো। তাঁর ভগ্নীপতি বললেন, আচ্ছা উমার বলতো, সত্য যদি তোমার ধর্ম ছাড়া কোন অন্য ধর্মে থাকে (তখন করণীয় কি হবে)? এ কথা শুনে তিনি জ্বলে উঠলেন এবং তাঁর ভগ্নীপতিকে নির্মমভাবে প্রহার করতে লাগলেন। তাঁর বোন এসে তাঁকে তাঁর স্বামী থেকে পৃথক করে দিলেন। তাঁকেও তিনি স্বীয় হাত দ্বারা আঘাত করলে তাঁর মুখম™ল রক্তাক্ত হয়ে গেলো। তখন তাঁর বোন ক্রোধ ও আবেগ জড়িত কণ্ঠে পাঠ করলেন, (أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ الله) তিনি তাঁর বোনের রক্তাক্ত মুখম™ল দেখে বড়ই লজ্জা পেলেন এবং বললেন, তোমাদের কাছে যে বইখানা রয়েছে সেটা দাও তো দেখি আমি পড়বো। তাঁর বোন বললো, তুমি অপবিত্র। আর পবিত্রজন ছাড়া এ বই কারো স্পর্শ করা চলে না। অতএব, তুমি আগে গোসল করো। তিনি উঠে গোসল করলেন এবং বই নিয়ে পড়তে লাগলেন। প্রথমেই তিনি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ ক'রে বললেন, নামগুলো অতীব সুন্দর ও পবিত্র। অতঃপর তিনি সূরা ত্বোহা পড়তে শুরু করলেন এবং ﴿إِنَّنِي أَنَا اللهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾ পর্যন্ত পাঠ ক'রে বললেন, এ তো বড়ই উত্তম এবং সম্মানিত কথা। আমাকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে নিয়ে চলো। উমার ﷺর এ কথা শুনে খাব্বাব ﷺ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, সুসংবাদ শুনে নাও হে উমার! আমি আশা করি এটা হলো তোমার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে দুআ করেছিলেন তারই ফল। কারণ, তিনি ﷺ (দুআই) বলেছিলে, ((اللَّهُمَّ أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام)) (হে আল্লাহ! উমার ইবনে খাত্তাব অথবা আবূ জেহেল ইবনে হিশামের দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করে দাও!)

অতঃপর উমার ﷺ তাঁর তরবারী (হাতে) নিয়ে সেদিকে যাত্রা করলেন যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ আছে। সেখানে পৌঁছে তিনি দরজায় করাঘাত করলেন। দরজার ফাঁক দিয়ে এক ব্যক্তি কোষবদ্ধ তলোয়ার সহ উমার ﷺকে দেখতে পেলেন। সে অন্যদেরকে তাঁর আগমন বার্তা জানিয়ে দিলে লোকদের মাঝে অস্থিরতা দেখা দিলো। নবী করীম ﷺ বাড়ীর ভিতরে ছিলেন। হামযা ﷺ লোকদের লক্ষ্য ক'রে বললেন, কি ব্যাপার, কি হয়েছে? তারা উত্তরে বললো, উমার এসেছেন। তিনি (হামযা ﷺ) ঠিক আছে তার জন্য দরজা খুলে দাও। সে যদি সদিচ্ছা এবং কল্যাণ লাভের জন্য এসে থাকে, আমরাও তার জন্য তা ব্যয় করবো। আর যদি সে কোন খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে এসে থাকে, তাহলে তারই তরবারী দিয়ে তাকে আমরা হত্যা করবো। এরপর উমার ﷺ ভিতরে প্রবেশ ক'রে ইসলাম গ্রহণ করার ঘোষণা দিলেন। এতে বাড়ীতে উপস্থিত সকলে এমনভাবে 'আল্লাহু আকবার' বলে উঠলেন যে, মসজিদে বিদ্যমান সকলে তা শুনতে পেলো।

সোহাইব রূমী ﷺ বলেন, যখন উমার ﷺ ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন ইসলামের বিকাশ ঘটলো। প্রকাশ্যে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা সম্ভব হলো। আমরা গোলাকার হয়ে আল্লাহর ঘরের পাশে বসতে এবং তার তাওয়াফ করতে পারলাম।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেদিন উমার ﷺ ইসলাম গ্রহণ করেন, সেদিন হতে আমরা শক্তিশালী হয়েছিলাম।

মুশরিকদের নবী করীম ﷺকে প্রলোভনে ফেলার প্রচেষ্টা

মুশরিকরা যখন দেখলো যে, মানুষ অধিকহারে ইসলামে প্রবেশ করছে এবং তাদেরকে ইসলাম থেকে বাধা দেওয়ার তাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা কোনই কাজে আসছে না, তখন তারা অন্য এক উপায় বের করলো যার মাধ্যমে তারা নবী করীম ﷺকে ইসলামের প্রচার এবং তার প্রতি আহ্বান করা হতে বিরত রাখবে। তাই মক্কার সর্দারগণের অন্যতম সর্দার উতবা ইবনে রাবীয়া নবী করীম ﷺ কাছে গেলো যখন তিনি ﷺ মসজিদে একাই বসেছিলেন। সে বললো, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি তোমার গোত্রের লোকদের নিকট এমন ধরনের এক বড় ব্যাপার নিয়ে এসেছো যে, তার দ্বারা তুমি তাদেরকে বিভক্ত করে দিয়েছো। তাদের উপাস্য ও ধর্মের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ ক'রে তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে কাফের সাব্যস্ত করেছো। আমি কয়েকটি কথা তোমার কাছে পেশ করছি তা তুমি ভালোভাবে শুনো। হতে পারে কোন কথা তোমার ভালো লাগবে এবং তা তুমি গ্রহণ করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আবূল ওয়ালীদ বলো আমি শুনছি।" আবূল ওয়ালীদ বললো, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! এই যে বিষয় তুমি নিয়ে এসেছো, এ থেকে তোমার উদ্দেশ্য যদি হয় ধন-সম্পদ অর্জন করা, তাহলে আমরা তোমার জন্য এত বেশী ধন-সম্পদ একত্রিত করে দিবো যে, তুমি আমাদের মধ্যে সব চেয়ে বড় ধনী হবে। আর যদি এর দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য হয় মর্যাদা-সম্মান অর্জন করা, তবে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বানিয়ে দিবো এবং তোমাকে ছাড়া অন্য কারো কাছে কোন সমস্যার সমাধান গ্রহণ করবো না। আর যদি এর দ্বারা তুমি রাজা-বাদশাহ হতে চাও, তাহলে তোমাকে আমরা আমাদের সম্রাট মেনে নিবো। অথবা তোমার কাছে যে আসে সে যদি কোন জ্বিন বা ভূত-প্রেত হয় যাকে তুমি দেখো কিন্তু তাকে তোমার থেকে দূর করতে পারো না, তবে চিকিৎসকদের নিয়ে এসে তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করাবো এবং তোমার সুস্থতার জন্য যত অর্থের প্রয়োজন হবে তা আমরা ব্যয় করবো। উতবা একনাগারে তার কথা বলতে থাকলো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তা শুনতে থাকলেন। যখন সে তার কথা শেষ করলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আবূল ওয়ালীদ! তোমার বলা কি শেষ হয়েছে?" সে বললো, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এখন আমার কথা শোন।" সে বললো, ঠিক আছে শুনবো। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পড়তে শুরু করলেন,

﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، حم، تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، بَشِيراً وَنَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ﴾ (فصلت:)

(সেই আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু।

হা-মীম। এটা অবতীর্ণ পরম করুণাময়, অসীম দয়ালুর পক্ষ হতে। একটা (এমন) একটি কিতাব যার আয়াতগুলো বিশদভাবে বিবৃত, এ কুরআন আরবী ভাষায় জ্ঞানী লোকদের জন্য। সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী, অথচ তাদের অধিকাংশরাই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তারা শুনে না।) রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঠ করতে থাকেন আর উতবা তার হাত দু'টি পিছনে মাটির উপর রেখে তাতে ভর দিয়ে নীরবে তা শুনতে থাকে। এইভাবে পাঠ করতে করতে তিনি সাজদার আয়াতে পৌঁছে সাজদা করলেন। অতঃপর বললেন, "আবূল ওয়ালীদ! তোমার যা শোনার ছিলো তা শুনেছো এখন তুমি জানো ও তোমার কর্ম।" অতঃপর উতবা সেখান থেকে উঠে তার সাথীদের কাছে চলে গেলো। তাকে আসতে দেখে মুশরিকরা আপসে বলাবলি করতে

লাগলো, আল্লাহর শপথ! আবূল ওয়ালীদ সেই মুখ নিয়ে আসছে না যে মুখ নিয়ে সে গিয়ে ছিলো। যখন সে তাদের কাছে গিয়ে বসলো, তখন তারা জিজ্ঞেস করলো, আবূল ওয়ালীদ! তোমার পিছনের খবর কি? সে বললো, পিছনের খবর হলো এই যে, আমি এমন কথা শুনলাম, আল্লাহর শপথ এ রকম কথা কোন দিন শুনিনি। আল্লহর শপথ! তা যাদুও নয়, কবিতাও নয় এবং কোন গণকের কথাও নয়। হে কুরাইশগণ! আমার কথা মেনে নিয়ে তাঁকে (নবীকে) তাঁর অবস্থাতেই ছেড়ে দাও। আল্লাহর শপথ! আমি যে বাণী শুনলাম তার দ্বারা অতিশয় কোন গুরুতর ব্যাপার সংঘটিত হবে। যদি তাঁকে কোন আরব হত্যা করে ফেলে, তবে তো তোমাদের কাজটা অন্যের দ্বারাই সম্পন্ন হয়ে যাবে। আর তিনি যদি আরবদের উপর বিজয়ী হোন, তবে তাঁর রাজত্ব প্রকৃতপক্ষে তোমাদেরই রাজত্ব হবে। তাঁর শক্তি তোমাদেরই শক্তি হবে এবং তাঁর মাধ্যমে তোমরাই সর্বাধিক সৌভাগ্যবান হবে। (ওয়ালীদের মুখ থেকে এ কথা শুনে) তারা বললো, আল্লাহর শপথ! হে আবূল ওয়ালীদ! তিনি তাঁর জবান দ্বারা তোমাকে যাদু করেছে। সে বললো, তাঁর ব্যাপারে আমার এটাই অভিমত, এখন তোমাদের যা করার করো।

হাবশার দিকে হিজরাত

যাঁর ইসলামের কথা ফাঁস হয়ে যেত, তিনি মুশরিকদের নিপীড়নের সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতেন। বিশেষতঃ দুর্বল মুসলিমরা। তাই সাহাবাগণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর নিকট নিজেদের দ্বীন সহ হাবশায় (ইথিওপিয়া) হিজরত করার অনুমতি চাইলেন। সেখানে তাঁদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ছিলো। বিশেষতঃ অনেক মুসলিম নিজের জান ও পরিবার বর্গের উপর কুরাইশদের যুলুমের ভয় করছিলেন। কাজেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁদেরকে অনুমতি দিলেন। নবূওয়াতের ৫ম বছরে প্রায় ৭০জন মুসলিম সপরিবারে হিজরত করেন। তাঁদের মধ্যে উসমান ইবনে আফফান ও তাঁর স্ত্রী রুকাইয়্যাও ছিলেন। এ দিকে কুরাইশরা ইথিওপিয়ায় হিজরত কারীদের অবস্থান ব্যাহত করার চেষ্টা করে। সে দেশের রাজার জন্য পাঠায় উৎকোচ। পলায়নকারীদের (মুহাজির) তাদের নিকট ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানায়। তারা তাঁকে (রাজাকে) এ কথাও বলে যে, মুসলিমরা ঈসা (আঃ) ও মরিয়াম সম্পর্কে অপমানকর ও অশিষ্ট বাক্য ব্যবহার করে। নাজ্জাশী তাদেরকে ঈসা (আলাইহিস্‌সালাম) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা সুস্পষ্টভাবে কুরআন ঈসা (আলাইহিস্‌সালাম) সম্পর্কে যা বলেছে, তা পরিষ্কার ক'রে বলে দেন এবং সত্যটি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন। তাঁর সামনে সূরা মারিয়ামের তেলাওয়াত করেন। ফলে তিনি তাঁদেরকে নিরাপত্তা দান করেন এবং তাঁদেরকে কুরাইশদের হাতে সমর্পন করতে অস্বীকার করেন।

এ বছরের রমযান মাসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) হারাম শরীফে মানুষের কাছে যান। তিনি দাঁড়িয়ে তাদের সামনে সুরায়ে নাজ্‌ম তেলাওয়াত করতে লাগেন। সেখানে কুরাইশদের এক বিরাট দল ছিলো। এ সব কাফেররা ইতিপূর্বে কখনো আল্লাহর বাণী শুনেনি। কেননা তারা রাসূলের কিছুই না শুনার পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছিলো। অকস্মাৎ তেলাওয়াতের মধুর ধ্বনি তাদের কর্ণে গেলে তারা আল্লাহর হৃদয়গ্রাহী চিত্তাকর্ষক বাণী ও সাবলীল ভাষা একাগ্রচিত্তে শুনে। সে সময় তাদের অন্তরে তা ছাড়া অন্য কিছুই ছিলো না। এক পর্যায়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) ﴿فَاسْجُدُوا لله واعْبُدُوا﴾ আয়াতটি পড়ে সাজদায় চলে যান। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে তারাও সাজদায় চলে যায়।

কুরাইশরা দাওয়াত দমন করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে। শাস্তি, নির্যাতন, নিপীড়ন, প্রলোভন ও হুমকি প্রদর্শনের মতো সর্ব প্রকার পন্থা গ্রহণ করে। কিন্তু এসব কু-পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা মুসলিমদের ঈমান বৃদ্ধি ও দ্বীন ইসলামকে অধিকতর আঁকড়ে ধরা ছাড়া আর কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। এখন এক নতুন দুরভিসন্ধি ও মন্দ অভিপ্রায় তাদের অন্তরে জন্ম নিলো। আর তা হচ্ছে মুসলিম ও বনী হাশেমকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন ও একঘরে করে রাখার এক চুক্তিনামা লিখে সবাই তাতে স্বাক্ষর করে কাবাশরীফের অভ্যন্তরে ঝুলিয়ে

দেবে। চুক্তি অনুসারে তাদের সাথে বেচা-কেনা, বিয়ে-শাদি, সাহায্য-সহযোগিতা ও লেন-দেন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকবে। এ চুক্তির ফলে মুসলিমরা বাধ্য হয়ে মক্কা থেকে বের হয়ে (শে'বে আবি তালেব নামক) এক উপত্যকায় গিয়ে আশ্রয় নেন। তাঁরা সেখানে অবর্ণনীয় ক্লেশ ও দুঃখের শিকার হোন। ক্ষুধা ও অর্ধাহারের বিষাক্ত ছোবল থেকে কেউ রক্ষা পায়নি। স্বচ্ছল ও সামর্থ্যবান ব্যক্তিরা নিজেদের সমস্ত ধন-সম্পদ ব্যয় করে ফেলেন। খাদীজা তাঁর সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করেন। বিভিন্ন রোগ ছড়িয়ে পড়লো। অধিকাংশ লোকই মৃত্যুর প্রায়-দ্বার প্রান্তে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু তাঁরা ধৈর্য অবিচলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তাঁদের মধ্যে একজনও পশ্চাদপদ হননি। অবরোধ একাধারে তিন বছর স্থায়ী রইল। অতঃপর বানী হাশেমের সাথে আত্মীয়তা আছে এমন কিছু শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি জনসমাবেশে চুক্তি ভঙ্গ করার কথা ঘোষণা করে। চুক্তির কাগজ বের করা হলে দেখা গেলো যে উইপোকা সেটা খেয়ে ফেলেছে। শুধুমাত্র কাগজের এক কোণ যেখানে "বিসমিকা আল্লাহুম্মা" বাক্যটি ব্যতীত কোন স্থানই অক্ষত ছিলো না। সংকটের অবসান হল। আর মুসলিম ও বানী হাশেম মক্কায় ফিরে আসলেন। কিন্তু কুরাইশরা মুসলিমদের দমন ও মুকাবিলায় সেই রকমেরই জঘন্য আচরণ অব্যাহত রেখে ছিলো। তারা লোকদেরকে নবী করীম ﷺ-এর সাথে মিলতে এবং কুরআন শুনতে দিতো না। যে আরবই তাদের কাছে আসতো তাকে তারা (নবীর ব্যাপারে) সাবধান করে দিতো। যেমন, তুফাইল ইবনে আম্‌র আদ্দাউসী ﵁ থেকে বর্ণিত। তিনি নিজের ব্যাপারে বললেন যে, তিনি মক্কায় এলে কুরাইশদের কিছু লোক তাঁর কাছে আসে। তুফাইল ﵁ তাঁর গোত্রের গণ্য-মান্য ব্যক্তি ছিলেন। তারা তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সাবধান করে এবং তাঁর কাছে যেতে ও তাঁর কাছে থেকে কিছু শুনার ব্যাপারে ভয় দেখায়। তারা বললো যে, তাঁর কথার মধ্যে এমন যাদু আছে যে, তার দ্বারা পিতা ও পুত্রের মধ্যে, ভাই ও ভাইয়ের মধ্যে এবং স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যায়। তুফাইল ﵁ বলেন, আল্লাহর শপথ! তারা আমাকে বরাবর বুঝাতে থাকলো। অবশেষে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, তাঁর কাছ থেকে কিছুই শুনবো না এবং তাঁর সাথে কথাও বলবো না। এমনকি আমি আমার কানের ভিতরে তুলো প্রবশ করিয়ে নিলাম যাতে তাঁর কোন কথা আমার কর্ণগোচর না হয়।

অতঃপর আমি মসজিদে হারামে গেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। আমি তাঁর কাছাকাছি দাঁড়ালাম। হয়তো আল্লাহর ইচ্ছা এটাই ছিলো আমাকে তাঁর কোন কথা শুনাবেন। আমি অতি সুন্দর কথা শুনলাম। আমি মনে মনে বললাম, আমি তো একজন বুদ্ধিমান মানুষ ও কবি। আমার কাছে ভালোমন্দ গোপন থাকে না। অতএব তাঁর কাছ থেকে শুনতে আমার বাধা কিসের? যদি তাঁর কথা-বার্তা ভালো হয়, গ্রহণ করে নিবো। আর যদি মন্দ হয়, তবে তা বর্জন করবো। আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম। অবশেষে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাড়ীর পথ ধরলেন, আমিও তাঁর পিছনে পিছনে যাত্রা করলাম। যখন তিনি বাড়ীতে প্রবেশ করলেন, আমিও প্রবেশ করলাম। তারপর বললাম, হে মুহাম্মাদ! তোমার জাতির লোকেরা আমাকে এই এই কথা বললো। আল্লাহর শপথ! তারা আমাকে বরাবর ভয় দেখিয়ে গেলো। পরিশেষে আমি আপনার কোন কথা না শুনার জন্য কানে তুলো প্রবেশ করিয়ে নিলাম। কিন্তু আল্লাহ আপনার কথা আমাকে শুনাতে চাইলেন। তাই অতি উত্তম কথা আমি শুনলাম। এখন আপনার বক্তব্য পেশ করুন! তিনি আমার নিকট ইসলামের কথা পেশ করলেন এবং আমাকে কুরআন পড়ে শুনালেন। আল্লাহর শপথ! এর চাইতে উত্তম কথা এবং ইনসাফের বানী আমি ইতিপূর্বে কখনোও শুনেনি। অতঃপর আমি ইসলাম গ্রহণ ক'রে সত্যের সাক্ষ্য দিলাম। অতঃপর তুফাইল ﵁ তাঁর গোত্রের লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকেও ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালো এবং ইসলাম কি তা তাদের কাছে বর্ণনা করলো। ফলে তাঁর পরিবারের লোক ইসলাম গ্রহণ করলো এবং তাঁর গোত্রে ইসলাম সম্প্রসারিত হলো।

দুঃখের বছর

কঠিন রোগ ব্যাধি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর চাচা আবূ তালেবের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে

যায়। সে মৃত্যু শয্যায় শায়িত হয়ে পড়ে। মুমূর্ষাবস্থায় যখন সে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর তখন রাসূল তার মাথার পার্শ্বে বসে মৃত্যুর পূর্বে তাকে কালেমায়ে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ার অনুরোধ জানান। কিন্তু আবূ জেহেল সহ অসৎ সঙ্গীরা যারা তার পার্শ্বে ছিল, তাকে বাধা দিয়ে বললো, শেষমূহূর্তে পূর্ব পুরুষের ধর্ম ত্যাগ করবে? আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে? শেষ পর্যন্ত সে মুশরিক হয়েই মারা গেলো। চাচার কাফের হয়ে মৃত্যু বরণ করার ফলেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর দুঃখ দ্বিগুণ বেড়ে যায়। আবূ তালেবের মৃত্যুর প্রায় দু'মাস পরে হযরত খাদীজা (রাযীআল্লাহু আনহা) ওফাত বরণ করেন। ফলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) অত্যন্ত চিন্তিত হোন।তাঁর চাচা আবূ তালিব এবং স্ত্রী খাদীজা (রাযীআল্লাহু আনহার)র মৃত্যুর পরে কুরাইশের ঔদ্ধত্য ও উপদ্রব আরো বেড়ে যায়।

যাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াতে সাড়া দিয়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন দুর্বল শ্রেনীর লোক ও ক্রীতদাস। আর সাধারণতঃ এই ধরনের লোকেরাই নবীদের ডাকে সাড়া দেয়। কারণ, অন্যের আনুগত্য শিকার করতে তাদের জন্য কঠিন হয় না। পক্ষান্তরে বড়রা এবং মর্যাদা ও আধিপত্যের অধিকারী ব্যক্তিবর্গদের কাছে তা কঠিন হয়। তাদের অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ এবং মর্যাদা ও পদের লোভ সাধারণতঃ তাদেরকে অপরের আনুগত্য শিকার করতে বাধা দেয়।

দাওয়াতের পথে বাধা দেওয়ার মুশরিকদের বিভিন্ন ধারা

দাওয়াতের পথে বাধা দেওয়ার জন্য এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারের কাজ বন্ধ করার জন্য মুশরিকরা নানামুখী পন্থা অলবম্বন করে। লোকদেরকে ইসলাম থেকে বিরত রাখার জন্য তারা বহু উপায়-উপকরণ গ্রহণ করে। তার মধ্যে হলো,

১। ধমক ও হুমকি

কুরাইশ সর্দারদের একটি দল নবীর চাচা আবূ তালিবের কাছে গিয়ে বলে, মুহাম্মাদ আমাদের কষ্ট দেয় এবং আমাদের উপাস্যদের সম্পর্কে মন্দ মন্তব্য করে, অতএব আপনি তাকে এ থেকে বাধা দিন। তিনি (আবূ তালিব) তাঁকে ডেকে পাঠান এবং বলেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমার চাচার গোত্রের লোকেরা মনে করে যে, তুমি তাদেরকে কষ্ট দাও এবং তাদের উপাস্যদের সম্পর্কে মন্দ মন্তব্য করো। অতএব এ থেকে তুমি বিরত থাকো। রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যের দিকে ইঙ্গিত ক'রে বললেন, "তোমাদের জন্য এটা আমি ত্যাগ করতে পারি না, যদিও ঐ সূর্য থেকে একটি অগ্নিশিখা আমার জন্য এনে দাও।" এ কথা শুনে আবূ তালিব বললেন, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মিথ্যা বলেনি। অতএব তাঁকে তাঁর অবস্থায় ছেড়ে দাও।

২। বাতিল আপবাদ

তারা নবী করীম ﷺ-এর উপর পাগল, যাদুকর এবং মিথ্যুক হওয়ার অপবাদ দিয়েছিলো। আর এ অপবাদও দিয়েছিলো যে, তিনি যা নিয়ে এসেছেন, তা হলো পূর্ববর্তীদের কিচ্ছা-কাহিনী।

৩। ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও হাসাহাসি

বেশীরভাগ তারা নবী করীম ﷺ এবং তাঁর সাথীদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। যখনই তাঁরা তাদের পাশ দিয়ে যেতেন, তখন তারা তাঁদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং নবী করী ﷺ-এর ব্যাপারে কটুক্তি করতো।

৪। তাঁর শিক্ষার বিকৃতি, সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি এবং মিথ্যা প্রচার

তারা এই প্রচার করতো যে, কুরআন হলো পূর্ববর্তীদের কিচ্ছা- কাহিনী। অনুরূপ তারা এ কথা বলতো যে, তাঁকে (নবীকে) যে শিক্ষা দেয়, সে হলো একজন মানুষ।

৫। রাসূলুল্লাহ ﷺকে কষ্ট দেওয়া

বিগত উপায়-উপরকণ যখন নবী করীম ﷺকে ও তাঁর সাথীদেরকে দ্বীন থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে ফলপ্রসূ হলো না, তখন কুরাইশরা শারীরিক কষ্ট দেওয়ার পন্থা অবলম্বন করলো। যেমন, উক্ববা ইবনে আবূ মুয়ীত নবী করীম ﷺ-এর কাছে এলো যখন তিনি ﷺ নামায পড়ছিলেন এবং স্বীয় চাদর তাঁর (নবী করীম ﷺ-এর) গর্দানে জড়িয়ে সজোরে টান দিলো। পিছন থেকে আবূ বাকার ﷺ এসে তাকে তাঁর থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললেন, তোমরা এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও, যিনি বলেন, আমার প্রতিপালক আল্লাহ এবং তিনি তাঁর প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে প্রমাণাদিও নিয়ে এসেছেন। অনুরূপ একদা যখন তিনি ﷺ হারাম শরীফে নামাম পড়ছিলেন এবং আবূ জেহেল ও তার সাথী-সঙ্গীরা বসেছিলো। আবূ জেহেল বললো, কে আছে তোমাদের মধ্যে এমন যে অমুক গোত্রের উঁটের ভুঁড়ি আনতে পারবে এবং মুহাম্মাদ যখন সেজদায় যাবে, তখন তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দিবে। তাদের একজন গিয়ে তা এনে নবী করীম ﷺ-এর সাজদারত অবস্থায় থাকাকালীন তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যেখানে চাপিয়ে দিলো। অতঃপর তারা আপসে হাসতে হাসতে একে অপরের উপর লুটিয়ে পড়লো। নবী করীম ﷺ-এর মেয়ে ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এসে তা তাঁর পীঠ থেকে সরিয়ে দিলেন।

একদা আবূ জেহেল বললো, যদি মুহাম্মাদকে আবার নামায পড়তে দেখি, তাহলে তাঁর ঘাড়কে পদতলে পিষ্ঠ করে দিবো এবং তাঁর মুখমন্ডলে মাটি লেপে দিবো। অতঃপর একদিন যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়ছিলেন, সে তাঁর ঘাড় পিষ্ঠ করার নিয়তে অগ্রসর হয়, কিন্তু আকস্মিকভাবে সে পশ্চাদপসরণ শুরু করে এবং দুই হাত দিয়ে বাঁচার প্রচেষ্টা চালায়। উপস্থিত লোকেরা বললো, আবূল হাকাম! তোমার ব্যাপার কি? সে বললো, আমার ও তাঁর মাঝে আগুনের গর্ত রয়েছে।

৬। তাঁর সাথীদের কষ্ট দেওয়া

তারা নবী করীম ﷺ-এর সাথীদের উপরও চালাতো নির্মম অত্যাচার এবং তাঁদেরকে বিভিন্নভাবে নিপীড়িত করতো। কোন কোন ক্রীতদাসকে বেঁধে প্রখর রোদে ফেলে রাখতো এবং তাঁর উপর চালাতো নানা প্রকারের নির্যাতন। আম্মার ও তাঁর পিতা-মাতার উপর চালায় বিভিন্ন প্রকারের উৎপীড়ন। কঠিন আযাবে অসহ্য হয়ে তাঁর পিতা শহীদ হোন। খাব্বাব ইবনে আরাত ﷺকে তাঁর চুল ধরে টেনে নিয়ে বেড়াতো এবং উত্তপ্ত পাথরের উপর তাঁকে রেখে দিয়ে তাঁর উপর চাপিয়ে দিতো ভারী পাথর। অনুরূপ উমার ইবনে খাত্তাব ﷺ যখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তখন তাঁর উপরও নির্যাতন চালিয়ে ছিলো এবং তাঁকে হত্যা করার প্রচেষ্টা নিয়েছিলো।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)তায়েফে

কুরাইশের ধৃষ্টতা এবং মুসলিমদের প্রতি তাদের নির্যাতন ও নিপীড়নের নীতি অব্যাহত থাকার পর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তায়েফ গমনের সিদ্ধান্ত নেন। হতে পারে আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত দান করবেন। তায়েফ গমন সহজ ব্যাপার ছিল না। আকাশ চুম্বি উচুঁ উচুঁ পাহাড়ের কারণে পথ ছিল দুর্গম। তায়েফবাসীরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর সাথে সর্বাপেক্ষা মন্দ আচরণ করে। তারা তাঁর (রাসূলের) কথা তো শুনলোই না, বরং তাঁকে বিতাড়িত করে এবং শিশু ও কিশোরদেরকে তাঁর পিছনে লেলিয়ে দেয়। ফলে তারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর উপর প্রস্তর নিক্ষেপ ক'রে তাঁর গোড়ালীকে করে রক্তে রঞ্জিত। তিনি ভীষণ দুঃখিত হয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হোন। পথি মধ্যে জিবরীল (আলাইহিস্ সালাম) পাহাড়ের দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেশতাসহ এসে বলেন, আল্লাহ পাহাড়ের দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেশতাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনি যা ইচ্ছা নির্দেশ দিতে পারেন। ফেরেশতা আরজ করলো, হে মুহাম্মাদ! আপনি যদি চান আমি তাদের উপর আখসাবাইন (মক্কাকে ঘিরে রাখা দুই পাহাড়) চেপে দিবো। তিনি

বললেন, বরং আমি আশা করি আল্লাহ তাদের বংশ থেকে এমন লোক সৃষ্টি করবেন, যারা শুধুমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন শরীক স্থাপন করবে না।

চন্দ্র দু'টুকরো হওয়া

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর সাথে মুশরিকদের বহু দ্বন্দ্বের মধ্যে এও ছিলো যে, তারা অনেক সময় রাসূলকে অপারগ, অক্ষম সাব্যস্ত করার ফন্দিতে বিভিন্ন অলৌকিক নিদর্শন দেখানোর দাবী করতো। আর এ ধরণের দাবী বারংবার উত্থাপন করেছে তারা। এক বার চন্দ্রকে দু'টুকরো করার দাবী জানায়,রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আল্লাহর কাছে দুআ করলে তাদেরকে চন্দ্র দু'টুকরো করে দেখানো হয়। কুরাইশরা এ নিদর্শন দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দেখতে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ঈমান আনায়ন করেনি। বরং তারা বলে, মুহাম্মাদ আমাদেরকে যাদু করেছে। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি বললো, আমাদেরকে যাদু করলেও সব মানুষকে তো আর যাদু করতে পারবে না। বহিরাগত মুসাফিরদের অপেক্ষা করো। বিভিন্ন মুসাফির আসলে জিজ্ঞেস করা হয় এবং তারা বলে, হ্যাঁ আমরাও দেখেছি।কিন্তু কুরাইশরা নিজেদের কুফরে জেদ ধরে রয়ে গেলো।

ইসরা-মিরাজ

তায়েফ থেকে তায়েফবাসীদের রূঢ় ও অমানবিক আচরণ লাভের পর যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) সেখান থেকে ফিরে এলেন এবং আবূ তালিব ও খাদীজার মৃত্যু সহ কুরাইশের অত্যাচার যখন বহু গুণে বৃদ্ধি পেলো, তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর অন্তরে একাধিক চিন্তা একত্রিত হলো। তাই মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে শোকাহত ও দুঃখে কাতর নবীর সান্ত্বনা আসলো। কোন এক রাতে যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) নিদ্রারত ছিলেন, জিবরীল বুরাক নিয়ে আসেন। বুরাক ঘোড়া সদৃশ এক জন্তু যার দু'টি দ্রুতমান পাখা আছে এবং তার গতি বিদ্যুতের ন্যায়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে তাতে আরোহণ করানো হয় এবং জিবরীল তাকে ফিলিস্তীনে বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রথমে নিয়ে যান। অতঃপর সেখান থেকে আসমান পর্যন্ত নিয়ে যান। এ ভ্রমণে তিনি পালনকর্তার বড় বড় অনেক নিদর্শন পরিদর্শন করেন। আসমানেই পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করা হয়। তিনি একই রাত্রে তুষ্ট মন ও সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে মক্কায় প্রত্যাগমন করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الاسراء:١]

অর্থাৎ, "পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত-যার চারদিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি-যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয় তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল।" (সূরা ইসরাঃ ১)

ভোর বেলায় কা'বাশরীফে গিয়ে তিনি লোকদেরকে একথা শুনালে কাফেরদের মিথ্যা অভিযোগ ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ আরো বেড়ে যায়। উপস্থিত কয়েকজন লোক তাঁকে বাইতুল মুকাদ্দাসের বিবরণ দিতে বলে। মূলতঃ উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে অপারগ ও অক্ষম প্রমাণিত করা। তিনি তন্ন তন্ন করে সব কিছু বলতে লাগলেন। কাফেররা এতে ক্ষান্ত না হয়ে বলে, আমরা আর একটি প্রমাণ চাই। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন, আমি পথে মক্কাগামী একটি কাফেলার সাক্ষাৎ পাই এবং তিনি কাফেলার বিস্তারিত বিবরণসহ উটের সংখ্যা ও আগমনের সময়ও বলে দিলেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) সত্যাই বলেছেন কিন্তু কাফেররা হঠকারিতা, কুফরী ও সত্যকে অস্বীকার করার দরুন উদভ্রান্ত রয়ে গেল। সকাল বেলায় জিবরীল এসে রাসূলকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পদ্ধতি ও সময়সূচী শিখিয়ে দিলেন। ইতিপূর্বে নামায শুধু সকাল বেলায় দু'রাকয়াত ও বিকেল বেলায় দু'রাকয়াত ছিলো।

কুরাইশরা সত্য অস্বীকার করতে থাকায় এ দিনগুলোতে তিনি মক্কায় আগমনকারী ব্যক্তিদের মাঝে দাওয়াতী তৎপরতা চালাতে লাগলেন। তিনি তাদের অবস্থান স্থলে মিলিত হয়ে ইসলাম পেশ করতেন এবং তাদের সামনে তার সুন্দর ব্যাখ্যা দিতেন। আবূ লাহাব তাঁর পিছনে তো লেগেই থাকতো। সে লোকদেরকে তাঁর ও তাঁর দাওয়াত থেকে সতর্ক থাকতে বলতো। একবার মদীনা থেকে আগত এক দলকে ইসলামের আহবান জানালে তাঁরা মনোযোগ দিয়ে শুনেন এবং তাঁর অনুসরণ ও তাঁর প্রতি ঈমান আনতে ঐক্যবদ্ধ হোন। মদীনাবাসীরা ইয়াহুদীদের কাছে শুনতো যে, অদূর ভবিষ্যতে এক নবী প্রেরিত হবেন। তাঁর আবির্ভাবের যুগ নিকটে এসে গেছে। তাঁদেরকে যখন তিনি ইসলামের দাওয়াত দেন,তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, তিনি সেই নবী, যাঁর কথা ইয়াহুদীরা বলেছে। তাঁরা সত্বর ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেন এবং বলেন ইয়াহুদীরা যেন আমাদের অগ্রগামী না হয়। তাঁরা ছিলন ৬জন পরবর্তী বছরে মদীনা থেকে ১২জন আসেন। তাঁরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাঁদেরকে ইসলাম শিক্ষা দেন। প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁদের সাথে তিনি মুসআব ইবনে উমাইরকে কুরআন ও দ্বীনের বিধানাবলী শিক্ষা দেয়ার জন্য পাঠান। মুসআব (রাঃ) মদীনায় বিরাট প্রভাব ফেলতে সক্ষম হোন। এক বছর পর তিনি যখন মক্কায় আসেন, তখন তাঁর সাথে ৭২ জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা ছিলন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁদের সাথে মিলিত হোন এবং তাঁরা দ্বীনের সহযোগিতা ও এর প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালনের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। অতঃপর তাঁরা মদীনায় ফিরে যান।

মদীনার দিকে হিজরত

মদীনা সত্য ও সত্যের ধারকদের আশ্রয়ে পরিণত হয়। মুসলিমরা সেদিকে হিজরত করতে লাগলেন। তবে কুরাইশরা ছিল মুসলিমদের হিজরত করতে বাধা দেয়া ও প্রতিরোধ সৃষ্টি করার জন্য বদ্ধপরিকর।ফলে কতিপয় মুহাজির বিভিন্ন প্রকার শাস্তি ও নির্যাতনের শিকার হোন। কুরাইশদের ভয়ে মুসলিমরা গোপনে হিজরত করতেন। আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর নিকট হিজরতের অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে বলেন, **"তাড়াহুড়া করো না। আশা করি আল্লাহ তোমার জন্য একজন সঙ্গী নির্দ্ধারণ করবেন।"** অধিকাংশ মুসলিমরা ইতিপূর্বে হিজরত করেছেন। মুসলিমদের হিজরত এবং মদীনায় তাঁদের একত্রিত হওয়া দেখে কুরাইশরা প্রায় উন্মাদ হয়ে পড়লো। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর দাওয়াতের উন্নতি ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভয় ও আশঙ্কা বোধ করলো। সবাই পরামর্শ করে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলো। আবূ জেহেল প্রস্তাব পেশ করল যে, প্রত্যেক গোত্রের এক একজন নির্ভীক যুবককে তরবারী দেয়া হবে। এরা মুহাম্মাদকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে এক যোগে আক্রমণ করে হত্যা করবে। ফলে তার খুনের অপরাধ বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে। বনীহাশেম এর পর সব কাবিলার সাথে লড়াই করার হিম্মত করবে না। আল্লাহ তাঁর নবীকে তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করে দেন। তিনি আল্লাহর অনুমতিক্রমে আবূ বাকরের সাথে হিজরত করার সিদ্ধান্ত নেন। রাতে আলী (রাঃ)কে নিজের বিছানায় শুয়ে থাকতে বললেন, যাতে লোকেরা মনে করে যে, রাসূল বাড়ীতেই আছেন। ইতিমধ্যে কাফেররা বাড়ী ঘেরাও করে ফেলেছে। বিছানায় আলীকে দেখে তাঁরা নিশ্চিত হয় যে, রাসূল (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বাড়ীতে আছেন এবং হত্যা করার জন্য তাঁর বের হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলো। এ দিকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বের হয়ে সবার মাথার উপর বালু ছিটিয়ে দিলে আল্লাহ তাদের দৃষ্টি শক্তি ছিনিয়ে নেন। ফলে তারা আঁচও করতে পারলো না যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বেরিয়ে গেলেন। অতঃপর আবূ বকর (রাঃ) সহ প্রায় পাঁচ মাইল অতিক্রম ক'রে "সওর নামক" এক গুহায় লুকিয়ে থাকেন। কুরাইশ যুবকেরা ভোর বেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করে। আলী (রাঃ) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-র বিছানা থেকে উঠলে তাদের হাতে পড়েন। তারা তাঁকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

অসাল্লাম) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি তাদেরকে কোনই খবর দেন নি। ফলে তারা তাঁকে মার-ধর ও তাঁকে নিয়ে টানাটানি করে। কিন্তু কোন ফল হয় নি। অতঃপর কুরাইশরা চতুর্দিকে লোক-জন পাঠিয়ে দেয়। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরে দিতে পারার জন্য ১০০টি উট পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। লোক-জন তাঁর অনুসন্ধানে সেই গুহার দ্বার প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যেখানে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) ও তাঁর সাথী লুকিয়ে আছেন। এমন কি যদি তাদের কেউ স্বীয় পায়ের দিকে একটু ঝুঁকে গুহার ভিতর তাকায়, তাহলে, তাঁদের দেখতে পায়। রাসূলের ব্যাপারে আবূ বাকারের (রাঃ) চিন্তা ও উদ্বেগ বেড়ে যায়। তা দেখে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন, "তুমি কি মনে করো আমরা দু'জন, বরং আমাদের সাথে তৃতীয়জন আল্লাহ আছেন। চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।" অনুসন্ধানকারীরা তাদের সন্ধান আর পেল না।

গুহায় তাঁরা তিন দিন অবস্থান ক'রে মদীনার পথে যাত্রা শুরু করেন। পথ ছিল সুদীর্ঘ ও দুর্গম। সূর্য ছিল অতীব উত্তপ্ত। দ্বিতীয় দিন বিকেল বেলায় এক তাঁবুর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, যেখানে উম্মে মা'বাদ নামে এক মহিলার তাঁবু ছিলো। তাঁরা তার কাছে খাবার ও পানি চাইলেন কিন্তু কিছুই পেলেন না। তবে একটি ছাগী এতই দুর্বল ছিল যে, ঘাস খেতে যেতে পারেনি। এক ফোঁটা দুধ তার স্তনে ছিল না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) স্তনের উপর তাঁর মুবারক হাত বুলিয়ে দিয়ে দুধ দোহন ক'রে এক বড় পাত্র ভরে নেন। উম্মে মা'বাদ এ অলৌকিক ঘটনা দেখে বিস্মিত ও বিহবল হয়ে পড়ে। সবাই পেটপুরে পান করেন। অতঃপর আর এক পাত্র ভরে উম্মে মা'বাদকে দিয়ে তিনি আবার যাত্রা শুরু করেন।

মদীনাবাসী এদিকে তাঁর শুভাগমনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। প্রতি দিন তাঁরা মদীনার বাইরে প্রতীক্ষায় থাকতেন। যে দিন তাঁর আগমন হয়, সে দিন সবাই পুলকিত হৃদয়ে তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানান। তিনি মদীনার নিকটে কুবা নগরীতে যাত্রা বিরতি করেন। সেখানে চার দিন অবস্থান করেন। তিনি এ সময়ে কুবা মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। আর এটাই ইসলামের প্রথম মসজিদ। ৫ম দিনে তিনি মদীনার পথে যাত্রা শুরু করেন। অনেক আনসারী সাহাবী রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে অতিথি হিসাবে বরণ ক'রে ধন্য হওয়ার চেষ্টা করেন এবং তার উটের লাগাম ধরেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁদের শুকরিয়া আদায় করে বলেন, **"উট ছেড়ে দাও, সে নির্দেশ প্রাপ্ত"**। আল্লাহর নির্দেশ যেখানে হল সেখানে গিয়ে উট বসে যায়। তিনি অবতরণ না করতেই উঠে সে অগ্রভাগে কিছু পথ চলে আবার পিছনে এসে প্রথম স্থানে বসে যায়। সেটাই ছিল মসজিদে নববীর স্থান। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আবূ আইয়্যুব আনসারীর অতিথি হোন। আলী ইবনে আবূ তালিব নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) হিজরতের পর তিন দিন মক্কায় অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর নিকট রক্ষিত মানুষের আমানত তাদের প্রাপকদের কাছে পৌঁছিয়ে দেন। অতঃপর কুবায় রাসূলের সাথে মিলিত হোন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাহু আলাইহি অসাল্লাম)মদীনায়

উট যেখানে বসে গিয়েছিলো সে জায়গাটি প্রকৃত মালিক থেকে কেনার পর সেখানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁর মসজিদ নির্মাণ করেন। মুহাজির (মক্কা থেকে আগত রাসূলের সাহাবী) ও আনসার (মুহাজিরদের সাহায্যকারী মদীনাবাসী)দের মধ্যে পবিত্র ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। প্রত্যেক আনসারীর জন্য একজন মুহাজির ভাই দেয়া হয়। সে তাঁর ধন-সম্পদের অংশীদার হত। মুহাজির ও আনসারী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেন। ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক গভীর ও সুদৃঢ় হয় এবং মদীনায় ইসলাম সম্প্রসারিত হতে লাগে। কিছু ইয়াহুদী ইসলাম গ্রহণ করে। ইয়াহুদীদের মধ্যে থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলো, তাদের মধ্যে একজন হলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ﵁। তিনি ছিলেন তাদের পন্ডিত এবং তাদের বড় বড় সর্দারদের একজন।

মক্কা থেকে মুসলিমদের হিজরত করার পরও মক্কার কাফেররা তাঁদেরকে ইসলাম থেকে বাধা দানের পথ থেকে সরে দাঁড়ায়নি। যেহেতু মদীনার ইয়াহুদীদের সাথে কুরাইশদের সম্পর্ক ছিল। তারা তাদের (ইয়াহুদীদের) দ্বারা মুসলিদের মাঝে বিশৃংখলা, নৈরাজ্য ও কলহ-বিবাদ সৃষ্টির পাঁয়তারা চালাতো। কুরাইশরা মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করার হুমকিও প্রদর্শন করতো। এ ভাবে বিপদ ও আশঙ্কা মুসলিমদেরকে ভিতর ও বাহির থেকে ঘিরে ছিল। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, সাহাবায়ে কেরাম রাতে ঘুমাবার সময় অস্ত্র রাখতে বাধ্য হোন।এমন বিপজ্জনক ও বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে আল্লাহ ত'য়ালা সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি দেন। তাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) শত্রুদের তৎপরতা জানার লক্ষ্যে সামরিক মিশন চালানো আরম্ভ করেন। অনুরূপ শত্রুদের উপর চাপ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তাদের বাণিজ্যিক কাফেলার পিছু নিতে ও তাতে প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে লাগলেন, যাতে তারা মুসলিমদের শক্তির কথা উপলব্ধি করে শান্তি ও সন্ধি প্রক্রিয়ায় এসে ইসলাম প্রচারের স্বাধীনতায় ও তা বাস্তবায়নে কোন ধরণের বিঘ্ন না ঘটায়। এমন কি কতিপয় গোত্রের সাথে মৈত্রী চুক্তি ও দ্বি-পাক্ষিক চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়।

বদরের যুদ্ধ

মক্কার মুশরিকরা মুসলিমদের উপর সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে এবং তাঁদের উপর এমন নির্যাতন ও নিপীড়ন চালায় যে, তাঁরা তাঁদের শহর মক্কা থেকে হিজরত করতে বাধ্য হোন। তাঁরা নিজেদের মাতৃভূমি এবং ধন-সম্পদ ত্যাগ করেন। তাঁদের ছেড়ে আসা ধন-সম্পদ মুশরিকদের হাতে চলে যায়। একবার তিনি কুরাইশের এক বাণিজ্যিক কাফেলার পথ রোধ করার পরিকল্পনা নিয়ে তিন শত তের জন সাথী সহ বের হোন। তাঁদের সাথে২টি ঘোড়া ৭০টি উট ছাড়া কিছুই ছিলো না। আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলায় উট ছিলো ১০০০ এবং ৪০ জন লোক। আবূ সুফিয়ান মুসলিমদের বের হওয়ার ব্যাপারটা জেনে যায়। তাই জরুরী ভিত্তিতে এক লোক পাঠিয়ে মক্কায় খবর দেয় এবং সাহায্যের আবেদন জানিয়ে রাস্তা পরিবর্তন ক'রে অন্য পথ ধরে। ফলে মুসলিমরা তাদেরকে ধরার সফলতা থেকে বঞ্চিত হোন। অন্য দিকে কুরাইশরা এ খবর পেয়ে ১০০০ যোদ্ধা নিয়ে বের হয়ে পড়ে। আবূ সুফিয়ানের দূত এসে তাদেরকে কাফেলার নিরাপদে ফিরে আসার খবর জানিয়ে মক্কায় ফিরে যাবার অনুরোধ জানায়। কিন্তু আবূ জেহেল ফিরে যেতে অস্বীকার করে এবং যোদ্ধারা বদর নামক স্থান পর্যন্ত যাত্রা অব্যাহত রাখে।

কুরাইশদের বের হবার কথা জেনে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) সাহাবায়ে কেরামদের সাথে পরামর্শ করলে সবাই কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত প্রকাশ করেন। হিজরী ২য় সনে রমযান মাসের কোন এক প্রভাতে উভয়দল মুখোমুখি হয় এবং তুমুল যুদ্ধ চলে। মুসলিমরা বিপুল ভাবে জয়লাভ করেন। তাদের মধ্যে ১৪জন শাহাদতের অমিয় সুধা পান করেন।৭০ জন কাফের নিহত এবং ৭০জন গ্রেফতার হয়। যুদ্ধকালীন নবীর কন্যা ও উসামান ইবনে আফফান (রাঃ)র স্ত্রী রুকাইয়া মৃত্যু বরণ করেন। হজরত উসমান (রাঃ) রাসূলের নির্দেশে তাঁর রোগাক্রান্ত স্ত্রীর পরিচর্যা ও দেখা-শুনার জন্য মদীনায় থেকে যাওয়ার ফলে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি।যুদ্ধের পরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁর আর এক মেয়ে উম্মে কুলসুমের সাথে উসমানের বিয়ে দেন। তাই তাঁর উপাধি ছিল "যুন্নূরাইন"। কারণ তিনি রাসূলের দু'কন্যা বিয়ে করেন।

যুদ্ধ শেষে মুসলিমরা আল্লার সাহায্যে উল্লসিত ও আনন্দিত হয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। সাথে ছিল যুদ্ধ বন্দী ও মালে গনিমত। যুদ্ধ বন্দীদের মধ্যে কিছু লোককে মুক্তিপণের বিনিময়ে, আবার অনেককে এমনিতে মুক্তি দেয়া হয়।তাদের মধ্যে কিছু লোকের মুক্তি পণ ছিলো মুসলিমদের ১০জন ছেলেকে লেখা পড়া শিখিয়ে দেয়া। মুশরিকদের বড় বড় অনেক সর্দার এবং ইসলামের বহু শত্রু এই যুদ্ধে মারা যায়। তাদের মধ্যে হলো, আবূ জেহেল, উমায়্যা ইবনে খালাফ, উতবা ইবনে রাবীয়া এবং শাইবা ইবনে রাবীয়া প্রমুখ।

নবী করীম ﷺকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র

বদর যুদ্ধে কুরাইশরা দারুনভাবে পরাজিত হওয়ার পর একদিন উমায়ের ইবনে অহাব সাফওয়ান ইবনে উমায়্যার সাথে বসেছিলো। আর উমায়ের ইবনে অহাব কুরাইশ শয়তানদের একজন ছিলো। নবী করীম ﷺ ও তাঁর সাথীদেরকে যন্ত্রণা দেওয়ার ব্যাপারে সে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতো। তার ছেলে অহাব বদর যুদ্ধের অন্যান্য বন্দীদের সাথে মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়েছিলো। সাফওয়ান বদর যুদ্ধে নিহতদের কথা উল্লেখ ক'রে বললো, আল্লাহর শপথ! এর পর আমাদের বেঁচে থাকার মধ্যে কোন আকর্ষণ নেই। তখন উমায়ের বললো, তুমি ঠিকই বলেছো। দেখ, আমার যদি ঋণ না থাকতো যা পরিশোধ করার মত অবস্থা বর্তমানে আমার নেই এবং আমার অভাবে আমার ছেলে-মেয়েদের নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্ক যদি না থাকতো, তবে আমি বাহনে আরোহণ ক'রে মুহাম্মাদের কাছে যেতাম এবং তাঁকে হত্যা করতাম। সাফওয়ান এটাকে মহৎ এক সুযোগ হিসাবে গ্রহণ ক'রে বললো, তোমার ঋণের যিম্মাদার আমি হচ্ছি। আর তোমার পরিবারকে আমার পরিবারের সাথে ততদিন পর্যন্ত আমি দেখাশুনা করবো, যতদিন তারা বেঁচে থাকবে। তখন উমায়ের তাকে বললো, ব্যাপারটা যেন তোমার ও আমার মাধ্যে গোপন থাকে। সে (সাফওয়ান) বললো, তাই হবে।

অতঃপর উমায়ের তার তরবারীকে তীব্র বিষে সিক্ত করলো। তারপর সে মদীনায় পৌঁছলো। এদিকে উমার ইবনে খাত্তাব ﵁ কিছু সাহাবী সহ কথোপকথন করছিলেন। যখন তিনি দেখলেন যে, অহাব ইবনে উমায়ের গলায় তরবারী ঝুলিয়ে মসজিদের দ্বারদেশে স্বীয় উঁট থেকে অবতরণ করছে, তখন তিনি বললেন, এতো অহাব ইবনে উমায়ের, কোন মন্দ পরিকল্পনা নিয়েই সে এসেছে। অতঃপর উমার ﵁ রাসূলু- ল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রবেশ ক'রে বললেন, হে আল্লাহর নবী! অহাব ইবনে উমায়ের গলায় তরবারী ঝুলিয়ে এসেছে। তিনি ﷺ বললেন, "তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।" তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। উমার ﵁ তাকে শক্ত করে ধরে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখে বললেন, "উমার ওকে ছেড়ে দাও।" উমায়েরকে তাঁর কাছে আসতে বললেন। সে তাঁর কাছে এগিয়ে এলো। এরপর তিনি ﷺ বললেন, "উমায়ের কি মনে করে এসেছো?" সে বললো, আমি আপনার হাতে এই বন্দীর ব্যাপার নিয়ে এসেছি। আপনি তার প্রতি দয়া করুন! তখন তিনি ﷺ বললেন, তাহলে তরবারী তোমার গলায় ঝুলানো কেন?" তরবারীর মন্দ হোক, সে কি আপনার কোন ক্ষতি করতে পেরেছে? তিনি ﷺ বললেন, সত্য করে বলো তুমি কেন এসেছো? সে বললো, আমি এ ছাড়া অন্য কারণে আসিনি। তিনি ﷺ বললেন, "বরং তুমি ও সাফওয়ান বসে বদর যুদ্ধে নিহতদের কথা আলোচনা করছিলে। এক পর্যায় তুমি বললে, আমার উপর যদি ঋণ ও সন্তান-সন্ততির ভার না থাকতো, তাহলে আমি (মদীনায়) গিয়ে মুহাম্মাদকে হত্যা করতাম। তখন সাফওয়ান ইবনে উমায়্যা তোমার ঋণের এবং তোমার পরিবারের দায়িত্ব এই মর্মে গ্রহণ করে যে, তুমি তার জন্য আমাকে হত্যা করবে। কিন্তু আল্লাহ তোমার ও তোমার ষড়যন্ত্রের মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালেন।

উমায়ের বললো, আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে, আপনি সত্যিকার রাসূল। পূর্বে যে আসমানী খবরা-খবর নিয়ে আপনি আমাদের কাছে আসতেন এবং যে অহী আপনার উপর নাযিল হতো, সে ব্যাপারে আমরা আপনাকে মিথ্যা ভাবতাম। কিন্তু এ ব্যাপারটা আমি আর সাফওয়ান ছাড়া কেউ জানে না। আল্লাহর শপথ! আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ খবর আপনাকে আল্লাহই জানিয়েছেন। অতএব, সেই আল্লাহরই প্রশংসা যিনি আমাকে ইসলামের পথ দেখিয়েছেন এবং এ পথে আমাকে নিয়ে এসেছেন। অতঃপর সে সত্যের সাক্ষ্য দিলো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, "তোমাদের এই ভাইকে দ্বীনের কথা এবং কুরআনের শিক্ষা দাও ও তার বন্দীকে ছেড়ে দাও।" সাহাবীরা তা-ই করলেন। তারপর উমায়ের বললো, আমি ইসলামের চরম বিরোধিতা করেছি এবং আল্লাহর দ্বীন অবলম্বনকারীদের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়েছি। এখন আমি চাই আপনি

আনুমতি দিন, মক্কায় গিয়ে তাদেরকে আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিই। তিনি ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন। সে তখন মক্কায় চলে গেলো।

এদিকে উমায়েরের মক্কা থেকে বের হওয়ার পর সাফওয়ান লোকদের বলে বেড়াতো যে, তোমরা এমন এক শুভ সংবাদ শুনবে যা তোমাদেরকে বদরের ঘটনা ভুলিয়ে দিবে। সে উমায়েরের ব্যাপারে (মদীনা থেকে) আগত ব্যবসায়ীদের জিজ্ঞাসা করতো। এইভাবে ব্যবাসায়ীদের একটি দলকে সে তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তারা তার ইসলাম গ্রহণের খবর জানিয়ে দিলো। তখন সে শপথ গ্রহণ করলো যে, তার সাথে কখনোও কথা বলবে না এবং তার কোন উপকারও করবে না। উমায়ের ؓ মক্কায় এসে লোকদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার কাজ আরম্ভ করলে অনেক মানুষই তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে

অন্য আর একটি ঘটনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে কোন এক সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। এক উপত্যকায় অবতরণ করলেন। সাহাবীরা গাছের ছায়ায় নিদ্রা যাওয়ার জন্য একে অপর থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺও একটি গাছের ছায়াতলে শুয়ে গেলেন এবং তাঁর তর- বারীটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিলেন। তিনি শুয়ে ছিলেন এমন সময় মুশরিকদের এক ব্যক্তি যে অনেক দূর থেকেই তাঁদের অনুসরণ করছিলো, অতি গোপনে সেখানে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তাঁর মাথায় কাছে দাঁড়ালো। তিনি ﷺ শুয়েই ছিলেন। অতঃপর তরবারীটা নিয়ে কোষমুক্ত ক'রে নবী করীম ﷺ-এর মাথার উপর তুলে ধরে বললো, হে মুহাম্মাদ তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? তিনি ﷺ তাঁর চোখ খুলে দেখলেন এক ব্যক্তি উলঙ্গ তরবারী হাতে তাঁর (মাথার) কাছে দাঁড়ানো। তিনি অতি শান্ত স্বরে বললেন, 'আল্লাহ।' (এ কথা শুনা মাত্রই) লোকটি কেঁপে উঠলো এবং তার হাত থেকে তরবারীটা খসে পড়লো। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে তরবারীটা হাতে নিয়ে লোকটির উপর তুলে ধরে বললেন, "তোমাকে এখন আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?" লোকটি হতভম্ব হয়ে গেলো, কি বলবে খুঁজে পাচ্ছে না। শেষে বললো, কেউ বাঁচাবার নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে মাফ করে দিলেন। ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করলো। অতঃপর তার গোত্রের লোকদের কাছে গিয়ে তাদেরকেও ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলো।

ওহুদের যুদ্ধ

বদর যুদ্ধের এক বছর পর মুসলিম ও মক্কার কাফেদের মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুশরিকরা বদর যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করার দৃঢ় পরিকল্পনা নিয়ে ৩০০০ যোদ্ধা সহ বের হয়। মুসলিমদের প্রায় ৭০০ মুজাহিদ তাদের মোকাবেলার জন্য মুখোমুখি হোন। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে মুসলিমরা বিজয়ী হোন এবং তাদের উপর জয়লাভ করেন। মুশরিকরা মক্কার দিকে পশ্চাদ্ধাবন করে। কিন্তু পরে পাহাড়ের দিক দিয়ে এসে মুসলিমদের ধ্বংস সাধন করতে আরম্ভ করে। এতে মুশরিকরা জয়লাভ করে। কারণ তীরন্দাজরা পাহাড়ের সে ঘাঁটি খালি ছেড়ে গনীমতের মাল জমা করার জন্য নীচে অবতরণ করেন, যেখানে তাঁদেরকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) সুপরিকল্পিতভাবে নিযুক্ত করেছিলেন। ফলে এ যুদ্ধে মুশরিকরা জয়লাভ করে। যখন তীরন্দাজরা দেখলেন যে, মুশরিকরা পলায়ন করেছে, তখন তাঁরা পাহাড়ের সে ঘাঁটি খালি ছেড়ে গনী-মতের মাল জমা করার জন্য নীচে অবতরণ করেন, যেখানে তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ সুপরিকল্পিতভাবে নিযুক্ত করে ছিলেন। ফলে এ যুদ্ধে মুশরিকদের পাল্লা ভারী হয়ে যায়। এ যুদ্ধে ৭০জন সাহাবী শহীদ হোন। তাঁদের মধ্যে একজন হলের, নবীর চাচা হামায ؓ। আর মুশরিকদের ২২জন ব্যক্তি নিহত হয়।

খন্দক বা পরিখা যুদ্ধ

ওহুদের যুদ্ধের পর মদীনার কিছু ইয়াহুদী মক্কায় গিয়ে মক্কাবাসীকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উস্কানি

দেয় এবং নিজেদের সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। ফলে কাফেররা ইতিবাচক সাড়া দেয়। মুশরিকরা প্রত্যেক এলাকা থেকে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা দেয়। প্রায় ১০,০০০যোদ্ধা সমবেত হয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) শত্রুপক্ষের তৎপরতার কথা জেনে সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। সালমান ফারসী মদীনার যে দিকে পাহাড় নেই, সে দিকে পরিখা খননের পরামর্শ দেন। সব মুসলিম উদ্যম ও প্রেরণা সহকারে পরিখা খননে অংশ গ্রহণ করেন এবং কাজ সত্বর সমাপ্ত হয়। মুশরিকরা এক মাস পর্যন্ত অবস্থান করেও পরিখা অতিক্রম করতে সক্ষম হয় নি। অবশেষে আল্লাহ তা'য়ালা প্রচন্ড বাতাস প্রেরণ ক'রে কাফেরদের তাঁবুসমূহ উপড়ে ফেলেন। তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং শীঘ্রই নিজ নিজ শহরে ফিরে যায়। মুশরিক দলকে আল্লাহই পরাজিত করেন এবং তিনিই মুসলিমদের সাহায্য করেন। মুশরিক সৈন্যরা পালিয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে জানিয়ে দেন যে, "এ বছররের পর থেকে কুরাইশরা আর কখনোও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আসবে না, বরং তোমরা এবার তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যাবে।" তিনি ﷺ ঠিকই বলেছিলেন, এই যুদ্ধই ছিলো কুরাইশদের সর্বশেষ আক্রমণ।

পরিখা খননকালে মুসলিমরা অতীব ক্ষুধার শিকার হোন। এমন কি ক্ষুধার তীব্র জ্বালায় তাঁদেরকে পেটে পাথর বাঁধতে হয়। তাই জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ নবী করীম ﷺ-এর জন্য প্রাণ সঞ্চারের মত সামান্য কিছু পেশ করার ইচ্ছা করেন। তিনি ছাগলের একটি বাচ্চা জবাই করেন যা তাঁর কাছে ছিলো। তাঁর স্ত্রীকে গোশ্ত পাক করতে এবং তার সাথে সামান্য যবের আটা দিয়ে রুটি তৈরী করতে বলেন। এ ছাড়া তাঁর কাছে আর কিছুই ছিলো না। যখন খানা তৈরী হয়ে গেলো তিনি নবী করীম ﷺ-এর কাছে গিয়ে তাঁকে খবর দিলেন যে, সামান্য পরিমাণ খানা তৈরী করা হয়েছে যা আপনার এবং আপনার সাথে একজন বা দু'জনের জন্যই যথেষ্ট হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "অনেক উত্তম।" অতঃপর তিনি ﷺ সমস্ত পরিখাবাসীদের ডাক দিয়ে তাঁদের জন্য গোশ্ত তুলে এবং রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিতে লাগলেন। তাঁরা সকলে খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে গেলেন। খাবার যা অবশিষ্ট ছিলো তা দেখে মনে হচ্ছিলো তাতে হাতই লাগানো হয়নি। সাহাবীরা ছিলেন প্রায় এক হাজার জন। এটা ছিলো নবী করীম ﷺ-এর মু'জিযাসমূহের একটি মু'জিযা।

হুদায়বিয়ার সন্ধি

রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবীরা যখন থেকে মদীনায় হিজরত করে ছিলেন, তখন থেকে মক্কার কাফেররা দৃঢ় পরিকল্পনা নিয়ে রেখেছিলো যে, তাঁদেরকে আর কোন দিন মক্কা প্রবেশ করতে এবং হারাম শরীফের যিয়ারত করতে দিবে না। কিন্তু হিজরতের ৬ষ্ট সনে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে মক্কা যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। যুল-ক্বাআদা মাসে বের হওয়ার দিন স্থির করলেন। আর এটা ছিলো সেই হারাম মাসগুলোর একটি মাস, আরবরা যার সম্মান করে। তাই উমরা করার উদ্দেশ্যে বের হলেন, যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নয়। মুসলিমদের সংখ্যা ছিলো এক হাজার চার শ' (১৪০০)। তাঁরা সবাই ইহরামের কাপড় এবং কুরবানীর পশু সাথে করে নিয়ে বের হলেন। তাঁরা উমরার নিয়তও করলেন, যাতে লোকেরা জেনে নেয় যে, তাঁরা বায়তুল্লাহর যিয়ারত এবং তার সম্মান প্রদর্শনের জন্য বের হয়েছেন। আর যাতে কুরাইশরা তাঁদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা না দেয়। অনুরূপ তাঁরা নিরস্ত্রও ছিলেন। কেবল কোষবদ্ধ একটি করে তরবারী তাঁদের সাথে ছিলো যা প্রত্যেক মুসাফির সাথে করে নেয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর 'ক্বাসওয়া' নামক উটনীর উপর আরোহন করলেন এবং সাহাবীরা ছিলেন তাঁর পিছনে। যখন তাঁরা মদীনাবাসীদের মীক্বাত হুলাইফায় পৌঁছলেন, তখন সকলেই উমরার নিয়ত ক'রে তালবিয়্যার ধ্বনি উচ্চারণ করতে লাগলেন উমরার ঘোষণা দেওয়ার জন্য। আর এটা ছিলো তাঁদের অধিকারের জিনিস। কারণ, বায়তুল্লাহর যিয়ারতের অধিকার সকলের আছে। প্রচলিত সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী কাউকে বায়তুল্লাহর যিয়ারত ও তার তাওয়াফ করতে বাধা দেওয়ার অধিকার কুরাইশদের নেই। যদিও সে কোন শত্রু হয় তবুও,

যখন সে এই ঘরের সম্মানের খেয়াল রাখবে। কিন্তু কুরাইশরা কেবল এ কথা জেনেই যে মুসলিমরা মক্কা অভিমুখে যাত্রা করছেন, যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিলো এবং নবী করীম ﷺকে মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করলো। এর জন্য যা করার সবই তারা করবে। কুরাইশদের এই ধরনের পদক্ষেপ মুলিমদের প্রতি তাদের শত্রুতা, তাঁদের উপর ওদের অত্যাচার এবং তাঁদেরকে বৈধ অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কথাই প্রমাণ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর যাত্রা অব্যাহত রাখলেন এবং তিনি মক্কার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন। এদিকে কুরাইশরা তাঁকে এবং তাঁর সাথীদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে না দেওয়ার ব্যাপারে ছিলো বদ্ধপরিকর। শুরু হলো মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে মধ্যস্থকারীদের আগমন কোন সুরাহা বের করার জন্য। উভয় পক্ষের প্রতিনিধিগণ বারংবার যাতায়াত করতে লাগলো। অন্য দিকে কুরাইশদের চল্লিশজন যুবক আকস্মিকভাবে মুসলিমদের উপর আক্রমন করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের কোন একজনকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু মুসলিমরা তাদের সকলকে পাকড়াও করতে সক্ষম হোন এবং তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ক্ষমা ক'রে ছেড়ে দেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উসমান ্রকে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের কাছে প্রেরণ করেন তাদেরকে এই সংবাদ দেওয়ার জন্য যে, তিনি ﷺ যুদ্ধ করার জন্য আসেননি। তিনি ﷺ বায়তুল্লাহর সম্মানার্থে কেবল তার যিয়ারত করার জন্য এসেছেন। কুরাইশ ও উসমান ্র-এর আলোচনা ব্যর্থ হয়। কুরাইশগরা তাঁকে (উসমান ্রকে) তাদের কাছে আটকে রাখে ফলে তাঁর হত্যা হওয়ার ভুয়া খবর রটে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, উসমান ্রর প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত এখান থেকে আমরা যাবো না এবং তিনি মানুষের কাছে বায়াত গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর একটি হাতকে অপর হাতের উপরে রাখলেন। আর এই বায়াকে 'রিযওয়ান' নামে নামকরণ করা হয়। একটি গাছের নীচে এ বায়াত সুসম্পন্ন হয়। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেন যে, যদি আসলেই উসমানের কোন ক্ষতি হয়ে থাকে, তবে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত কেউ তার স্থান থেকে নড়বে না এবং পালায়নও করবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে খবর এলো যে, উসমান ্র ভালো আছেন এবং তাঁকে হত্যা করা হয়নি।

এদিকে কুরাইশরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুসলিমদের কাছ থেকে যুদ্ধ করার উপর বায়াত গ্রহণ করার কথা জানতে পারলো, তখন অতি সত্বর সুহেল ইবনে আম্রকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এই সন্ধি করার জন্য পাঠায় যে, মুসলিমরা এ বছর ফিরে যাক এবং পরে যখনই চাইবে, তখনই তারা আসতে পারবে। সন্ধিচুক্তি সুসম্পন্ন হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্ধির সেই শর্তগুলো মেনে নিলেন, বাহ্যতঃ যেগুলো কুরাইশদের স্বার্থেরই মনে হচ্ছিলো। মুসলিমরা এ রকম সন্ধিতে চরম রাগান্বিত হোন। তাঁরা সচক্ষে দেখছিলেন অবিচারমূলক এমন শর্তাবলী, যা ছিলো মুশরিকদেরই স্বার্থের অনুকুলে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্ধি চাইছিলেন। কারণ, তিনি ﷺ জানতেন যে, স্থিরতা ও শান্তির সাথে ইসালামের প্রচার চললে তাতে বহু মানুষই প্রবেশ করবে। আর হলোও তা-ই। সন্ধির এই সময়কালে মানুষের মাঝে ইসলাম আশাতীত ভাবে সম্প্রসারিত হয়। শুধু এটাই নয়, বরং মুসলিম ও কুরাইশদের মাঝে এই সন্ধিই ছিলো ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য বড়ই বিজয়। আর এ থেকে এ কথাও প্রমাণ হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর জ্যোতি দিয়ে দেখেন। তাই তিনি ﷺ সমস্ত এই শর্তাবলীকে মেনে নেন, যেগুলোকে কোন কোন সাহাবী বাহ্যিকভাবে কুরাইশদের স্বার্থেরই অনুকুলে মনে করছিলেন।

মক্কা বিজয়

হিজরি ৮ম সনে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) মক্কা বিজয় অভিযান চালানোর ইচ্ছা করেন। ১০ই রমযান ১০০০০ সদস্যের বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হোন। মক্কায় উল্লেখ যোগ্য কোন যুদ্ধ ছাড়াই

প্রবেশ করেন। কুরাইশরা আত্মসমর্পণ করে। আল্লাহ্ তা'য়ালা মুসলিমদেরকে বিজয় দান করেন। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) মসজিদে হারামের অভিমুখে রওনা করেন এবং কা'বা শরীফের তাওয়াফ ক'রে কা'বার অভ্যন্তরে দু'রাকাআত নামায আদায় করেন। অতঃপর কা'বার ভিতরে ও উপরে রাখা সব মূর্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করেন। তারপর কা'বাশরীফের দরজায় দাঁড়িয়ে মসজিদে হারামে কাতার বদ্ধভাবে অপেক্ষারত সমবেত কুরাইশদেরকে বলেন, **"হে কুরাইশরা! তোমাদের সাথে কি আচরণ করবো বলে মনে করো"?** তারা বলে, ভালো আচরণ, সম্ভ্রান্ত ভাই, সম্ভ্রান্ত ভাইয়ের পুত্র। তিনি বলেন, **"যাও তোমরা সবাই মুক্ত"**। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) ক্ষমার উজ্জ্বল ও বৃহত্তম দৃষ্টান্ত পেশ করেন। তারাই সেই লোক যারা তাঁর সাহাবাদের উপর চালিয়ে ছিল অত্যাচরের স্টীম রোলার, তাঁদের কষ্ট দিয়েছে এবং তাঁকে (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে) নিজের মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কার করেছে।

মক্কা বিজয়ের পর লোক জন দলে দলে আল্লাহর দ্বীনের ছায়াতলে সমবেত হয়। হিজরি ১০ম সনে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) হজ্জ করেন। এটাই ছিলো তাঁর এক মাত্র হজ্জ। তাঁর সাথে এক লাখ লোক হজ্জ করেন। হজ্জ পালন শেষে তিনি মদীনায় প্রত্যাগমন করেন।

প্রতিনিধি দলের আগন এবং বাদশাহদের নিকট পত্র প্রেরণ

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর আনীত বিষয়ের বিকাশ ঘটলো এবং তাঁর দাওয়াত বিস্তার লাভ করলো। তাই প্রত্যেক স্থান থেকে দলে দলে মানুষ মদীনা অভিমুখে আসতে লাগলো এবং ইসলামে প্রবেশের ঘোষণা দিতে লাগলো।

অনুরূপ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বাদশাহদের প্রতি পত্র প্রেরণের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতে লাগলেন। কেউ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঈমান আনলো। কেউ সুন্দরভাবে পত্রের উত্তর দিলো এবং (নবীর) জন্য উপঢৌকনও পাঠালো, কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করলো না। আবার কেউ তাঁর পত্রকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিলো। যেমন পারস্যের বাদশাহ খুসরু নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর পত্রকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিলো। ফলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তার উপর বদ্দুআ ক'রে বলেছিলেন, "হে আল্লাহ! তার রাজ্যকেও টুকরো টুকরো করে দাও।" তাই কিছু দিনের মধ্যেই তার পুত্র তার উপর আক্রমণ ক'রে তাকে হত্যা ক'রে তার কাছ থেকে রাজত্ব কেড়ে নিয়ে ছিলো।

মিসরের বাদশাহ মুক্বাউক্বেস ইসলাম গ্রহণ তো করে নি, তবে সে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর বড়ই সম্মান করেছিলো এবং দূত মারফত নবীর জন্য উপঢৌকন পাঠিয়ে ছিলো। রোম সম্রাট কেসরাও অনুরূপ আচারণ করেছিলো। সেও বড় উত্তম উত্তর দিয়ে ছিলো এবং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর দূতের খুব শ্রদ্ধা করেছিলো। আর বাহরাইনের বাদশাহ মুনযির ইবনে সাওয়ার কাছে যখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর পত্র পৌঁছে, সে তা পাঠ ক'রে বাহরাইনবাসীদেরকে শুনায়। ফলে কেউ ঈমান আনে এবং কেউ অস্বীকার করে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর মৃত্যু

হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের প্রায় আড়াই মাস পর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। দৈনন্দিন রোগ বেড়ে যায়। (তীব্রভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে) ইমামতি করতে অক্ষম হয়ে পড়লে আবূ বাকার (রাঃ) কে ইমামতি করতে বলেন। হিজরি ১১সনে ১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) মৃত্যু বরণ ক'রে তাঁর মহান সাথীর কাছে যাত্রা করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো ৬৩ বছর। এ খবর শুনে সাহাবায়ে কেরাম প্রায় জ্ঞান ও স্বস্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। এ খবর বিশ্বাস করতে পার ছিলেন না। এহেন সময় আবূ বাকার সিদ্দীক (রাঃ) এক ভাষণে লোক জনকে শান্ত করেন। তিনি বলেন, রাসূল এক জন মানুষ ছিলেন। যিনি মৃত্যু বরণ করেছেন, যেমন অন্যান্য মানুষ মৃত্যু বরণ করে। মানুষ শান্ত

হয়ে যায়। রাসূলের গোসল দেয়া, কাফন পরানো ও তাঁর স্ত্রী আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা)র হুজরাতে দাফন করা সম্পূর্ণ হলো। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) নবূওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে চল্লিশ বছর ও পরে তের বছর মক্কায় এবং দশ বছর মদীনায় জীবনযাপন করেন।

অতঃপর মুসলিমরা সকলের ঐক্যমতে আবূ বাকার (রাঃ)কে নিজেদের খলিফা নির্বাচন করেন। তিনি ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদীনদের মধ্যে প্রথম।

নবী করীম ﷺ-এর প্রতি সাহাবীদের ভালোবাসা

নবী করীম ﷺ-এর প্রতি সাহাবীদের ভালোবাসা ছিলো অতি মহান। তাঁরা তাঁকে তাঁদের জান, সন্তান- সন্ততি এবং এমন সকল জিনিস থেকেও বেশী ভালোবাসতেন, যার তাঁরা মালিক ছিলেন। তাঁরই মাধ্যমে আল্লাহ তাঁদেরকে কুফ্‌রির অন্ধকার থেকে ইসলামের জ্যোতির পথে নিয়ে এসেছেন। যে ঘটনাগুলো আমাদেরকে বর্ণনা করে নবী করীম ﷺ-এর প্রতি সাহাবীদের ভালোবাসার কথা, তার সংখ্যা অনেক। তার মধ্য থেকে কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরা হচ্ছে।

*যখন কুরাইশগণ এক মহান সাহাবী খুবাইব ইবনে আদী ﷺকে শূলে দেওয়ার জন্য একত্রিত হয়, তখন আবূ সুফিয়ান বললো, তুমি কি এটা পছন্দ করবে যে, মুহাম্মাদ এখন আমাদের কাছে হোক আর আমরা তাঁকে শূলে দিই এবং তুমি (মুক্ত হয়ে) তোমার পরিবারের কাছে থাকো? তখন তিনি বললেন, আমি এটাও চাইবো না যে, আমি (মুক্ত হয়ে) আমার পরিবারের কাছে থাকি আর মুহাম্মাদ ﷺ-এর পায়ে এমন কাঁটা বিদ্ধ হোক যে তাঁকে কষ্ট দিবে।

*ওহুদের যুদ্ধে খবর রটে গেলো যে, নবী করীম ﷺকে হত্যা করে দেওয়া হয়েছে। এ খবর শুনে এক আনসারী মহিলা (মদীনার) বাইরে বেরিয়ে আসেন। তাঁকে তাঁর পিতা, পুত্র এবং স্বামী ও ভাইয়ের শহীদ হওয়ার সংবাদ দেওয়া হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খবর কি? তাঁকে জানানো হলো যে, তিনি ﷺ ভালোই আছেন। তখন তিনি বললেন, আমাকে দেখাও, আমি তাঁকে দেখতে চাই। যখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺকে দেখলেন, তখন তাঁর কাপড়ের একটি কোণা ধরে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আপনি যখন নিরাপদে আছেন তখন আমার আর কোনই পরোয়া নেই।

*এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে আমার প্রাণ, আমার সন্তান-সন্ততি এবং আমার পিতা-মাতার চেয়েও বেশী ভালোবাসি। আমি বাড়ীতে থাকাকালীন যখনই আপনাকে মনে করি, তখন আপনাকে না দেখা পর্যন্ত আমার ধৈর্য হয় না। কিন্তু যখন আমি আমার ও আপনার মৃত্যুকে স্মরণ করি, তখন আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যাই যে, আপনি জান্নাতে নবীদের সাথে সুউচ্চ মর্যাদায় থাকবেন। আর আমি যদিও জান্নাতে প্রবেশ করি, তবুও আমার আশঙ্কা হয় যে, হয়তো আপনাকে দেখতে পাবো না। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, "তুমি তারই সাথে থাকবে, যাকে তুমি ভালোবাসো।"

অমুসলিমদের সাথে নবী করীম ﷺ-এর আচরণ

নবী করীম ﷺ উন্মুক্ত চিত্তে বিভিন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতির, বিভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী এবং বহু বর্ণের লোকদের সাথে বসবাস করেছেন।কিন্তু তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে কোন সমালোচনা করেননি। এর দৃষ্টান্ত হলো, তিনি ﷺ মক্কা থেকে আসার পর থেকেই মদীনার ইয়াহুদীদের সাথে অতীব শান্ত-সুষ্ঠুভাবে বসবাস করেতেন। ইসলামী নৈতিকতা তাদের জন্য তিনি পেশ করতেন। তিনি তাদের রোগীদের দেখতে যেতেন। প্রতিবেশী ইয়াহুদীর মন্দ আচরণ তিনি সহ্য করতেন। কোন ইয়াহুদীর জানাযা দেখলে দাঁড়িয়ে যেতেন। যেমন, এক

ইয়াহুদীর জানাযা দেখে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁকে বলা হলো, এতো ইয়াহুদীর জানাযা। তখন তিনি ﷺ বললেন, "এটা কি কোন প্রাণী নয়?"

মদীনায় আসার পর থেকেই তিনি ইয়াহুদীদের সাথে কোন শত্রুতা না রাখার প্রতি ছিলেন বড়ই আগ্রহী। বরং তাদের সাথে তিনি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। যা প্রমাণ করে যে তিনি অপর পক্ষের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার প্রতি ছিলেন বড়ই আগ্রহী। ইসলামী দেশের সম্প্রসারণ ঘটলে সেখানে বহু খ্রীষ্টান গোত্র বসবাস করেছে বিশেষ করে নাজরানে। তাদের সাথে নবী করীম ﷺ সুন্দর আচরণ করেছেন। ইসলামী দেশের ছত্রছায়ায় যাতে তারা নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে পারে এর জন্য তিনি তাদেরকে প্রতিশ্রুতিও দান করেছেন। নিজেদের ধর্মের বিধি-বিধান পালন করার স্বাধীনতাও দান করেছেন এবং তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বিধানের দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন।

নাজরানবাসীদের নিরাপত্তা দানের চুক্তিনামায় এসেছে যে, "নাজরানবাসী এবং তাদের অনুচরবর্গের মালের, জানের, বিষয়-সম্পত্তি, মিল্লাতের এবং তাদের উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকলের হিফাযতের যিম্মাদার হলেন আল্লাহ ও মুহাম্মাদ ﷺ। যিনি আল্লাহর নবী ও তাঁর রাসূল। এইভাবে এই অঙ্গীকার পত্রে নাজরানের খ্রীষ্টানদের অধিকারসমূহের হিফাযতের এবং তাদের নিরাপত্তার বিঘ্ন না ঘটার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। অনুরূপ নবী করীম ﷺ কর্তৃক জারী করা মদীনা দস্তবেজে দেশের আইনে অমুসলিমদেরকেও স্বদেশী মুসলিমদের মতই বিবেচনা করা হয়েছে। তাদের জন্যও ছিলো মুসলিমদের ন্যায় অধিকার এবং মুসলিমদের জন্য আবশ্যক পালনীয় যে দায়িত্ব ছিলো তা তাদের উপরেও ছিলো।

আর মুনাফেকদের সাথে নবী করীম ﷺ-এর বসবাসের ব্যাপার হলো, তিনি তাদেরকে তাদের নামসহ জানতেন এবং এও জানতেন যে, তারা মুসলিমদের পরাজয়ের জন্য ও তাদেরকে বিভক্ত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তা সত্ত্বে আমরা দেখি নি যে তিনি তাদের সাথে চলাফেরা করতে অস্বীকার করেছেন। বরং তিনি তাদের সংস্রবে থাকতেন। তাদের সাথে চলাফেরা করতেন এবং তাদের বক্তব্য শুনতেন। অনুরূপ তাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করার শক্তি-সামর্থ্য রাখা সত্ত্বেও তিনি এর শরণাপন্ন হোননি। তাদেরকে তাদের ন্যায়াধিকার থেকে বঞ্চিত করা হতো না। মুসলিমদের মত তারা সম্পূর্ণরূপে নাগরিক অধিকার দ্বারা পরিতৃপ্ত হতো। সামাজিক ব্যাপারে তাদেরকেও মতামত পেশ করার অধিকার দেওয়া হতো এবং বায়তুল মাল থেকে তাদেরকেও অংশ দেওয়া হতো। এইভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ভালোবাসার সাথে ও খুলা দিলে অপরের সাথে বসবাস করতেন। মনে কোন বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করতেন না। বরং তিনি ﷺ তাঁর অনুসারীদেরকেও স্বীয় আচরণ ও কথার মাধ্যমে অপরের সাথে পরিষ্কার মনে ও শান্তভাবে বসবাস করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন।

মু'মিনরা পরস্পরের ভাই

(হাদীসের) বহু স্থানে নবী করীম ﷺ মুসলিমদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব এবং তাদের একে অপরের সাথে সম্পর্ক রাখা যে ওয়াজিব তার প্রতি চরমভাবে তাকিদ করেছেন এবং আপসে হিংসা, বিদ্বেষ পোষণ করতে, সম্পর্কচ্ছেদ করতে এবং বিরোধিতা ও ঐক্য ছিন্ন করতে নিষেধ করেছেন। অনুরূপ সেই সব জিনিস থেকে সতর্ক করে দিয়েছেন, যা পারস্পরিক বিদ্বেষ এবং একে অপর থেকে দূরত্ব সৃষ্টির কারণ হয়। এইভাবে তিনি ﷺ অপর মুসলিমের প্রয়োজন পূরণ এবং তার সাহায্য-সহযোগিতা ও তাকে নসীহত করার প্রতি অনুপ্রাণিত করেছেন। আমরা যখন তাঁর কথা-বার্তা, নিদেশাবলী এবং তাঁর কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য করি, তখন দেখি যে, তাতে রয়েছে মু'মিনদের পারস্পরিক ভালোবাসার সম্প্রসারণের প্রতি উন্মুক্ত আহ্বান। তিনি তাকিদ করে বলেছেন যে, ঈমানী ভালোবাসা হলো জান্নাতের যাওয়ার অসীলা ও তার পথ। যেমন তিনি বলেন,

((لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ))

অর্থাৎ, "তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না ঈমান এনেছো। আর ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ঈমান আনতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছে। আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিসের কথা বলে দিবো না যা করলে তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? (তা হলো) তোমরা আপসে সালামের প্রচলন করো।"

তিনি ﷺ সর্বদা মুসলিমদের মাঝে ভালোবাসার বীজ বপন করার এবং তাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি করার প্রতি দারুণ আগ্রহী থাকতেন। মানুষের অন্তরে ভালোবাসার ভিত্তি সংস্থাপন করার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন চরম আগ্রহী। তিনি আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহর নিমিত্ত মু'মিনদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা যতই বেশী হবে, ততই আমরা আল্লাহর ভালোবাসা লাভে ধন্য হবো। যেমন তিনি ﷺ বলেছেন,

((مَا تَحَابَّ رجلان في الله إلاَّ كانَ أَحَبُّهُمَا إلى الله-عزوجل-أَشَدُّهُمَا حُبّاً لصاحبه))

অর্থাৎ, "যে দুই ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিমিত্ত পরস্পরকে ভালোবাসে, তাদের প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা তাদের একে অপরকে ভালোবাসার চেয়েও আরো গভীর হয়।" কেবল এ টুকুই নয়, বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেছেন যে, ঈমান অপরের সাথে ভালোবাসা রাখা এবং অন্যের জন্য কল্যাণকামিতার সাথে সম্পর্কিত। যেমন তিনি ﷺ বলেছেন,

((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ))

অর্থাৎ, "তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা ভালোবাসে তা তার অপর ভাইয়ের জন্যও ভালো না বাসবে।" অনুরূপ আবূ হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, "তোমরা একে অপরের জন্য নম্র হও, তাহলে তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে।" তিনি ﷺ ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়ার মাধ্যম ও পথগুলোও জানিয়ে দিয়েছেন। তার মধ্যে হলো নরম হৃদয়ের অধিকারী হওয়া এবং অন্তরকে অপরের ভালোবাসা সম্পূর্ণরূপে অনুভব করার যোগ্য করা।

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর সৃষ্টিগত গুণ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) মাঝারি গোছের মানুষ ছিলেন। খুব লম্বাও না, অতি খাটোও না। উভয় কাঁধের প্রশস্ততার, সামঞ্জস্যপূর্ণ শারীরিক গঠনের এবং উন্মুক্ত বক্ষের অধিকারী ছিলেন। মানুষের মধ্যে সব চেয়ে সুদর্শন ছিলেন। তাঁর লাল-সাদা মিশ্রিত গোলাকার মুখমন্ডল ছিলো। সুরমা বরণ চোখ, পাতলা নাক, সুন্দর মুখাকৃতি এবং ঘন দাড়ি বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি বড়ই সুন্দর সৌরভ এবং নরম ও নাজুক ছিলেন। আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, 'আমি মিস্ক আম্বার ও এমন কোন সুগন্ধি শোঁখি নি, যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর চেয়ে অধিক সুগন্ধময় এবং আমার হাত এমন কোন জিনিস স্পর্শ করে নি, যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর হাতের চেয়েও অধিক কোমল।' (মুসলিম ২৩৩০) তিনি ছিলেন হাসিমুখো। সব সময় স্নিগ্ধ হাসার, সুন্দর স্বরের এবং মিতভাষিতার অধিকারী ছিলেন। আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'তিনি মানুষের মধ্যে সব থেকে সুন্দর, সব চেয়ে দানশীল এবং সর্বাপেক্ষা নির্ভীক বীর ও সাহসী ছিলেন।' (মুসলিম ২৩০৭)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর চরিত্র

তিনি সর্বাপেক্ষা নির্ভীক ও সাহসী ছিলেন। আলী ইবনে আবূ তালিব বলেন, যখন তুমুল যুদ্ধ শুরু হতো, এক দল অন্য দলের মুখোমুখি যুদ্ধ করতো, তখন আমরা রাসূলকে আড়াল হিসাবে রাখতাম।তিনি সর্বাপেক্ষা দানবীর ছিলেন। কখনো কোন জিনিস চাওয়া হলে তিনি না করেন নি। তিনি সর্বাপেক্ষা ধৈর্যশীল ছিলেন।

নিজের জন্য কোন প্রতিশোধ নেন নি এবং নিজের স্বার্থের জন্য কখনো রাগান্বিত হোন নি। তবে হ্যাঁ, আল্লাহর বিধান লংঘন করা হলে আল্লাহর নিমিত্তেই প্রতিশোধ নিয়েছেন। অধিকারের ব্যাপারে তাঁর নিকটে আত্মীয় অনাত্মীয়, দুর্বল, সবল সবাই সমান ছিলো। তিনি গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে, তাক্বওয়া ছাড়া আল্লাহর কাছে কেউ কারো চাইতে শ্রেয় নয়। সব মানুষ সমান ও একরূপ। পূর্ববর্তী জাতিগুলো এ জন্য ধ্বংস হয়েছে যে, কোন সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিতো, আর কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে শাস্তি দিতো। তিনি বললেন, **"আল্লাহর শপথ! যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ চুরি করে, তবে আমি তাঁরও হাত কর্তন করবো"।**

তিনি কখনো কোন খাবারের দোষ বর্ণনা করেন নি। রুচি সম্মত হলে আহার করতেন। অন্যথায় বর্জন করতেন। কখনো মুহাম্মাদের পরিবারের উপর এমনও সময় আসতো যে, এক মাস দু'মাস পর্যন্ত তাঁর বাড়ীতে আগুন জ্বলতো না।তিনি ও তাঁর পরিবার শুধু খেজুর ও পানি আহার করেছেন। ক্ষুধার তীব্র জ্বালা প্রশমিত করার জন্য মাঝে মাঝে উদর মুবারকে প্রস্তর বেঁধে রাখতেন। তিনি জুতা সিলাই করতেন। কাপড়ে তালি লাগাতেন । গৃহ কর্মে তাঁর পরিবারবর্গের সহযোগিতা করতেন। অসুস্থ ব্যক্তিদের দেখতে যেতেন। তিনি অতি নম্র ছিলেন।ধনী-গরীব, সম্ভ্রান্ত-অসম্ভ্রান্ত সবার দাওয়াত গ্রহণ করতেন। তিনি ভাল বাসতেন গরীব মিসকীনকে প্রচুর। তাদের জানাযায় হাজির হতেন। পিড়ীত লোকদের দেখতে যেতেন। কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে দারিদ্র্যের জন্য ঘৃণা করতেন না। কোন রাজা বা শাসককে তার রাজত্ব ও যশ-ঐশ্বর্যের কারণে ভয় করতেন না। তিনি ঘোড়া, উট, গাধা ও খচ্চরের উপর আরোহণ করতেন।

তিনি সব চাইতে বেশী স্নিগ্ধ হাসতেন। সর্বাপেক্ষা সুদর্শন ছিলেন। অথচ দুঃখ বিপদ অনবরত তাঁর উপর আসতে থাকতো। সুগন্ধ ভাল বাসতেন। দুর্গন্ধ ঘৃণা করতেন। আল্লাহ পাক চারিত্রিক উৎকর্ষ ও সুন্দর কর্মের অনুপম সন্নিবেশ ঘটিয়েছিলেন তাঁর মধ্যে। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে এমন জ্ঞান দান করেছিলেন যা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অন্য কাউকে দান করা হয়নি। তিনি ছিলেন নিরক্ষর। জানতেন না লেখা-পড়া। মানুষের মধ্যে কেউ তাঁর শিক্ষক ছিলো না। আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে আসেন মহা গ্রন্থ আল কুরআন, যার সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ পাক বলেন,

﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾

[الاسراء:٨٨]

অর্থাৎ, "বলুন, যদি মানুষ ও জ্বিন এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করার জন্য সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়, তবুও তারা কখনো এর অনুরূপ রচনা করতে পারবে না"। (সূরা ইসরাঃ ৮৮) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর নিরক্ষর হওয়াটাই হলো মিথ্যা অপবাদকারীদের সব অহেতুক প্রলাপের অকাট্য, অপ্রতিরোধ্য ও অখন্ডনীয় উত্তর। যাতে একথা বলতে না পারে যে, তিনি স্বহস্তে লিখেছেন অথবা অন্যের কাছে শিখেছেন বা পূর্বের কোন সূত্র থেকে পাঠ করে সংগ্রহ করেছেন।

তাঁর কতিপয় মু'জেযা

তাঁর সব চাইতে বড় মু'জেজা কুরআন, যা কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে এবং যা আরবি সাহিত্যের বড় বড় পন্ডিত ও সাহিত্যিকদের অপারগ করে দিয়েছে। আল্লাহ সবাইকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন যে, কুরআনের অনুরূপ ১০টি সূরা অথবা ১টি সূরা বা অন্ততঃপক্ষে ১টি আয়াত রচনা করে আনো।মুশরিকরা কুরআনের মু'জেযা স্বচক্ষে দেখেছে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর মু'জেযার মধ্যে হলো, মুশরিকরা একবার তাঁকে একটি নিদর্শন দেখানোর কথা বললে তিনি চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়াকে দেখান। চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দু'টুকরো হয়ে গিয়েছিল। অনেক

বার তাঁর আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পানি উৎসারিত হয়েছে। তাঁর হাতে পাথর তাসবীহ পাঠ করেছে। অতঃপর আবূ বাকার,উমার ও উসমানের হাতে সে পাথর তিনি রেখে দিলে তাঁদের হাতেও তাসবীহ পাঠ করেছে। আহার করাকালীন খাবার তাঁর কাছে তাসবীহ পাঠ করতো এবং এর ধ্বনি সাহাবায়ে কেরাম শুনতে পেতেন। পাথর ও গাছ পালা তাঁকে সালাম করেছে। এক ইয়াহুদী নারী রাসূলকে বিষপানে হত্যা করার জন্য ছাগলের এক বিষ মাখা রানের গোশ্ত খেতে দিলে সে রান রাসূলের সাথে কথা বলে।একবার এক বেদুঈন তাঁকে একটি নিদর্শন দেখাতে বলে। তিনি একটি গাছকে নির্দেশ দিলে রাসূলের কাছে আসে।আবার নির্দেশ দিলে যথাস্থানে চলে যায়।এক দুগ্ধবিহীন ছাগলের স্তনে হাত মুবারাক স্পর্শ করায় দুগ্ধ আসে। তিনি তা দোহন করে নিজেও পান করেন এবং আবূ বাকারকেও পান করতে দেন। আলী ইবনে আবূ তালিবের ব্যথিত চোখে তিনি থুথু দিলে সঙ্গে সঙ্গে তা ভাল হয়ে যায়। এক সাহাবীর পা আহত হওয়ার পর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) হাত বুলিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে ভাল হয়ে যায়। আনাস ইবনে মালিকের জন্য সুদীর্ঘায়ু,স্বচ্ছলতা এবং সন্তান-সন্ততি বেশী হওয়ার জন্য দুআ করেন। আল্লাহ তাঁর এসব জিনিসে এত বরকত দান করেন যে,তাঁর ১২০জন সন্তান জন্ম নেয়; তাঁর খেজুর গাছ বছরে দু'বার ফল দিতে লাগে ,অথচ এ কথা সুবিদিত যে খেজুর গাছে বছরে এক বারই ফল আসে। আর তিনি ১২০ বছর বয়স পেয়ে ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামদের একজন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে অনাবৃষ্টি ও খরার অভিযোগ করেন তিনি মিম্বার থেকেই দুআর জন্য হাত উঠালেন। আকাশে কোন মেঘ ছিল না। হঠাৎ পর্বত সম মেঘ ছেয়ে গেল এবং দ্বিতীয় পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত মুষল ধারায় বৃষ্টি হলো। ফলে আবার অতিবৃষ্টির অভিযোগ করা হয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) দুআ করলে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ রৌদ্রের মাঝে বের হয়ে গেলো।

একটি ছাগল ও এক 'সাআ' (আড়াই কিলো গ্রাম) যব দিয়ে এক হাজার পরিখা যুদ্ধের মুজাহিদগণকে খাওয়ান। সকলে পরিতৃপ্তি সহকারে খেয়ে চলে যান, কিন্তু খাবার সামান্যও কম হয়নি। অনুরূপভাবে অল্প খেজুর দিয়ে পরিখা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের খাওয়ান, যে খেজুর বাশির ইবনে সা'দের কন্যা তার পিতা ও মামার জন্য এনে ছিলো এবং আবূ হুরাইরার স্বল্প খাদ্য দ্বারা পরিখা যুদ্ধের মুজাহিদগণকে পেট ভরে খাওয়ান। তাঁকে (রাসূলকে) হত্যা করার জন্য অপেক্ষারত এক শ'জন কুরাইশী ব্যক্তির মুখের উপর মাটি ছিটিয়ে দিলে কেউ তাঁকে দেখতে সক্ষম হয়নি। তিনি তাদের নাকের ডগাদিয়ে চলে গেলেন। সুরাক্বা ইবনে মালেক তাঁকে হত্যা করার জন্যে পিছু ধাওয়া করে। যখন সে তাঁর নিকটবর্তী হয় তিনি তার জন্য বদ্দুআ করলে তার ঘোড়ার পা মাটিতে ঢুকে যায়।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর জীবনী থেকে সংগৃহীত উপদেশাবলী

তাঁর হাসি-ঠাট্টাঃ তিনি তাঁর সাহাবীদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করতেন। তাঁর পরিবারের সাথে রসিতাপূর্ণ বাক্য বিনিময় করতেন। ছোটদের গুরুত্ব দিয়ে তাঁর সময়ের কিছু সময় তাদের জন্যও নির্দিষ্ট করতেন। তাদের সাথে তাদের বোধ ও সামর্থ্য অনুযায়ী আচরণ করতেন। কখনো তিনি তাঁর খাদেম আনাস ইবনে মালিক (রাঃ)এর সাথে রহস্য ক'রে বলতেন, 'ইয়া যাল উযুনায়ইন' "হে দুই কানের অধিকারী" (তিরমিযী ১৯৯২, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে তিরমিযী আলবানীঃ ১৯৯২) এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে একটি সওয়ারী দিন। তিনি তাকে ঠাট্টাচ্ছলে বললেন, "আমরা তোমাকে একটি উষ্ট্রীর বাছুর দেবো।" সে বললো, উষ্ট্রীর বাছুর দিয়ে আমি কি করবো? তখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, "উটকে উষ্ট্রী ছাড়া আবার কে প্রসব করে?" (আবূ দাউদ৪৯৯৮, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে আবূ দাউদ আলবানীঃ ৪৯৯৮) স্বীয় সাথীদের সাথে সব সময় মুচকি হাসি ও প্রফুল্লতা প্রদর্শন করতেন। তাঁর নিকট থেকে তাঁরা উত্তম বাক্য ব্যতীত কিছুই শুনতেন না। জারির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'যখন থেকে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, তখন থেকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আমাকে

বাধা দান করেন নি (অর্থাৎ, যে কোন সময় তাঁর কাছে প্রবেশ করতে বাধা দান করেন নি) এবং আমাকে দেখলেই মুচকি হাসি দিয়েছেন। (একদা) আমি তাঁর কাছে অভিযোগ করলাম যে, আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির বসে থাকতে পারি না, তখন তিনি আমার বুকে চাপড় দিয়ে দুআ করলেন,

((اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا))

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! তাকে স্থির রাখো এবং সৎপথ প্রদর্শনকারী ও সৎপথ প্রাপ্ত করে দাও।" (বুখারী ৩০৩৬-মুসলিম২৪৭৫) তিনি তাঁর আত্মীয়দের সাথেও রসিকতা করতেন। একদা তিনি তাঁর মেয়ে ফাতিমার বাড়িতে এলেন, কিন্তু বাড়িতে তাঁর স্বামী আলীকে দেখলেন না। তাই জিজ্ঞেস করলেন, "সে কোথায়?" ফাতিমা (রাযীআল্লাহু আনহা) বললেন, তাঁর ও আমার মধ্যে (সামান্য) মনোমালিন্য হলে তিনি আমার উপর রাগ ক'রে বের হয়ে গেছেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁর কাছে এলেন। তিনি মসজিদে শুয়ে ছিলেন। তাঁর চাদরটা (গা) থেকে পড়ে গেছিলো। তাই গায়ে ধুলা লেগেছিলো। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁর শরীর থেকে ধুলা মুছতে মুছতে বললেন,

((قُمْ يَا أَبَا التُّرَابِ، قُمْ يَا أَبَا التُّرَابِ))

অর্থাৎ, "হে মাটির বাপ উঠো! হে মাটির বাপ উঠো! (বুখারী ৩৭০৩)

ছোটদের সাথে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আচরণ

তাঁর মহান চরিত্রের এক বিরাট অংশ তাঁর পরিবারের লোক, স্ত্রীগণ এবং তাঁর মেয়েরাও পেয়েছেন। তিনি তাঁর স্ত্রী আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা)র সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন। তাঁকে তাঁর সখীদের সাথে খেলতে দিতেন। আয়েশা (রাযী আল্লাহু আনহা) বলেন, 'আমি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর নিকটেই পুতুল নিয়ে খেলা করতাম। আমার অনেকগুলো সখী ছিলো তারা আমার সাথে খেলা করতো। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বাড়িতে প্রবেশ করলে তারা লুকিয়ে যেতো। তিনি তাদের আবার আমার সাথে খেলতে পাঠাতেন।' (বুখারী ৬১৩০) অনুরূপ তিনি ছোটদের গুরুত্ব দিতেন, তাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করতেন এবং তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতেন। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, 'বিকালের কোন এক নামাযে (যোহর অথবা আসরে) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আমাদের নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি হাসান অথবা হুসায়েনকে কোলে ক'রে নিয়ে এসেছিলেন। সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁকে নামিয়ে দিলেন। অতঃপর তকবীর দিয়ে নামায আরম্ভ করলেন। সাজদা করলে তা সুদীর্ঘ করলেন। আমার পিতা বলেন, আমি মাথা উঠিয়ে দেখলাম যে, রাসূলের সাজদারত অবস্থায় শিশুটি তাঁর পিঠের উপর চড়ে বসেছে। আমি পুনরায় সাজদায় ফিরে গেলাম। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) নামায শেষ করলে, লোকে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সুদীর্ঘ সাজদা করেছেন এমনকি আমরা মনে করেছিলাম, কোন কিছু ঘটেছে অথবা আপনার প্রতি অহী অবতীর্ণ হচ্ছে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন,

((كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ))

অর্থাৎ, "এ সবের কোন কিছুই ঘটেনি, তবে আমার এই ছেলেটা আমার উপরে চড়ে বসেছিলো তাই তাকে ত্বরান্বিত করতে ভাল মনে করলাম না, যাতে সে তার সাধ-ইচ্ছা পূরণ করে নেয়।" (নাসায়ী ১১২৯, আহমদ ১৫৬০৩, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে নাসায়ী আলবানীঃ১১৪১) আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি আমার এক ছোট ভাইকে (ঠাট্টা ক'রে) বললেন, "ইয়া আবা উমায়ের মা-ফা'আলা-

নুগায়ের?" (হে উমায়েরের বাপ! তোমার নুগায়েরের খবর কি?) 'নুগায়ের' ছোট একটি পাখী ছেলেটি তা নিয়ে খেলা করতো (পাখিটি মারা গেলে তিনি তাকে এ কথা বলেছিলেন)। এই রূপ আচরণে ছেলেটির প্রতি রয়েছে সান্ত্বনা দানের সুর।

স্বীয় পরিবারবর্গের সাথে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আচরণ

স্বীয় পরিবারবর্গের সাথে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর আচরণের ব্যাপারেও দেখা যায় যে, চারিত্রিক সকল উৎকর্ষ এক্ষেত্রেও সন্নিবেশিত হয়েছে। তিনি সর্বাধিক নম্র ও বিনয়ী ছিলেন। তিনি সব সময় তাঁর পরিবারের প্রয়োজনাদির খেয়াল রাখতেন। মহিলাদেরকে মানুষ, জননী, স্ত্রী এবং কন্যা ও জীবন সঙ্গিনী হিসেবে গণ্য ক'রে তাদের স্ব স্ব মর্যাদা দান করতেন। এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলো, মানুষের মধ্যে আমার উত্তম ব্যবহার পাওয়ার সর্বাধিক অধিকারী কে? তিনি বললেন, "তোমার মা। তোমার মা। তোমার মা। তারপর তোমার বাপ।" (বুখারী ৫৯৭১-মুসলিম ২৫৪৮) তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আরো বলেন, "যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা তাদের কোন একজনকে পেলো, কিন্তু তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করলো না, ফলে মারা গিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করলো, তাকে আল্লাহ (তাঁর রহমত থেকে আরো)দূর করুন!" (আমহদ ১৮৫৪৮)

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) স্বীয় স্ত্রীর পান করা পাত্র নিয়ে নিজের মুখ সেখানেই লাগিয়ে পান করতেন, যেখানে তাঁর স্ত্রী মুখ লাগিয়ে পান করেছিলেন। আর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলতেন, "তোমাদের মধ্যে সেই সব চেয়ে উত্তম, যে তার পরিবারের জন্য উত্তম এবং আমি আমার পরিবারের জন্য উত্তম।" (আবূ দাউদ ৪৮৯৯, তিরমিযী ৩৮৯৫, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে আবূ দাউদ ও তিরমিযী আলবানীঃ ৪৮৯৯-৩৮৯৫)

তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) দয়া-দাক্ষিণ্য

তাঁর দয়ার বর্ণনা হলো এই যে, তিনি বলেন,

((الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ))

অর্থাৎ, "দয়া প্রদর্শনকারীদের প্রতি দয়াবান আল্লাহ দয়া করবেন। তোমরা যমীনবাসীর প্রতি দয়া করো, তাহলে যিনি আসমানে আছেন, তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।" (আবূ দাউদ৪৯৪১ তিরমিযী ১৯২৪, আহমদ৬৪৫৮, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে আবূ দাউদ ও তিরমিযী আলবানীঃ ৪৯৪১-১৯২৪) আমাদের মহান নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এই মহান চরিত্রের বহু অংশের অধিকারী ছিলেন। তাঁর এই চরিত্র পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠে ছোট-বড়, আত্মীয়, অনাত্মীয় সকলের সাথে তাঁর আচার-আচরণের মাধ্যমে। আর এটাও তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্যের আওতাভুক্ত যে, তিনি শিশুর কান্নার শব্দ শুনে নামাযকে লম্বা না করে হাল্কা করতেন। যেমন, আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ))

অর্থাৎ, "আমি নামাযে দাঁড়িয়ে ইচ্ছা করি তা লম্বা করার কিন্তু শিশুর কান্নার শব্দ শুনে আমি আমার নামাযকে সংক্ষিপ্ত করি, কারণ আমি শিশুর মাকে কষ্ট দিতে চাইনা।" (বুখারী ৭০৭-মুসলিম ৪৭০) উম্মতের প্রতি তাঁর দয়া এবং তাদের আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ হওয়ার ব্যাপারে তিনি এতই আগ্রহী ছিলেন যে, এক ইয়াহুদী বালক-সে নবীর খেদমত করতো-অসুস্থ হলে তিনি তাকে দেখার জন্য এসে তার মাথার কাছে বসে তাকে বললেন, "ইসলাম গ্রহণ করো।" ছেলেটি তার মাথার কাছে দন্ডায়মান স্বীয় পিতার দিকে তাকালে তার পিতা

তাকে বললো, আবুল ক্বাসিম (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উপনাম)-এর আনুগত্য করো। ফলে ছেলেটি ইসলাম গ্রহণ করলো। তারপর একটু পরেই সে মারা গেলো। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এই বলতে বলতে তার কাছ থেকে বের হয়ে গেলেন, "সেই আল্লাহরই প্রশংসা যিনি একে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে নিলেন।" (বুখারী ১৩৫৬)

তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) সহিষ্ণুতা

তাঁর সহিষ্ণুতা সম্পর্কে আলোচনা প্রকৃতপক্ষে তাঁর সম্পূর্ণ জীবন এবং তাঁর জীবনীর সমূহ ঘটনাবলীর বিস্তারিত অলোচনা করা। কারণ, তাঁর পুরো জীবনটাই হলো সহিষ্ণুতা-ধৈর্যশীলতা, জিহাদ ও শ্রম-সাধনায় পরিপূর্ণ। যেদিন প্রথম আয়াতটি নাযিল হয়, সেদিন থেকে নিয়ে তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি অব্যাহতভাবে সহিষ্ণুতা অবলম্বন ক'রে বিরতিহীন আমল জারী রেখেছিলেন। যেদিন তিনি নবীরূপে নির্বাচিত হোন, প্রথম যেদিন তাঁর সাথে ফেরেশতার সাক্ষাৎ হয়, যেদিন খাদীজা তাঁকে ওরাক্বা ইবনে নাওফালের কাছে নিয়ে যান, ওরাক্বা ইবনে নাওফাল তাঁকে যখন বললেন, আমি যদি সে সময় জীবিত থাকতাম, যখন তোমার জাতি তোমাকে মক্কা থেকে বের করে দেবে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তখন ওরাক্বা ইবনে নাওফালকে জিজ্ঞেস করলেন, "তারা কি সত্যিই আমাকে বের করে দেবে?" অরক্বা বললেন, হ্যাঁ, যা নিয়ে তুমি এসেছো, তদ্রূপ কোন কিছু নিয়ে যে ব্যক্তিই এসেছে, তার সাথে শত্রুতা করা হয়েছে, সেই দিন থেকে তিনি নিশ্চিতভাবে অবগত ছিলেন যে, এই পথে তাঁকে কোন্ কোন্ জিনিসের সম্মুখীন হতে হবে। ফলে তিনি শুরু থেকেই কাঠিন্য, কষ্ট এবং প্রতারণা ও শত্রুতা সহ্য করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রেখেছিলেন।

তাঁর ধৈর্যের বাস্তব চিত্র তখনও ফুটে উঠেছিলো, যখন সদা-সর্বদা তাঁর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হতো। তাঁর উপর তাঁর পরিবার ও জাতির পক্ষ হতে চালানো হতো দৈহিক নির্যাতন তাঁর প্রতিপালকের পয়গমকে রোধ করার জন্য।

অনুরূপ তাঁর ধৈর্যের বাস্তব চিত্র তখন পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছিলো, যখন তিনি মক্কায় তাঁর প্রতিপালকের পায়গাম পৌঁছাতে গিয়ে স্বীয় জাতি, পরিবারবর্গ এবং নিজের বংশের লোকদের নিকট থেকে দৈহিক পীড়া প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যেমন, বুখারী শরীফে বর্ণিত যে, উরওয়া ইবনে যুবায়ের আম্‌র ইবনে আ'সকে অতীব কঠিন সে আচরণটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, যা মুশরিকরা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর সাথে করেছিলো। তিনি বললেন, 'একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) কা'বার পাশে নামায পড়ছিলেন, এমতাবস্থায় উক্ববা ইবনে আবূ মুআইত্ব তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে নিজের চাদর তাঁর গলায় জড়িয়ে খুব জোরে টান দেয়। তখন আবূ বাকার (রাঃ) তার (উক্ববার) কাঁধদু'টি ধরে তাকে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে ঠেলে সরিয়ে দেন এবং বললেন, তোমরা এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও, যিনি বলেন, আমার প্রতিপালক আল্লাহ?" (বুখারী ৩৬৭৮) অনুরূপ কোন একদিন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) কা'বার নিকট নামায পড়ছিলেন এবং আবূ জেহেল ও তার কয়েকজন সঙ্গী সেখানে বসেছিলো। এমন সময় তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, তোমাদের মধ্য থেকে কে পারে উমুক গোত্রের উঁটের বাচ্চাদানি এনে মুহাম্মাদ যখন সাজদায় যাবে তার পিঠের উপর রেখে দিতে? অতঃপর তাদের মধ্যে সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তিটি উঠে গিয়ে তা এনে অপেক্ষায় রইলো। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) যখন সাজদায় গেলেন, তখন সেই পাষন্ডটি সেটি তাঁর দু'কাঁধের মধ্যখানে পিঠের উপর রেখে দিলো। তারা হাসাহাসি করতে এবং (হেসে) একে অপরের উপর গড়িয়ে পড়তে লাগলো। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) সাজদায় ছিলেন, তিনি মাথা তুলতে পারছিলেন না। এমন সময় তাঁর মেয়ে ফাতিমা এসে তা তাঁর পিঠ থেকে সরালেন।' (বুখারী ২৪০) এর থেকেও কঠিন হলো তাঁর মানসিক কষ্ট, যা তিনি পেতেন তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলে, তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে

এবং এই অপবাদ দিলে যে তিনি জ্যোতিষী, কবি, পাগল, যাদুকর এবং যেসব নিদর্শনাবলী তিনি নিয়ে এসেছেন, তা সবই হলো, পূর্ববর্তীদের কিচ্ছাকাহিনী। এরই পর্যায়ভুক্ত হলো আবূ জেহেলের বিদ্রূপমূলক এই উক্তি, 'হে আল্লাহ! যদি এই (মুহাম্মাদ) তোমার পক্ষ থেকে সত্যবাদী হয়, তাহলে আমাদের উপরে পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করো অথবা আমাদের উপরে কঠিন আযাব নাযিল করো। তাঁর চাচা আবূ লাহাব তো সব সময় তাঁর পিছনে লেগে থাকতো যখন তিনি লোকদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য তাদের সমাবেশে এবং বাজারে যেতেন। সে (আবূ লাহাব) তাঁকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করতো এবং লোকদের নিষেধ করতো তাঁর সত্যায়ন করতে। এদিকে তার স্ত্রী উম্মে জামীল কাঁটা বিশিষ্ট ডাল কেটে এনে তাঁর পথে ফেলে রাখতো।

নির্যাতন-নিপীড়ন তার শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছে যখন তাঁকে তাঁর সাথীদের সহ তিন বছর পর্যন্ত আবূ তালিবের উপত্যাকায় অবরুদ্ধ জীবন যাপন করতে হয়। এমন কি ক্ষুধার জ্বালায় গাছের পাতাও খেতে হয়। দুঃখ তখন আরো বৃদ্ধি পায়, যখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে হারান। যিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন ও তাঁর সাহায্য করতেন। অতঃপর তাঁর চাচাও হঠাৎ করে মারা যান যিনি তাঁর হেফাযত করতেন এবং তাঁর হয়ে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতেন। আবার তার (চাচার) কুফরী অবস্থায় মারা যাওয়ায় দুঃখের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। শেষ পর্যায়ে একদিন তাঁকে হত্যা করার কয়েকবার প্রচেষ্টা চালানোর পর তাঁর মাতৃভূমি থেকে তিনি হিজরত করে চলে যান। মদীনায় ধৈর্য ও ত্যাগের নতুন জীবন শুরু হয়। সে জীবন শুধু কষ্ট ও পরিশ্রমের, ক্ষুধা ও অভাবের। ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধে রাখার জীবন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)

((لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِبْطُ بِلَالٍ))

অর্থাৎ, "আল্লাহর দ্বীনের প্রচারের কাজে আমাকে যেভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত করা হয়েছে, অন্য কাউকে সেভাবে করা হয় নি। আমাকে যেভাবে কষ্ট দেওয়া হয়েছে, অন্য কাউকে সেভাবে দেওয়া হয় নি। ত্রিশ দিন ও রাত আমার উপর এমনও অতিবাহি হয়ে গেছে যে, আমার ও বিলালের কাছে কোন প্রাণীর খাবার মত কিছুই ছিলো না, কেবল সেই স্বল্প পরিমাণটুকু ছাড়া, যা বিলাল তাঁর বগলের তলে লুকিয়ে এনেছিলেন।" (তিরমিযী ২৪৭২ ইবনে মাজা ১৫১, আহমদ ১১৮০২, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে তিরমিযী ও ইবনে মাজা আলবানী ২৪৭২-১৫১)

তাঁর সম্ভ্রমে অপবাদ দেওয়া হয়। মুনাফেক্ব ও মূর্খ বেদুঈন লোকদের পক্ষ থেকেও তাঁকে কষ্ট পেতে হয়। বরং বুখারী শরীফে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) (যুদ্ধলব্ধ মাল) বন্টন করলেন। আনসারদের হতে একজন বললো, আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদের এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের ইচ্ছা নেই। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর নিকটে এসে এ খবর তাঁকে জানালাম। (শুনে) তাঁর চেহারা পরিবর্তন হয়ে যায় এবং তিনি বলেন,

((رَحِمَ اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ))

অর্থাৎ, "আল্লাহ মুসার প্রতি রহম করুন! তাঁকে এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেওয়া হয়েছিলো, তবুও তিনি ধৈর্য ধরেছিলেন।" (বুখারী ৪৩৩৬) আর তাঁর ধৈর্য ধরার মুহূর্তগুলোর মধ্যে হলো সেই দিনগুলো, যেদিনে তাঁর ছেলেরা ও মেয়েরা মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সন্তান ছিলো সাতজন। একের পর এক তাঁরা সব মারা যান। ফাতিমা ব্যতীত তাঁদের মধ্যে কেউ অবশিষ্ট ছিলেন না। তবুও তিনি দমেও যান নি ভেঙ্গেও পড়েন নি, বরং সুন্দর ধৈর্য প্রদর্শন করেছেন। এমন কি ছেলে ইবরাহীমের মৃত্যুর দিনে তাঁর মুখ থেকে এই উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে,

((إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ))

অর্থাৎ, "চক্ষু অশ্রু ঝরায়, অন্তর ব্যথিত হয় এবং আমরা তা-ই বলবো, যাতে আমাদের প্রতিপালক সন্তুষ্ট হোন। আর হে ইবরাহীম! আমরা তোমার বিচ্ছেদে মর্মাহত।" (বুখারী ১৩০৩) আর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য কেবল নির্যাতন-নিপীড়ন এবং বিপদাপদের মধ্যেই সীমিত ছিলো না, বরং পূত-পবিত্র মহান আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রেও তিনি বড়ই ধৈর্য প্রদর্শন করেছেন। তাঁর প্রতিপালক তাঁকে এর নির্দেশও দিয়েছেন। তাই তিনি আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে এমনভাবে পরিশ্রম করতেন যে, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কারণে তাঁর পা দু'টি ফুলে যেতো। রোযা ও যিক্র সহ অন্যান্য ইবাদতসমূহ খুব বেশী বেশী করতেন। (এত বেশী কেন করেন) এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে, বলতেন, "আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?"

তাঁর ইবাদত

নবী করীম ﷺ স্বীয় প্রতিপালকের সীমাহীন ইবাদত করতেন। সব সময় যিক্র এবং চিন্তা ও গবেষণায় লেগে থাকতেন। এমন কি যখন তিনি কোন দুশ্চিন্তা ও দুঃখের শিকার হতেন, তখন বিলাল رضي الله عنهকে বলতেন, "নামাযের মাধ্যমে আমাকে স্বস্তি দাও হে বিলাল।" তিনি রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়তে গিয়ে এত সুদীর্ঘ কিয়াম করতেন যে তাঁর সুদীর্ঘ এই কিয়ামের (দাঁড়িয়ে থাকার) কারণে তাঁর পা দুটো ফুলে যেতো। তিনি কুরআনের তেলাওয়াত করতেন। আয়াতগুলো বার বার পড়তেন এবং এমনভাবে কাঁদতেন যে, অত্যধিক কাঁদার কারণে তাঁর দাড়ি ভিজে যেতো। তাঁর স্ত্রী আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে বলতেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এত কষ্ট কেন করেন আল্লাহ তো আপনার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন? তখন তিনি ﷺ বলতেন, "আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?" রাতের বেশীভাগ অংশ স্বীয় প্রতিপালকের সাথে মুনাজতে লিপ্ত থাকতেন। তাঁর কিবাত পাঠ করতেন এবং একাগ্রচিত্তে তাঁর স্মরণে মগ্ন থাকতেন।

তিনি ﷺ খুব বেশী রোযাও রাখতেন। সফরে থাকলেও রাখতেন এবং বাড়ীতেও। গরমের দিনেও রাখতেন এবং ঠান্ডার দিনেও। আবূদ্দারদা رضي الله عنه বলেন, অত্যধিক গরমের দিন, সেই আল্লাহর শপথ যিনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই সূর্যের তাপের প্রচন্ড তীব্রতার কারণে আমাদের কেউ কেউ তার হাতকে মাথার উপর রাখতো এবং তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ইবনে রাওয়াহা ব্যতীত আমরা কেউ রোযা রাখতাম না।

সাদক্বার ব্যাপারে নবী করীম ﷺ সীমাহীন দানশীল ছিলেন। তিনি তাঁর কাছে যা কিছু থাকতো সব কিছুকেই সাদক্বা করে দিতেন। তিনি কোন অভাবের ভয় না ক'রে দিয়েই যেতেন। কোন ভিক্ষুখকে কোন দিন ফিরিয়ে দিতেন না। কেউ তাঁর কাছে কোন কিছু চাইলে তাকে শূন্য হাতে ফিরাতেন না। বরং তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। যেমন, তাঁর ব্যাপারে তাঁর সাহাবীগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কোন কিছু চাইলে তিনি কখনোও না করেননি।"

তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বিষয়-বিতৃষ্ণা

কোন কিছু থেকে অনাসক্তি বশতঃ মুখ ফিরিয়ে নেওয়াকে 'যুহ্দ' বলে। এই গুণে ভূষিত কেবল তাকেই করা যায়, যার জন্য কোন জিনিস লাভ করা সহজ হয়ে যায়, কিন্তু তার প্রতি অনাসক্তি প্রদর্শন ক'রে সে তা ত্যাগ করে। আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) মানুষের মধ্যে সব চেয়ে বেশী দুনিয়ার প্রতি অনানুরক্ত ছিলেন এবং তার প্রতি তাঁর আকর্ষণ সর্বাপেক্ষা কম ছিলো। যা পেতেন, তা-ই যথেষ্ট মনে করতেন। তিনি তাঁর এই কঠিন জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। অথচ দুনিয়া ছিলো তাঁর সামনেই। তিনি হলেন আল্লাহর সৃষ্টির সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি চাইলে মহান আল্লাহ তাঁকে তাঁর ইচ্ছামত অঢেল ধন-সম্পদ দান করতেন।

ইবনে কাসীর (রাহঃ) তাঁর তফসীর গ্রন্থে খাইষামা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে বলা হলো, যদি তুমি চাও তো যমীনের ধন-ভান্ডার ও তার চাবী তোমাকে দান করবো, যা তোমার পূর্বে কোন নবীকে দান করে নি এবং তোমার পরেও কাউকে দান করবো না। আর এতে আল্লাহর নিকট তোমার জন্য যা সুরক্ষিত আছে, তা থেকেও কিছু কমবে না। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন, "বরং তা আমাকে আখেরাতে দেওয়ার জন্য জমা রাখুন!" তাঁর জীবন ও জীবিকা ছিলো বিস্ময়কর। আবূ যার (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর সাথে মদীনার উত্তপ্ত প্রস্তরময় যমীনে হেঁটে যাচ্ছিলাম। আমাদের সামনে এলো ওহুদ পাহাড়। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هَذَا ذَهَبًا تَمْضِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ))

অর্থাৎ, "ওহুদ পাহাড় সমান সোনা আমার কাছে থাকলে আমি চাইবো না যে তিনদিন অবধি তার এক দীনারও আমার কাছে থাকুক, কেবল ততটুকু পরিমাণ ছাড়া যা আমি ঋণ পরিশোধ করার জন্য রাখবো। আমি সমূহ সোনাকে আল্লাহর বান্দাদের মাঝে ডান দিকে বাম দিকে ও পিছন দিকে এইভাবে এইভাবে বন্টন করে দিবো।" (বুখারী ৬৪৪৪-মুসলিম ৯৯১) তিনি আরো বলতেন,

((مَا لِي وَمَا لِلدُّنْيَا مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا))

অর্থাৎ, "দুনিয়ার প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই এবং দুনিয়ারও আমার প্রতি কোন ভালবাসা নেই। আমি দুনিয়ায় সেই আরোহীর মত, যে কোন গাছের ছায়ায় একটু বিশ্রাম ক'রে আবারও সে ছায়া ছেড়ে চলে যায়।" (তিরমিযী ২৩৭৭-ইবনে মাজা ৪১০৯, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে তিরমিযী ও ইবনে মাজা আলবানীঃ ২৩৭৭-৪১০৯)

তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আহার ও পরিধান

তাঁর আহারের ব্যাপারটা হলো এই যে, কখনো এক মাস, দু'মাস ও তিনমাস তাঁর উপর দিয়ে এমন অবস্থায় অতিবাহিত হয়ে যেতো যে, তাঁর বাড়িতে (উনুনে) আগুন জ্বলতো না। কেবল দুই কালো বস্তু অর্থাৎ, খেজুর ও পানিই হতো তাঁর খাবার। কখনো ক্ষুধার কারণে পুরো দিন পেটের ব্যথায় ভুগতেন এবং পেটে ভরার মত কিছু পেতেন না। তাঁর (খাবার) রুটি বেশীর ভাগই হতো যবের। তাঁর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি কখনো নরম-মোলায়েম রুটি খান নি। (বুখারী ৫৩৮৫) বরং তাঁর খাদেম আনাস (রাঃ) এও উল্লেখ করেছেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর কাছে কখনোও রুটি ও গোশ্‌ত সহ দুপুরের ও রাতের খাবার একত্রে বিদ্যমান থাকে নি, কেবল সেদিন ব্যতীত যেদিন তার কাছে কোন অতিথি আসতো। (আহমদ ১৩৪৪৭)

পরিধানের ব্যাপারেও তাঁর অবস্থা উল্লিখিত অবস্থার থেকে কম ছিলো না। পরিধানের ব্যাপারেও তাঁর সাহাবা (রাযীআল্লাহু আনহুম)গণ তাঁর বিষয়-অনাসক্তি ও অনাড়ম্বরতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। অথচ অতীব মূল্যবান পোশাক পরার সামর্থ্য তাঁর ছিলো। একজন সাহাবী তাঁর পোশাকের কথা বর্ণনা ক'রে বলেছেন যে, কোন এক ব্যাপারে কথা বলার জন্য আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর কাছে এলাম, দেখলাম তিনি মোটা সুতির লুঙ্গি পরে বসে আছেন। আবূ বারদা (রাঃ) আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা)র কাছে প্রবেশ করলে, তিনি তাঁকে তালি দেওয়া একটি চাদর এবং মোটা একটি লুঙ্গি বের ক'রে দিয়ে বললেন, এই দু'টি পরিহিত অবস্থায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেন। (মুসলিম ২০৮০) আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)এর সাথে যাচ্ছিলাম তিনি পুরু পাড় বিশিষ্ট একটি নাজরানী চাদর (গায়ে) জড়িয়ে ছিলেন।' (বুখারী ৫৮০৯) মৃত্যুর সময় তিনি না রেখে গেছেন দীনার ও

দিরহাম (টাকা-পয়সা), না কোন ক্রীতদাস-দাসী আর না অন্য কোন কিছু, কেবল তাঁর সাদা খচ্চর, অস্ত্র এবং কিছু যমীন যা তিনি সাদক্বা করে গেছেন। আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা) বলেন, 'রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর মৃত্যুর সময় আমার বাড়ির তাকে সামান্য যব ব্যতীত এমন কোন জিনিস ছিলো না, যা কোন প্রাণী খেতে পারে। (বুখারী ৩৯৭-মুসলিম ২৯৭৩) অনুরূপ মৃত্যুর সময় তাঁর বর্মটা একজন ইয়াহুদীর নিকট কিছু যবের বিনিময়ে বন্ধক ছিলো। (বুখারী ২৯১৬)

তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) সুবিচার

তাঁর সুবিচার হলো, তিনি তাঁর গৌরবময় মহান প্রতিপালকের কার্যকলাপে সুবিচার করেছেন। স্বীয় নাফসের সাথে আচরণে সুবিচার করেছেন। তাঁর স্ত্রীগণের এবং অন্যান্য সকল নিকটের ও দূরের, সাথী বা বন্ধুর, যে তাঁর পক্ষের এবং যে বিপক্ষের এমন কি যে তাঁর বড় শত্রু তার সাথেও তিনি সুবিচার করেছেন। কোন জাতি তাঁর উপর অভিযোগ করেছে, কেউ তাঁর ব্যাপারে ভুল করেছে, কিন্তু তিনি কোন সময় সুবিচার ত্যাগ করেন নি। সুবিচার ছিলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর জীবনের সর্বাবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি সাহাবাগণ থেকে নিজের স্বতন্ত্রতা পছন্দ করতেন না, বরং তিনি ন্যায় ও সমতা ভাল বাসতেন। তাঁদের মত তিনিও কষ্ট-ক্লেশ ও ক্লান্তি সহ্য করতেন। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'বদরের দিন আমাদের প্রত্যেক তিনজনের জন্য ছিলো একটি উট। আবূ লুবাবা এবং আলী ইবনে আবী তালিব ছিলেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর সাথী। যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর (পায়ে হাঁটার) পালা এলো, তাঁরা দু'জন বললো, আমরা হেঁটে যাই আপনি সওয়ারীর উপরেই চলুন। তিনি বললেন,

((مَا أَنْتُمَا بِأَقْوَى مِنِّي وَلَا أَنَا بِأَغْنَى عَنْ الْأَجْرِ مِنْكُمَا))

অর্থাৎ, "তোমরা দু'জন আমার চেয়ে বেশী শক্তিশালী নও এবং আমি তোমাদের দু'জনের চেয়ে নেকীর মুখাপেক্ষী কম নই।" (আহমদ ৩৮৯১) একদা উসাই ইবনে হুযায়ের যখন সাথীদের সাথে ঠাট্টা করছিলেন এবং তাদেরকে হাসাচ্ছিলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) একটি ছড়ি দিয়ে তাঁর কোমরে খোঁচা দিলেন। তখন উসায়েদ বললেন, আপনি আমাকে ব্যথা দিয়েছেন। এখন আমাকে আপনার থেকে বদলা নিতে দিন! তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন, ঠিক আছে বদলা নাও। উসায়েদ বললেন, আপনার গায়ে জামা রয়েছে, আমার গায়ে জামা ছিলো না। তখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁর জামাটা (পিঠ) থেকে উঠিয়ে নিলেন। তখন উসায়েদ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে জড়িয়ে ধরে তাঁর কোমর ও পাঁজরের মাঝখানে চুমা দিতে লাগলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এটাই চাচ্ছিলাম। (আবূ দাউদ ৫২২৪, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে আবূ দাউদ আলবানীঃ ৫২২৪) তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) মানুষের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত রাখার তাগিদে পূত-পবিত্র মহান আল্লাহ কর্তৃক দন্ড-বিধি পরিহার করতে পছন্দ করতেন না, যদিও অপরাধী তাঁর কোন আত্মীয় ও প্রিয়জন হতো। তাই তো মাখযুমী গোত্রের মহিলার চুরির ঘটনায় উসামার সুপারিশ গ্রহণ করেন নি। এ ব্যাপারে তাঁর প্রসিদ্ধ উক্তি হলো,

((أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا))

অর্থাৎ, "হে লোক সকল! তোমাদের পূর্বের লোকেরা এই জন্য ধ্বংস হয়ে গেছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোন সম্মানিত ব্যক্তি চুরি করতো, তখন তাঁকে ছেড়ে দিতো। (তার উপর আল্লাহর দন্ড-বিধি কায়েম করতো না) আর যখন কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করতো, তখন তার উপর দন্ড-বিধি কায়েম করতো। আল্লাহর শপথ! যদি

মুহাম্মাদের বেটি ফাতিমা চুরি করতো, তাহলে আমি তাঁর হাতও কর্তন করে দিতাম।" (বুখারী ৩৪৭৫-মুসলিম ১৬৮৮)

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) সম্পর্কে মন্তব্য

নিম্নে কোন কোন দার্শনিকের ও পাশ্চাত্যের প্রাচ্যজাগতিক ভাষা ও ধর্মীয় পন্ডিতদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) সম্পর্কে কথিত বক্তব্য থেকে কতিপয় বক্তব্য তুলে ধরা হচ্ছে, এতে তাঁরা কোন পক্ষপাতিত্ব ও ইসলামের শত্রুদের প্রচার করা অসত্য উক্তির দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে এই মহান নবীর মাহাত্ম্য, তাঁর নবূওয়াত, তাঁর প্রশংসনীয় গুণ এবং তাঁর আনীত দ্বীনের সততার স্বীকারুক্তি পরিষ্কারভাবে পেশ করেছেন।

ব্রিটেনের বার্নার্ডশো (Bernard Shaw) তার রচিত বই 'মুহাম্মাদ'এ লিখেছেন, (যে বইটা ব্রিটিশ সরকার জ্বালিয়ে দিয়েছে) বিশ্বের মুহাম্মাদের মত একজন চিন্তাবিদের অতীব প্রয়োজন। এই নবী তাঁর দ্বীনকে বড় সম্মান ও শ্রদ্ধার স্থানে রেখেছেন। কারণ, ইসলামই এমন বৃহত্তর ধর্ম, যা সকল সভ্যতার চিরকালীন পরিবর্তন এনেছে। আমি আমার জাতির অনেককে দেখেছি যে, তারা জ্ঞানের আলোকে এই দ্বীনে প্রবেশ করেছে। আর এই দ্বীন ইউরোপ মহাদেশে বড় বিস্তার লাভ করবে। তিনি বলেন, মধ্য যুগের ধর্মের পন্ডিতরা মুর্খতা অথবা পক্ষপাতিত্বের বশবর্তী হয়ে মুহাম্মাদের দ্বীনকে কু-শ্রীরূপে চিত্রিত করেছে। তারা তাঁকে খ্রীষ্টধর্মের শত্রু মনে করতো। কিন্তু আমি এই ব্যক্তি সম্পর্কে পড়ে বড় বিস্ময়কর ও অলৌকিক জিনিস পেয়েছি এবং এই পরিণামে পৌঁচেছি যে, তিনি খ্রীষ্টধর্মের শত্রু ছিলেন না, বরং তাঁকে মানবতার মুক্তিদাতা আখ্যা দেওয়া আবশ্যক। আর আমার মতে তিনি যদি আজ বিশ্বের নেতৃত্ব দিতেন, তাহলে আমাদের সমূহ সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো এবং সেই শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতো, যার প্রতি মানুষ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে।

স্কটলেন্ডের নভেল পুরস্কার লাভকারী টমাস কারলাইল (Thomas Carlyle) তার কিতাব 'বীর'এ বলেছেন, বর্তমান যুগের প্রত্যেক মানুষের সব চেয়ে বড় দোষ হলো এই কথার প্রতি কান দেওয়া যে, ইসলাম একটি মিথ্যা ধর্ম এবং মুহাম্মাদ একজন প্রতারক ও মিথ্যুক। আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক হলো, এই ধরনের অসংগত ও লজ্জাকর কথাসমূহের প্রচার-প্রসারের বিরুদ্ধে রোখে দাঁড়ানো। কারণ, এই রাসূল যে বার্তা ও পায়গাম পেশ করেছেন, তা প্রায় কুড়ি কোটি মানুষের জন্য ১২ শতাব্দি কাল ধরে উজ্জ্বল প্রদীপ হয়ে রয়েছে। (তবে এ হিসাব নবূওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে টমাসের বই লেখার যুগ পর্যন্ত) তোমাদের কেউ কি মনে করতে পারে যে, এই পয়গম্বরের বার্তা ও পায়গাম যার উপর অসংখ্য মানুষ জীবন-যাপন করলো ও মৃত্যুবরণ করলো, তা মিথ্যা ও প্রতারণা?

হিন্দু দার্শনিক রামকৃষ্ণ রাও লিখেছেন, মুহাম্মাদের আবির্ভাবের সময় আরব দ্বীপে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলো না। এই মরুভূমি থেকে যেখানে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলো না, মুহাম্মাদ তাঁর মহান আত্মার দ্বারা সমর্থ হয়েছেন নতুন বিশ্ব, নতুন জীবন, নতুন সংস্কৃতি, নতুন সভ্যতা এবং এমন নতুন দেশ গঠন করতে, যা মারাকেশ (মরক্কো একটি শহর) থেকে ভারত উপ-মহাদেশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে এবং এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের মত তিনটে মহাদেশের জীবন ধারা ও চিন্তা-চেতনায় প্রভাব সৃষ্টি করতেও সক্ষম হয়েছেন।

কানাডার প্রাচ্যজাগতিক ভাষা ও ধর্মের পন্ডিত জুয়েমার (Zweimer) বলেন, মুহাম্মাদ নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা মহান ধর্ম-নেতা ছিলেন। তাঁর ব্যাপারেই এ কথা যথাযথ যে, তিনি সমর্থ-সক্ষম সংস্কারক, শুদ্ধভাষী ও বাক্যালাপে পারদর্শী, নির্ভীক বীর এবং মহান চিন্তাবিদ ছিলেন। তাঁকে (উল্লিখিত) এই গুণগুলোর পরিপন্থী গুণে আখ্যায়িত করা বৈধ নয়। তাঁর আনীত এই কুরআন এবং তাঁর ইতিহাস এই দাবীর সত্যতার সাক্ষ্য দেয়।

জনাব উইলিয়াম মুয়ার (William Muir) বলেছেন, মুসলিমদের নবী মুহাম্মাদ তাঁর দেশবাসীর ঐক্যমতে শিশুকাল থেকেই স্বীয় উচ্চ নৈতিকতা ও উত্তম ব্যবহারের কারণে 'আল-আমীন' (আমানতদার) উপাধি লাভ

করেছিলেন। সেখানে (তাঁর সাথে) যা কিছু হয়ে থাকুক না কেন, তিনি বর্ণনাকারীর বর্ণনার অনেক উর্ধ্বে। তাঁর ব্যাপারে অজ্ঞ ব্যক্তি তাঁর সম্মান বুঝতে পারবে না। আর তাঁর ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁর সেই গৌরবময় ইতিহাসের প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করেন, যে ইতিহাস মুহাম্মাদকে বিশ্বের নবীদের মধ্যে এবং চিন্তাবিদদের মধ্যে শীর্ষস্থান দান করেছে। তিনি বলেন, এটাও মুহাম্মাদের পৃথক বৈশিষ্ট্য যে, তাঁর বাক্য শুদ্ধ-পরিষ্কার এবং তাঁর দ্বীন সহজ। তিনি এমন কর্মসমূহ সম্পাদন করেছেন যে বিবেক-বুদ্ধিকে বিস্মিত করে দেয়। ইতিহাস এমন সংস্কারককে জানতে সক্ষম হয় নি, যে ঐভাবে মানুষের মাঝে জাগরণ আনতে পেরেছে, সচ্চরিত্রতাকে জীবিত করতে পেরেছে এবং সংক্ষিপ্ত সময়ে নৈতিকতার মান সমুন্নত করতে পেরেছে, যেভাবে ইসলামের নবী মুহাম্মাদ পেরেছেন।

রাশিয়ার মহান ঔপন্যাসিক ও দার্শনিক লিও টৌল্‌সটয় (Leo Tolstoy) বলেছেন, মুহাম্মাদের গৌরবের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তিনি জঘন্য নিষ্ঠুর জাতিকে শয়তানের নিকৃষ্টতম কু-অভ্যাস ও কু-কর্মের পাঞ্জা থেকে মুক্তি করেছেন এবং তাদের সামনে উন্নতি ও অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। অবশ্যই মুহাম্মদের শরীয়ত সারা পৃথিবীতে ছেয়ে যাবে, কারণ তা জ্ঞান ও যুক্তির সাথে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ।

অস্ট্রিয়া (Austria) বলেন, মানবতা মুহাম্মাদের মত একজন মানুষের সাথে সম্পর্কিত হয়ে গর্ববোধ করে। কারণ, তিনি নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও প্রায় ১৪ শতাব্দির পূর্বে এমন বিধি-বিধান নিয়ে এসেছেন যে, আমরা ইউরোপীয়রা সর্বাধিক ভাগ্যবান হতে পারবো, যদি আমরা তার শীর্ষে পৌঁছতে পারি।

أحكام اليوم الآخر
শেষ দিবস

শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের ছয়টি মূল ভিত্তি ও রূকনসমূহের মধ্যে অন্যতম ভিত্তি ও রূকন। কোন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ এদিবস সম্পর্কে অবতীর্ণ কুরআনের আয়াত ও বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীসে রাসূলের উপর ঈমান না আনে। মানুষের আত্মার সংশোধন, তার আল্লাহভীতি ও আল্লাহর দ্বীনে অবিচল-অনড় থাকার ক্ষেত্রে শেষ দিবস সম্পর্কে জ্ঞান ও তার অধিকাধিক স্মরণের বিরাট প্রভাব রয়েছে। উক্ত দিনের ভয়াবহতা, আতঙ্ক ও ভীষণ পরিস্থিতির স্মরণ করা থেকে বিমুখ হওয়াই মানুষের অন্তরকে করে পাষাণ, উদ্বুদ্ধ করে তাকে পাপ করতে। সেদিনের ভয়াবহতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيباً ﴾ (المزمل:١٧)

অর্থাৎ, "অতএব, তোমরা কিরূপে আত্মরক্ষা করবে যদি তোমরা সেদিনকে অস্বীকার করো, যেদিন বালক-দেরকে করে দিবে বৃদ্ধ? (সূরা মুযযাম্মিল ১৭) তিনি আরো বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ ﴾ (لحج:١-٢)

অর্থাৎ, "হে মানব জাতি, তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, নিঃসন্দেহে কিয়ামতের কম্পন বড় ভয়াবহ জিনিস। যেদিন তোমরা তাকে দেখবে সেদিন অবস্থা এই হবে যে, প্রত্যেক স্তন্য দানকারিণী নিজের দুগ্ধপোষ্য সন্তান থেকে গাফেল হয়ে যাবে। গর্ভবতী নারীর গর্ভ খসে পড়বে এবং লোকদেরকে তোমরা উদভ্রান্ত দেখতে পাবে। অথচ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না, বরং আল্লাহর আযাবই এত দূর সাংঘাতিক হবে"। (২২ঃ ১-২)

মৃত্যুঃ এই পৃথিবীর প্রত্যেক জীবের শেষ পরিণতি হচ্ছে মৃত্যু। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ (آل عمران:١٨٥)

অর্থাৎ, "প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে"। (সূরা আলে-ঈমানঃ ১৮৫) তিনি আরো বলেন,

﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴾ (الرحمن:٢٦)

অর্থাৎ, "এ পৃথিবীতে সবই ধ্বংসশীল।" (সূরা আররাহমানঃ ২৬) তিনি তাঁর নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴾ (الزمر:٣٠)

অর্থাৎ, "আপনিও মৃত্যু বরণ করবেন আর তারাও মরবে"। (সূরা যুমারঃ৩০) এ বিশ্ব চরাচরে কোন মানুষের জন্য চিরস্থায়িত্ব নেই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ﴾ (الانبياء:٣٤)

অর্থাৎ, "চিরন্তনতা তো তোমার পূর্বের কোন মানুষের জন্য সাব্যস্ত করে দেই নি"। (সূরা আম্বিয়াঃ ৩৪)

মৃত্যু সম্পর্কীয় কিছু বিষয়

১। মৃত্যু একটি নিশ্চিত বস্তু তাতে কোন সন্দেহ নেই। অথচ অধিকাংশ লোকই তা থেকে গাফেল। একজন মুসলিমের করণীয় হলো, মৃত্যুর কথা বেশী বেশী স্মরণ করা এবং তার জন্য সদা-সর্বদা প্রস্তুত থাকা। অনুরূপ-ভাবে দুনিয়া থাকতে সময় ফুরিয়ে যাবার পূর্বে আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয় করা। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((اِغْتَنِمْ خَمساً قَبْلَ خَمْسٍ، حَيَاتُكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَشَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ)) مسند الإمام أحمد

অর্থাৎ, "পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের পূর্বে মূল্যবান মনে করো, তোমার জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে, তোমার সুস্থতাকে অসুস্থতার পূর্বে, তোমার অবসরকে ব্যস্ততার পূর্বে, তোমার যৌবনকে বার্ধক্যের পূর্বে এবং তোমার স্বচ্ছলতা-প্রাচুর্যকে দরিদ্রতার পূর্বে।"(মুসনাদ আহমদ) জেনে রাখুন, মৃত ব্যক্তি পার্থিব কোন সম্পদ কবরে বয়ে নিয়ে যাবে না।থাকবে তাঁর সঙ্গে শুধুমাত্র তার আমল। সুতরাং ভাল কাজের পাথেয় সংগ্রহ করতে আগ্রহী হোন, যা আপনাকে দেবে চিরস্থায়ী আনন্দ এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর আযাব থেকে মুক্তি ও পরিত্রাণ।

২। মানুষের জীবনের সময় সীমা এমন একটি রহস্য ও গোপন বস্তু, যা একমাত্র মহান আল্লাহ জানেন, অন্য কেউ নয়। কেউ জানে না যে, সে কোথায় মরবে এবং কখন মরবে।কারণ, সেটা গায়েবের ইলম্ তথা অদৃশ্য জগতের জ্ঞান, যা এক ও এককভাবে মহান আল্লাহই জানেন।

৩। মৃত্যু এলে তা দমন, প্রতিহত করা বা পিছিয়ে দেয়া কিংবা তা থেকে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।আল্লাহ পাক বলেন,

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ (لأعراف:٣٤)

অর্থাৎ, "প্রত্যেক জাতির জন্য অবকাশের একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে। তাদের সেই মেয়াদ যখন পূর্ণ হয়ে আসে, তখন এক নিমেষেরও আগে কি পরে হয় না।" (সূরা আ'রাফঃ৩৪)

৪। মু'মিনের নিকট যখন মৃত্যু আসে, তখন মৃত্যুর ফেরেশতা সুন্দর মনোহর রূপ ও আকৃতি নিয়ে উপস্থিত হোন। সুগন্ধে ভরে যায় পরিবেশ। আর তাঁর সাথে থাকেন রহমতের ফেরেশতা, যাঁরা উক্ত ব্যক্তিকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন।আল্লাহ পাক বলেন,

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ المَلائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ (فصلت:٣٠)

অর্থাৎ, "যে সব লোক বললো, আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক ও মালিক এবং তারা এর উপর সুদৃঢ় ও অটল থাকলো, নিঃসন্দেহে তাদের জন্য ফেরেশতা অবতরণ ক'রে বলেন, ভয় পেয়োনা, চিন্তা করো না আর সেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে সন্তুষ্ট হও, তোমাদের নিকট যার অঙ্গীকার করা হয়েছে।" (সূরা ফুস্সিলাত ১ঃ ৩০)

পক্ষান্তরে কাফেরের কাছে মৃত্যুর ফেরেশতা ভীতিপ্রদ আকৃতি ধারণ করে ও কালো চেহারা নিয়ে আসেন এবং তাঁর সাথে থাকে আযাবের ফেরেশতা যাঁরা তাকে আযাবের দুঃসংবাদ দেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ المَوْتِ وَالمَلائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾ (الأنعام: ٩٣)

অর্থাৎ, "যদি আপনি দেখেন যখন যালেমরা মৃত্যু-যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত ক'রে বলেন, বের করে দাও তোমাদের আত্মা! অদ্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহর উপর অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াতের মোকাবিলায় অহংকার ও বিদ্রোহ করতে।" (সূরা আনআমঃ ৯৩)।

মৃত্যু এলে বাস্তব সত্য উন্মোচিত হয়ে যাবে এবং আসল তত্ত্ব প্রত্যেক মানুষের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ* لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ (المؤمنون:٩٩-١٠٠)

অর্থাৎ, "যখন তাদের কারো কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলে, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন, যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি। কখনই নয়, এ তো তার একটি কথার কথা মাত্র। তাদের সামনে অন্তরায় আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।" (সূরা মু'মিনুনঃ৯৯-১০০)। মৃত্যু এলে কাফের ও পাপী লোক ভাল ও সৎকাজ করার জন্য পুনরায় পার্থিব জীবনের দিকে ফিরে যেতে চাইবে কিন্তু সময় শেষ হওয়ার পর অনুশোচনা কোন কাজে আসবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ (الشورى: من الآية٤٤)

অর্থাৎ, "তুমি দেখতে পাবে এসব যালিম লোকেরা যখন আযাব দেখবে, তখন বলবে, এখন ফিরে যাবার কোন পথ কি আছে'? (সূরা শুরাঃ ৪৪)

৫। বান্দাগণের উপর আল্লাহর অশেষ করুণা ও রহমত যে,যার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে শেষ বাক্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' হবে, সে জান্নাত লাভ করবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ)) أخرجه أبوداود ٣١١٦

অর্থাৎ, "দুনিয়ায় যার শেষ বাক্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'। (আবূ দাউদ ৩১১৬) কারণ, এমনি মুমূর্ষ অবস্থা ও সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে কালেমার ব্যাপারে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছাড়া কোন মানুষের পক্ষে তা উচ্চারণ করা সম্ভব হবে না।নিষ্ঠাহীন ব্যক্তি তো মৃত্যুর যাতনায় তা ভুলে যাবে। একারণেই মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তিকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'এর স্মরণ দেয়া সুন্নাত। যেমন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)) رواه مسلم ٩١٦

অর্থাৎ, "তোমরা তোমাদের মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তিকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ' পড়তে বলো।" (মুসলিম ৯১৬) তবে তার উপর বেশী চাপ সৃষ্টি করবে না, যাতে সে বিরক্ত হয়ে কোন অসংগত কথা বলে না ফেলে।

কবর

আনাস (রাঃ) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ قَالَ يَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ قَالَ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ قَالَ فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنْ النَّارِ قَدْ

أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا)) ((وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ))

অর্থাৎ, "যখন বান্দাকে কবরে দাফন করা হয় এবং তাঁর সঙ্গী সাথীরা ফিরে যায়, তখন সে তাদের জুতোর শব্দ শুনতে পায়, এমতাবস্থায় দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে উঠিয়ে বসান এবং তাকে বলেন, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বল? রাসূল (সাঃ)বলেন, 'সে যদি মু'মিন হয়, তাহলে বলবে,আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল'। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন, 'তখন তাকে বলা হবে, দেখ! দোযখে তোমার স্থান, আল্লাহ তার পরিবর্তে বেহেশতের একটি বাসস্থান দান করেছেন'। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন, সে উভয় স্থান অবলোকন করবে'। কিন্তু যখন কাফের বা মুনাফেককে বলা হবে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বল? তখন সে বলবে, আমি জানি না, লোকেরা যা বলতো, আমিও তাই বলতাম। অতঃপর তাকে বলা হবে, না তোমার জ্ঞান ছিল; না যাদের জ্ঞান ছিল, তাদের অনুসরণ করেছিলে। অতঃপর লোহার হাতুড়ি দ্বারা এমন এক প্রচন্ড আঘাত করা হবে যে, তার ফলে সে এমন চিৎকার করবে, যা মানুষ ও জ্বীন ছাড়া কবরের পার্শ্বস্থ সব কিছু শুনতে পাবে। (বুখারী ১৩৩৮-মুসলিম ২৮৭)

কবরে মানুষের দেহে প্রাণ ফিরে আসার বিষয়টি আখেরাত সংশ্লিষ্ট বিষয় হেতু মানুষের বিবেক-বুদ্ধি এ পৃথিবীতে তা অনুধাবন করতে পারে না। মুসলিমদের ঐক্যমত বিশ্বাস যে, মানুষ প্রকৃত মু'মিন ও অফুরন্ত সুখের যোগ্য হলে, সে কবরে আরাম উপভোগ করবে অথবা শাস্তির যোগ্য হলে, সে শাস্তি পাবে, যদি আল্লাহ তাকে ক্ষমা না করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ (غافر:٤٦)

অর্থাৎ, "সকাল ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয়। আর যখন কেয়ামতের মুহূর্ত আসবে, তখন নির্দেশ হবে যে, ফেরাউনের দলবলকে কঠিনতর আযাবে নিক্ষেপ করো।" (সূরা গাফিরঃ ৪৬)। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ)) رواه مسلم ٢٨٦٧

অর্থাৎ, "কবরের আযাব থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও।" (মুসলিম ২৮৬৭) সুষ্ঠুবিবেকও তা অস্বীকার করে না। কারণ,মানুষ এ পার্থিব জীবনে তার সাদৃশ্য বা কাছাকাছি বস্তু দেখে। ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে অনুভব করে যে, তাকে কঠিনতর শাস্তি দেয়া হচ্ছে আর সে চীৎকার ক'রে অন্যের সহযোগিতা কামনা করছে, কিন্তু তার পাশের ব্যক্তি এ সম্পর্কে কিছুই অনুভব করে না। অথচ জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে বিরাট তফাৎ রয়েছে। কবরে শাস্তি দেহ ও প্রাণ (আত্মা) উভয়ের উপর হবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ)) رواه الترمذي ٢٣٠٨

অর্থাৎ, "কবর হচ্ছে আখেরাতের প্রথম মাঞ্জিল, যে তা থেকে মুক্তি পাবে, পরবর্তীতে আরো সহজে মুক্তি পাবে। আর যে কবর থেকে মুক্তি পাবে না, সে পরবর্তীতে আরো কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হবে।" (তিরমিজী

২৩০৮, হাদীসটি হাসান/ভাল, দ্রষ্টব্যঃ সুনানে তিরমিযী আলবানী রাহঃ) মুসলিমদের উচিত কবরের আযাব থেকে মুক্তি কামনা করা, বিশেষ করে নামাযের সালাম ফিরার পূর্বে।অনুরূপ সেই সকল পাপ থেকে দূরে থাকা, যা কবরের আযাব ও দোজখের আগুন ভোগ করার প্রধান কারণ। 'কবরের আযাব' বলা হয়, কারণ অধিকাংশ মানুষকে কবরে দাফন করা হয়। তবে পানিতে ডুবেগেলে বা আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেলে কিম্বা হিংস্র পশু খেয়ে ফেললেও বারযাখে আযাব বা আরাম ভোগ করবে।

কবরে আযাব বিভিন্ন প্রক র হয়ে থাকে। যেমন লোহা বা অন্য কিছুর হাতুড়ি দ্বারা আঘাত করা, অন্ধকার দিয়ে কবর পূর্ণ করে দেয়া, আগুনের বিছানা বিছিয়ে দেয়া, দোযখের দিকে দরজা খুলে দেয়া, তার খারাপ ও পাপ কাজগুলো একজন কুশ্রী দুর্গন্ধময় ব্যক্তির রূপ ধারণ করে তার সাথে কবরে থাকা। মুনাফিক বা কাফের হলে আযাব অব্যাহত থাকবে। পাপী মু'মিনের পাপ অনুসারে আযাব বিভিন্ন প্রকার হবে, আর সে আযাব নির্দিষ্ট সময়ের পর বন্ধ হয়ে যবে। পক্ষান্তরে মু'মিন কবরে আরাম ও পরম সুখ উপভোগ করবে। কবর তার জন্য প্রশস্ত করে দেয়া হবে, আলো দ্বারা তার কবর সমুজ্জ্বল করা হবে, বেহেশতের দিকে দরজা খুলে দেয়া হবে, যা দিয়ে আসবে বেহেশতের হাওয়া ও সুঘ্রাণ, বেহেশতের বিছানা বিছিয়ে দেয়া হবে এবং তার সৎকার্যসমূহ এমন সুদর্শন ব্যক্তির রূপ ধারণ করবে, যার সংস্পর্শে সে পাবে স্বস্তি ও সন্তুষ্টি।

কিয়ামত ও তার কিছু নিদর্শন

১। আল্লাহ পাক এ বিশ্বকে চিরস্থায়িত্বের জন্য সৃষ্টি করেন নি। বরং এমন এক দিন আসবে যেদিন এ দুনিয়া নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে আর সেদিনটাই হবে কিয়ামত দিবস।এটা একটি ধ্রুব সত্য যাতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ (غافر:٥٩)

অর্থাৎ, "নিশ্চয় কিয়ামত আসবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বিশ্বাস করে না" (সূরা গাফিরঃ ৫৯) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ﴾ سبأ :٣

অর্থাৎ, "কাফেররা বলে, কিয়ামত আমাদের কাছে আসবে না। তুমি বলে দাও, আমার প্রতিপালকের শপথ! কিয়ামত তোমাদের নিকট অবশ্যই আসবে।" (সূরা সাবাঃ৩) কিয়ামত নিকটবর্তী একটি সত্য। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ﴾ [القمر ١]

অর্থাৎ, "কিয়ামতের মুহূর্ত নিকটবর্তী হয়েছে।" (সূরা ক্বামারঃ ১)। আল্লাহ পাক আরো বলেন,

﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴾ [الأنبياء:١]

অর্থাৎ, "অতি নিকটে এসে গেছে লোকদের হিসাব-নিকাশের মুহূর্ত অথচ তাঁরা এখনো গাফলাতের মধ্যে বিমুখ হয়ে পড়ে আছে।" (সূরা আম্বিয়াঃ ১) কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়াটা মানুষের অনুমানের মাপকাঠিতে নয় এবং তাদের জ্ঞান ও জানা-শুনার আলোকে নয়, বরং সেটা আল্লাহর অসীম জ্ঞান এবং দুনিয়ার গত হওয়া সময় হিসাবে খুবই নিকটবর্তী বলা হয়েছে।

কিয়ামতের মহূর্তটির জ্ঞান গায়েবের ইলম যা একমাত্র আল্লাহই জানেন। সৃষ্টির কাউকে তিনি এবিষয়ে অবগত করেন নি। আল্লাহ তায়া'লা বলেন,

﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً﴾ (الأحزاب:٦٣)

অর্থাৎ, "লোকেরা তোমায় জিজ্ঞাসা করে যে, কিয়ামত কখন আসবে? বলো, তার জ্ঞান আল্লাহর নিকট রয়েছে; তুমি কি করে জানবে। সম্ভবত তা খুব নিকটে উপস্থিত হয়ে গেছে।" (সূরা আহযাবঃ৬৩) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এমন কিছু নিদর্শনের বর্ণনা দিয়েছেন, যা কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার কথা প্রমাণ করে। তার মধ্যে অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে দাজ্জালের আবির্ভাব। সে হবে মানুষের জন্য এক মহা ফেতনা, বিপর্যয় ও পরীক্ষা। আল্লাহ পাক তাকে অলৌকিক কতিপয় বস্তু সম্পাদন করার ক্ষমতা দেবেন। ফলে অনেক মানুষ ধোকার ধূম্রজালে আটকা পড়বে। সে আকাশকে নির্দেশ দিলে বৃষ্টি বর্ষণ করবে, ঘাসকে নির্দেশ দিলে উৎপন্ন হবে এবং মৃত্যু ব্যক্তিকে জীবিত করতে পারবে, আরো অনেক কিছু। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এও উল্লেখ করেছেন যে, সে কানা হবে, দোযখ ও বেহেশ্তের দৃশ্য ও নমুনা নিয়ে আসবে।সে যেটাকে বেহেশ্ত বলবে, সেটা হবে দোযখ এবং যেটাকে দোযখ বলবে, সেটা হবে বেহেশ্ত। এ পৃথিবীতে সে চল্লিশ দিন বাস করবে। প্রথম একদিন এক বছরের সমান, আরেক দিন এক মাসের সমান, আরেক দিন এক সপ্তাহের সমান, এবং অবশিষ্ট দিনগুলো স্বাভাবিক দিনের মত হবে। মক্কা ও মদীনা ছাড়া পৃথিবীর এমন কোন স্থান অবশিষ্ট থাকবে না, যেখানে সে প্রবেশ করবে না।

কিয়ামতের আরো নিদর্শনসমূহের মধ্যে হচ্ছে, পূর্ব দামেস্কের একটি সাদা মিনারে ফজরের নামাযের সময় ঈসা ইবনে মরিয়াম (আলাইহিস্সালাম) এর অবতরণ। তিনি লোকদের সাথে ফজরের নামাজ আদায় করবেন। অতঃপর দাজ্জালকে খুঁজবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। কিয়ামতের আরেক নিদর্শন হচ্ছে, পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয়। মানুষ যখন তা দেখবে, তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ঈমান আনা আরম্ভ করবে কিন্তু সে ঈমান আর কোন কাজে আসবে না। এতদ্ব্যতীত আরো অনেক কিয়ামতের নিদর্শন রয়েছে।

২। সর্বাপেক্ষা দুষ্ট ও অসৎ লোকের উপর কিয়ামত কায়েম হবে। কারণ, আল্লাহ পাক ইতিপূর্বে সুঘ্রাণময় এমন এক বাতাস প্রেরণ করবেন, যা মু'মিনদের প্রাণ কবজ করে নেবে। মহান আল্লাহ যখন সমস্ত সৃষ্টিজগতকে নিশ্চিহ্ন করার ইচ্ছা করবেন, তখন ফেরেশতাকে সুর (বিশাল বাঁশি) ফুঁকার নির্দেশ দেবেন। মানুষ তা শোনা মাত্র অজ্ঞান হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন,

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ﴾ (الزمر: ٦٨)

অর্থাৎ, "আর সে দিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে।আর যারা আকাশ মন্ডল ও যমিনে আছে, সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে। তবে আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা করেন (কেবল সেই লোক ছাড়া)।"(সূরাঃ৬৮)। আর সে দিনটি হবে শুক্রবার অতঃপর ফেরেশতাকুল মৃত্যু বরণ করবেন। মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ বেঁচে থাকবে না।

৩। মানুষের দেহ কবরে ক্ষয় হয়ে যাবে।পিঠের নিম্নভাগের হাড়ের মূলাংশ ব্যতীত মাটি সারা দেহ খেয়ে ফেলবে। কেবল আম্বিয়ায়ে কেরামদের দেহ মাটি খেতে পারবে না। আল্লাহ পাক আকাশ হতে এক প্রকার বৃষ্টিপাত করে দেহগুলোকে সজীব-সতেজ করবেন। যখন তিনি মানুষের পুনরুত্থান ও পুনরুজ্জীবনের ইচ্ছা করবেন, তখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা ইসরাফীলকে জীবিত করে শিঙ্গায় দ্বিতীয়বার ফুঁক দেয়ার নির্দেশ দেবেন। অতঃপর তিনি সৃষ্টিকুলকে জীবিত করবেন এবং মানুষকে তাদের কবর থেকে প্রথমবার সৃষ্টি করার ন্যায় জুতাবিহীন, উলঙ্গদেহ ও খাতনাবিহীন অবস্থায় উঠাবেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾(يس:٥١)

অর্থাৎ, "পরে এক শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। আর সহসা তারা নিজেদের প্রতিপালকের সমীপে উপস্থিত হওয়ার জন্য কবরসমূহ হতে বের হয়ে পড়বে" (সূরা ইয়াসীনঃ৫১)। আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

﴿يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ، خَاشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ﴾ المعارج: ٤٣-٤٤

অর্থাৎ, "সেদিন তারা কবর হতে দ্রুতবেগে বের হবে-যেন তারা কোন এক লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে যাচ্ছে। তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনমিত, তারা হবে হীনতাগ্রস্ত। এটাই সেইদিন, যার ওয়াদা তাদেরকে দেওয়া হতো।" (সূরা মাআরিজঃ৪৩-৪৪) কবর হতে সর্ব প্রথম যিনি বের হবেন, তিনি হবেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)। অতঃপর মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। হাশরের ময়দান এক বিরাট প্রশস্ত বিস্তৃত স্থান। কাফেরদের হাশর হবে তাদের মুখের উপর (অর্থাৎ চেহারা দিয়ে চলবে, পা দিয়ে নয়)। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কিভাবে তাদের মুখমন্ডল দিয়ে হাশর হবে? তিনি উত্তরে বলেন,

((قَالَ أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) متفق عليه ٤٧٦٠-٢٨٠٦

অর্থাৎ, " যে মহান সত্তা তাদেরকে পা দ্বারা চালাতে পারেন, তিনি কি তাদেরকে কিয়ামতের দিন মুখ দিয়ে চালাতে সক্ষম নন?" (বুখারী৪৭৬০-মুসলিম২৮০৬) আল্লাহর যিক্র হতে বিমুখ ব্যক্তির হাশর হবে অন্ধা-বস্থায়। সূর্য মানুষের অতি নিকটে আসবে, মানুষ নিজেদের আমল অনুসারে ঘামে আচ্ছন্ন থাকবে; কেউবা গোড়ালী পর্যন্ত, আর কেউ কোমর পর্যন্ত আর কেউ ঘামে নাক বরাবর নিমজ্জিত থাকবে। কিন্তু সেদিন আল্লাহ নিজের ছায়ায় কয়েক প্রকার লোকদেরকে স্থান দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَدْلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ)) متفق عليه ١٠٣١-١٤٢٣

অর্থাৎ, "সাত প্রকার লোককে আল্লাহ নিজের ছায়ায় স্থান দেবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক, (২) যে যুবক আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে বড় হলো, (৩) যে ব্যক্তির অন্তর মসজিদের সঙ্গে ঝুলে থাকে, (৪) যে দু'ব্যক্তি আল্লাহর নিমিত্ত ভালবেসে একত্রিত হয়েছে এবং তাঁরই নিমিত্ত বিচ্ছিন্ন হয়েছে, (৫) সে ব্যক্তি যাকে এক সম্ভ্রান্ত ও সুন্দরী মহিলা (ব্যভিচারের জন্য) আহ্বান করলে সে বললো, আমি আল্লাহকে ভয় করি, (৬) সে ব্যক্তি যে এত গোপনীয়তা রক্ষা করে দান করে যে, তার বামহাত জানে না যে, তার ডানহাত কি খরচ করেছে, (৭) আর সে ব্যক্তি, যে আল্লাহকে নিভৃত নির্জন স্থানে স্মরণ করে এবং তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু বের হয়।" (বুখারী ১৪২৩-মুসলিম ১০৩১) আর হিসাব শুধু পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট নয়, বরং মহিলাদেরকেও কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। যদি ভাল হয়, তো ভাল প্রতিদান পাবে। আর মন্দ হলে, মন্দ ফলাফল ভোগ করবে। পুরুষের প্রতিদান ও হিসাব-নিকাশ যেমন, তেমনি মহিলাদেরও।

সেদিন মানুষকে চরম পিপাসা লাগবে, যে দিনটি হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। তবে এ দীর্ঘ সময় মু'মিনদের কাছে এক ওয়াক্ত ফরয নামায আদায়ের মত দ্রুত অতিবাহিত হয়ে যাবে। মুসলিমগণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর 'হাওযে কাওসারে' আসবে এবং পান করবে। 'হাওয' আল্লাহর এক

বিশেষ দান, যা তিনি আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে দান করেছেন। কিয়ামতের দিবসে তাঁর উম্মাত এর পানি পান করবে। উক্ত হাওযের পানি দুধের চেয়েও সাদা, মধুর চেয়েও মিষ্টি এবং মিস্কের চেয়েও সুগন্ধময় হবে। আর পানপাত্র হবে আকাশের নক্ষত্রের সমান। যে একবার পান করবে, সে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না।

মানুষ হাশরের মাঠে এক সুদীর্ঘ কাল বিচার ফায়সালা ও হিসাব-নিকাশের অপেক্ষা করবে। সূর্যের প্রচন্ড তাপে ও কঠিন পরিস্থিতিতে যখন অপেক্ষা ও দাঁড়িয়ে থাকার কাল দীর্ঘ হয়ে যাবে, তখন বিচার শুরু করার জন্য লোকেরা আল্লাহর নিকট সুপারিশ করতে লোক খুঁজবে। অতঃপর তারা আদম (আলাইহিস্সালাম) এর কাছে আসবে। তিনি অপারগতা প্রকাশ করবেন। অনুরূপভাবে হযরত নূহ, ইবরাহীম, মুসা ও ঈসা (আলাইহিমুস্সালাম)দের কাছেও আসবে। তাঁরা সকলে একের পর এক অক্ষমতা ও অপারগতা পেশ করবেন। অবশেষে হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর নিকট এলে, তিনি বলবেন, এ কাজ তো আমারই। অতঃপর তিনি আরশের নিচে সেজদাবনত হয়ে আল্লাহর এমন কিছু প্রশংসার বাক্য দিয়ে প্রশংসা করবেন, যা সেদিন আল্লাহ তাঁকে শিখিয়ে দেবেন। অতঃপর বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! তোমার মাথা তোল এবং প্রার্থনা কর, তোমার প্রার্থনা গৃহীত হবে এবং সুপারিশ কর, কবুল করা হবে। আল্লাহ তা'য়ালা ফায়সালা ও হিসাব শুরু হওয়ার অনুমতি প্রদান করবেন। উম্মাতে মুহাম্মদীয়ার হিসাব প্রথমেই শুরু হবে।

সর্ব প্রথম বান্দার নামায সম্পর্কে হিসাব-নিকাশ শুরু হবে। যদি তার নামায বিশুদ্ধ ও গৃহীত হয়, তবে অবশিষ্ট অন্যান্য আমলের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হবে। অন্যথায় তাঁর সমস্ত আমল প্রত্যাখ্যাত হবে। অতঃপর বান্দাকে পাঁচটি প্রশ্ন করা হবে, (১) তার জীবন কোথায় অতিবাহিত করেছে; (২) যৌবন কাল কোথায় ব্যয় করেছে; (৩) ধন-সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে; (৪) এবং কোথায় ব্যয় করেছে; (৫) এবং তার ইলম অনুসারে আমল কি করেছে। আর সেদিন বান্দাদের পারস্পরিক ব্যাপারে যখন হিসাব শুরু হবে, তখন রক্তপাত সম্পর্কে প্রথমে ফায়সালা আরম্ভ হবে। বিনিময় দান ও প্রতিশোধ নেয়া সেদিন নেকী-বদী উভয় দ্বারা সম্পন্ন হবে। ফলে, এক ব্যক্তির নেকীগুলো তার প্রতিপক্ষকে দেয়া হবে। যদি নেকী শেষ হয়ে যায়, প্রতিপক্ষের গুনাহগুলো উক্ত ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।

পুলসেরাত স্থাপন করা হবে। আর তা চুলের চেয়ে সুক্ষ্ম, তরবারির চেয়ে ধারালো পুল, যা জাহান্নামের পৃষ্ঠে স্থাপন করা হবে। মানুষ নিজের আমল অনুসারে এ পুল পাড়ি দেবে। কেউ চোখের পলকের গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ দ্রুত ঘোড়ার গতিতে এ পুল অতিক্রম করবে। আবার কেউ কেউ দু'হাঁটুর উপর ভর করে চলে অতিক্রম করবে। উক্ত পুলের উপর এমন আঁকুশীও থাকবে, যা মানুষকে ধরে দোযখে নিক্ষেপ করবে। কাফের ও গুনাহগার মু'মিনগণ (যাদের জন্য আল্লাহ দোযখের ফায়সালা দেবেন) পুল হতে দোযখে পড়ে যাবে। কাফেররা তো চিরতরে দোযখে থাকবে, তবে পাপীরা আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাত লাভ করবে। আল্লাহ পাক নবী, রাসূল ও সৎলোকদের মধ্যে যাদের জন্য মর্জি হবে সুপারিশের অনুমতি প্রদান করবেন যেন তাঁরা দোযখে নিক্ষিপ্ত মু'মিনদের জন্য সুপারিশ করে। অতঃপর আল্লাহ পাক তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন।

জান্নাতবাসী পুলসিরাত অতিক্রম করার সময় দোযখ ও বেহেশতের মধ্যবর্তী এক স্থানে থেমে যাবে যেন পরস্পর বিনিময় ও প্রতিশোধ নিয়ে ফেলে। ফলে এমন কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যার কাছে অপর ভাইয়ের হক রয়ে যাবে, যতক্ষণ না সে এর বিনিময় নিয়ে নেয় এবং একজন অপর জনের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যায়। যখন জান্নাতবাসী জান্নাতে এবং দোযখীরা দোযখে প্রবেশ করবে, তখন মৃত্যুকে এক ভেঁড়ার আকৃতিতে পেশ ক'রে তাদের (উভয় দলের) দৃষ্টির সামনে জবাই করা হবে। অতঃপর বেহেশতবাসীকে বলা হবে, চিরস্থায়ী হও এর পর কোন মৃত্যু নেই। হে দোযখবাসী! তোমাদের জন্য চিরন্তনতা, এর পর কোন মৃত্যু নেই। কেউ যদি

আনন্দ ও উল্লাসের কারণে মৃত্যু বরণ করতো, তবে বেহেশতবাসীরা করতো। আর যদি কেউ দুঃখ ও চিন্তায় মরে যেতো, তবে দোযখীরা মরে যেতো।

জাহান্নাম ও তার আযাব

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ فَاتَّقُوْا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ ﴾ [البقرة: ٢٤]

অর্থাৎ, "সেই দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য।" (সূরা বাক্বরাঃ২৪) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) স্বীয় সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন,

((نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ)) قَالُوا وَاللهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً يَا رَسُولَ الله قَالَ ((فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا)) رواه ابخاري ومسلم ٣٢٦٥-٢٨٤٣

অর্থাৎ, "তোমাদের এ আগুন যা আদম-সন্তানেরা জ্বালায়, তা হলো দোযখের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ করে বলছি, এটাই তো (জ্বালানোর জন্য) যথেষ্ট ছিল। তিনি বলেন, উত্তাপ ও গরমে ৬৯গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে দোযখের আগুনে, সবারই জ্বালানী শক্তি একই।" (বুখারী ৩২৬৫-মুসলিম ২৮৪৩)

দোযখের সাতটি স্তর। প্রত্যেক স্তরের শাস্তি অন্য স্তরের শাস্তি থেকে কঠোর। আমল অনুসারে প্রত্যেক স্তরের জন্য পৃথক পৃথক লোক রয়েছে। মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে। এর শাস্তি সর্বাপেক্ষা কঠোর। কাফেরদের শাস্তি দোযখে অব্যাহত থাকবে, বন্ধ হবে না। বরং যতবারই জ্বলে পুড়ে যাবে পুনরায় অধিকতর শাস্তি ভোগ করার জন্য চামড়া পরিবর্তন করা হবে। আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন,

﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴾ [النساء:٥٦]

অর্থাৎ, "তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পাল্টে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আযাব আস্বাদন করতে পারে।" (নিসাঃ৫৬) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴾ [فاطر:٣٦]

অর্থাৎ, "আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে শাস্তি লাঘব করাও হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি।"(সূরা ফাত্বিরঃ৩৬) আর জাহান্নামীদেরকে শৃংখলাবদ্ধ করা হবে ও গলায় বেড়ী পরানো হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ* سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴾ (ابراهيم:٤٩-٥٠)

অর্থাৎ, "তুমি ঐ দিন পাপীদেরকে শৃংখলাবদ্ধ দেখবে। তাদের জামা হবে দাহ্য আলকাতরার এবং তাদের মুখমন্ডলকে আগুন আচ্ছন্ন করে ফেলবে।"(১৪:৪৯) জাহান্নামীদের খাবার হবে যাক্কুম বৃক্ষ। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ * طَعَامُ الْأَثِيمِ * كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ * كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ﴾ [الدخان:٤٣-٤٨]

অর্থাৎ, "নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ পাপীদের খাদ্য হবে; গলিত তাম্রের মত পেটে ফুটতে থকবে। যেমন ফুটে গরম পানি।" (সূরা দুখানঃ ৪৩-৪৬) মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসটিও জাহান্নামের শাস্তির তীব্রতা ও প্রচন্ডতা এবং জান্নাতের সুখ বিলাসের মহত্ত্ব খুব পরিষ্কারভাবে বলে দেয়।। যেমন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ فَيَقُولُ لَا وَاللهِ يَا رَبِّ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُولُ لَا وَاللهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ))

رواه مسلم ٢٨٠٧

অর্থাৎ, "পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ভোগ-বিলাস এবং সুখ ও আনন্দ উপভোগকারী জাহান্নামী ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামে নিমিষের জন্য নিক্ষেপ ক'রে বলা হবে, হে আদম-সন্তান! তুমি কি কখনোও সুখ শান্তি ভোগ করেছ? সে বলবে,না, আল্লাহর শপথ! হে আমার প্রতিপালক! সুখ শান্তির ছোঁয়া আমি কখনো পাইনি। অনুরূপ-ভাবে জান্নাতবাসীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুঃখী মানুষটাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো মাত্র জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদম-সন্তান! তুমি দুঃখ ও ক্লেশ বলতে কিছু ভোগ করেছিলে? সে বলবে,না, আল্লাহর শপথ! হে অমার প্রতিপালক! আমি কখনোও দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করিনি। (মুসলিম ২৮০৭) কাফের জাহান্নামে নিমিষের জন্য নিক্ষিপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই দুনিয়ার সমস্ত ভোগ-বিলাস ভুলে যাবে। অনুরূপ মু'মিনও জান্নাতে সামান্য ক্ষণের জন্য প্রবেশ করেই দুনিয়ার সমস্ত দুঃখ-কষ্ট এবং দরিদ্রতা ও কঠিনতা সব ভুলে যাবে।

জান্নাতের বিবরণ

জান্নাত চিরস্থায়িত্ব ও মর্যাদার আবাস যা আল্লাহ তাঁর সৎ বান্দাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন। তাতে এমন নিয়ামত আছে, যা চক্ষু কখনোও দেখেনি, কান কখনোও শুনেনি, এমন কি মানুষের অন্তরে কখনোও ধারণা ও কল্পনা রূপেও উদিত হয়নি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة:١٧]

অর্থাৎ, "কেউ জানে না যে, তার জন্য জান্নাতে তাদের আমলের বিনিময়ে চক্ষুশীতলকারী কি কি সামগ্রী যোগাড় রাখা হয়েছে।" (সূরা সাজদাঃ ১৭) মু'মিনগণের আমল অনুসারে বেহেশ্‌তে তাদের স্তর ও শ্রেণী ভিন্ন হবে। আল্লাহ পাক বলেন,

﴿ يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ [المجادلة:١١]

অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং জ্ঞান প্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন।" (সূরা মুজাদিলাঃ ১১) আর তাঁরা নিজের কামনা ও রুচি অনুযায়ী যা ইচ্ছা পানাহার করবেন।তাতে আছে স্বচ্ছ পানির নহর, নির্মল দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পরিশোধিত মধুর নহর এবং পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শারাবের নহর। তবে তাঁদের সে শারাব দুনিয়ার শারাবের মত নয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ * بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ * لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴾ (الصافات:٤٥-٤٧)

অর্থাৎ, "শারাবের ঝর্ণাসমূহ হতে পান পাত্র পূর্ণ করে তাঁদের মধ্যে ঘুরানো হবে। তা উজ্জ্বল পানীয় পানকারী-দের জন্য সুপেয়, সুস্বাদু। না তাদের দেহে তার দরুণ কোন ক্ষতি হবে, না তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যাবে।" (সূরা সাফ্‌ফাতঃ ৪৫-৪৮)। সেখানে তাঁরা হুরদেরকে বিবাহ করবেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا)) رواه البخاري ٢٧٩٦

অর্থাৎ, "জান্নাতের এক তরুণী যদি দুনিয়াবাসীকে একবার উঁকি মেরে দেখে, তাহলে আসমান ও যমীন আলোকিত হয়ে যাবে এবং ভরে দেবে সুগন্ধে।" (বুখারী ২৭৯৬) জান্নাতীদের সর্বাপেক্ষা বড় নিয়ামত হবে পূত-পবিত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দর্শন লাভ। জান্নাতবাসীরা পেশাব পায়খানা করবে না, ফেলবে না থুথু। চিরুনী হবে স্বর্ণের, ঘাম মিস্কের। এ নিয়ামত অব্যাহত থাকবে, কখনোও বন্ধ হবে না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ يَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ)) رواه مسلم ٢٨٣٦

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে স্বাচ্ছ্যন্দে থাকবে ও চিন্তামুক্ত থাকবে। তার কাপড় পুরানো হবে না এবং তার যৌবন ক্ষয় হবে না।" (মুসলিম ২৮৩৬) জাহান্নাম থেকে সর্ব শেষে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ লাভকারী ব্যক্তি জান্নাতের যে অংশটুকু লাভ করবে, তা পৃথিবী ও পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর চেয়ে দশ গুণ শ্রেয় হবে।